মুহাম্মদ ﷺ

প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার

মওলানা
ওয়াহিদুদ্দিন খান

মুহাম্মদ ﷺ

প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান

ভাষান্তর : সৈয়দ তানভীর নাসরীন

Goodword Books

English Version

Muhammad: A Prophet for Humanity

Bengali Version :

মুহাম্মদﷺ : প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার

প্রথম প্রকাশ: ২০২৬

সম্পাদকমণ্ডলী:

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

মুস্তাফা কামাল হায়দার

সুরজ মন্ডল

মহিউদ্দিন মন্ডল

Goodword Books
A-21, Sector 4, Noida-201301, Delhi NCR, India
Tel. +91 120 4131448, Mob. +91 8588822672
info@goodwordbooks.com
www.goodwordbooks.com

CPS International
Centre for Peace and Spirituality International
1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, India
Mob. +91-9999944119
info@cpsglobal.org
www.cpsglobal.org

Peace and Spirituality Foundation
(Bengal Chapter of CPS International)
mwkbangla@gmail.com

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা 5

ভূমিকা 7

প্রথম পর্ব

১। আদম থেকে মসিহ 13

২। হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর উত্তরাধিকার 18

৩। দৃষ্টান্তমূলক ব্যবহার 23

৪। মহৎ চরিত্র 40

৫। পয়গম্বরের জীবনের শিক্ষা 51

৬। পয়গম্বরের পথ 70

দ্বিতীয় পর্ব

৭। পয়গম্বরের বিপ্লব 80

৮। ঘটনার ঊর্ধ্বে ওঠা 107

৯। পয়গম্বরীয় পদ্ধতি 111

১০। মক্কায় পয়গম্বর 135

১১। মদিনায় ইসলামের আগমন 171

১২। অভিবাসন- মক্কা থেকে মদিনায় 175

১৩। বিজয় এবং তারপরে 194

তৃতীয় পর্ব

১৪। পয়গম্বরত্বের অবসান 202

১৫। কুরআন: পয়গম্বরের জীবনের অলৌকিকতা 210

১৬। পয়গম্বরের সহযোগীরা 229

চতুর্থ পর্ব

১৭। বর্তমান দিন এবং যুগে পয়গম্বরের উদ্ভাস 248

টীকা 263

প্রস্তাবনা

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খানের কর্মকাণ্ড, দেশে বিদেশে শান্তি স্থাপনে তাঁর নিরলস উদ্যোগ, এবং তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে আমার পরিচিতি এক দশকের বেশি সময় ধরে। আমি এখন গভীরভাবে বিশ্বাস করি মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খানের কলকাতায় সম্প্রসারিত যে কর্মকাণ্ড, তার কর্ণধার শামিম আহমেদ ভাই এর সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটা নেহাত কাকতালীয় ছিল না, এ-ও ঈশ্বরের পরিকল্পনা বা মহাজাগতিক 'স্কীম অব থিংস'-এর এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খানের কাছে, তাঁর দিল্লির বাড়িতে গিয়েছি একাধিকবার; মুগ্ধ হয়েছি তাঁর যুক্তিপূর্ণ ধর্মব্যাখ্যায়, ইতিহাসের নিরিখে সমস্ত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করার তাঁর যে অন্তর্দৃষ্টি, তা আমাকে বারবার চমকে দিয়েছে।

মওলানা আমাদের মধ্যে শারীরিকভাবে আর নেই, সে প্রায় তিন বছর হয়ে গেল। আমার অসীম সৌভাগ্য যে, শামিম ভাই-এর উদ্যোগে এর আগে ২০১৭ সালে তাঁর 'এজ অব পীস' বইটি আমি বাংলায় 'শান্তির যুগ' নামে অনুবাদ করে মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খানের হাতে তুলে দিতে পেরেছিলাম।

আমি বিশ্বাস করি এই অনুবাদকর্মও অলক্ষ্য থেকে আশীর্বাদ ধন্য হয়েছে। শামিম ভাইকে অনেক কৃতজ্ঞতা, তিনি অস্বাভাবিকের থেকে আরও অনেক বেশি সময় আমার অনুবাদ কর্মটির জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন; আমার ওপর আস্থা রেখেছেন। তাঁর প্রতি আমার ভাষাতীত কৃতজ্ঞতা।

এই অনুবাদ পর্বটি আমার জন্য শুধু একটা ভাষাগত পাঠান্তরের কাজ ছিল না। **মুহাম্মদ ﷺ : প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার** শিরোনামে এই বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে মানুষ হিসেবে আমারও কিছু মৌলিক বিবর্তন ঘটেছে। আমার কর্মজীবনের খুব সংকটময় একটা সময়ে, যখন প্রতি মুহূর্তে প্ররোচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, আমি নিজেকে মনে করাবার জন্য সামাজিক মাধ্যমে

প্রস্তাবনা

আমার 'অ্যাবাউট'-এ লিখে রেখেছিলাম- "পেশেন্স- দ্য নেম অব দ্য গেম!" আজ আর মনে নেই, আমি সেই শক্তি কোথা থেকে পেয়েছিলাম। কিন্তু এই বই পড়তে গিয়ে যখন দেখলাম হজরত মুহাম্মদ(স.) আমাদের শেখাচ্ছেন জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'সবর' বা ধৈর্য, তখন আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

এই বইয়ের ছত্রে ছত্রে হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর জীবনের যে সংকট ও সংগ্রামের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তা পড়লে আমরা বুঝতে পারব যে, আমরা আমাদের তুচ্ছ এই নশ্বর জীবনে যা কিছু নিয়ে এত বিচলিত হয়ে পড়ি, আসলে তা কতই না অকিঞ্চিৎকর।

সহায়সম্বলহীন মুহাম্মদ(স.) (যখনও তাঁর পয়গম্বরত্ব সর্বজনস্বীকৃত হয়নি) ঐশ্বরিক অনুগ্রহে বলীয়ান হয়ে কীভাবে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ 'স্ট্র্যাটেজাইজ' করেছিলেন, কীভাবে মিত্রতার সম্প্রসারণ করেছিলেন, কীভাবে তাঁর শত্রুদের রক্তপাতহীন, যুদ্ধহীন কৌশলে নিজের ছাতার তলায় নিয়ে এসেছিলেন, কীভাবে তিনিই বিশ্বে প্রথম রাজনৈতিক- সামরিক ক্ষেত্রেও 'অহিংসা' ও ক্ষমার নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা সকলের কাছেই আজও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। এই অনুবাদ কর্মের প্রক্রিয়া একবিংশ শতাব্দীর এই হিংসা এবং যুদ্ধদীর্ণ পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে আমাকে ঋদ্ধ করেছে।

এই পর্বের বিভিন্ন সহায়তার জন্য আশিস সামন্তকে ধন্যবাদ। আর আমার জীবনের ছোট বড় সমস্ত 'এক্সপেরিমেন্টেশন' ঘিরে যার অনন্ত আগ্রহ এবং উৎসাহ, সেই সুমন ভট্টাচার্যকে আর কী বলব?

৩০ নভেম্বর ২০২৪

সৈয়দ তানভীর নাসরীন
অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান
ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'দ্য হান্ড্রেড' শীর্ষক একটি বইয়ে লেখক ড. মাইকেল হার্ট এমন একশোজন মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন — তাঁর মতে — যাঁরা মানব ইতিহাসে সব থেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন। হার্ট নিজে একটি খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই একশোজনের তালিকার ওপর দিকে যিশু খ্রিস্ট অথবা নিউটনের নাম নেই। তিনি বিশ্বাস করেন একজন মানুষের কৃতিত্ব অন্য সবার কৃতিত্বকে ছাপিয়ে গিয়েছে, এবং সেই মানুষটি হলেন হজরত মুহাম্মদ (স.)। আর কেউ মানব ইতিহাসে এমন গভীর প্রভাব ফেলতে পারেননি। হার্ট লিখেছেন, "তিনিই ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ দুটি ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত সফল হয়েছিলেন।"–১

আমেরিকান লেখক মাইকেল হার্টের কাছে হজরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন মানব ইতিহাসের একজন অসাধারণ চরিত্র; অপর দিকে ইংরেজ ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল মনে করেন, মুহাম্মদ (স.) ছিলেন, "পয়গম্বরদের মধ্যে মহানায়ক।"

প্রাচীনকালে যখন ইবরাহীম (আব্রাহাম) এবং ইসমায়িল মক্কায় কা'বাহ গৃহটি তৈরি করছিলেন, তাঁরা তাঁদের উত্তরসূরিদের মধ্যে একজন পয়গম্বরের জন্য প্রার্থনা করেন। আড়াই হাজার বছর পরে, এই 'মহানায়ক', হজরত মুহাম্মদ(স.) মক্কার মানুষদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়ে বিশেষ ঐশী অনুগ্রহ নিয়ে এলেন। এর ফলে আবরাহামের প্রার্থনা সম্পূর্ণতা পেল এবং পয়গম্বরদের পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্যও সফল হয়েছিল। হজরত মুহাম্মদ(স.)–এর আগের পয়গম্বরদের জীবনী ইতিহাসে যত্ন সহকারে নথিবদ্ধ হয়নি। একটি কঠোর বিদ্যায়তনিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, পয়গম্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন। যিশুখ্রিস্ট ছিলেন প্রাচীন ধারার পয়গম্বরদের

মধ্যে শেষতম এবং তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুগামী আছে, তা সত্ত্বেও তাঁর ঐতিহাসিক অবস্থান প্রশ্নাতীত নয়, যার ফলে বার্ট্রান্ড রাসেল মন্তব্য করেছেন: "ঐতিহাসিকভাবে সন্দেহ থেকে যায় যিশু খ্রিস্টের আদৌ অস্তিত্ব ছিল কিনা।" পয়গম্বরদের মধ্যে শেষতম হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর ক্ষেত্রে বিষয়টি এইরকম নয়। তাঁর জীবন এত সুন্দরভাবে নথিবদ্ধ এবং ইতিহাসে রক্ষিত, যদি কেউ তাঁর জীবন সম্পর্কে পড়াশোনা করে, সে অধ্যাপক ফিলিপ হিট্টির সঙ্গে সহমত হতে বাধ্য হবে যে, "ইতিহাসের পূর্ণ আলোকে হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর জন্ম হয়েছিল।"-২

যে উপাদানটি মুহাম্মদ(স.)-এর পয়গম্বরত্বের স্থায়িত্ব বিষয়ে সব থেকে বেশি অবদান রেখেছে, সেটি হচ্ছে কুরআন, সেই শাশ্বত বাণী, যা স্বয়ং বিশ্ববিধাতা তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। এই অলৌকিকতা যদি তাঁর পূর্বসূরিদের প্রতি আসা আদেশগুলির অনুরূপ হতো, তাহলে তার ফলাফল হজরত মুহাম্মদ(স)-এর জীবদ্দশার পরে এইভাবে পাওয়া যেত না এবং তাঁর পয়গম্বরত্ব পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে এইভাবে গৃহীতও হতো না। এই ধরণের অলৌকিক বিষয় বা ঘটনা মানুষ নিজে নিজে তৈরি করতে পারে না। এর ব্যাখ্যা আমরা কুরআনে পাই: এইরকম কিছু করতে চাওয়া মানুষের সাধ্যের বাইরে। এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই যে কুরআন আসলেই সর্বশক্তিমান বিশ্বপ্রভুর একটি অলৌকিক কর্ম বিশেষ।

মুহাম্মদ(স.)-এর ভূমিকা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। কারণ, তিনি ছিলেন পয়গম্বরদের মধ্যে শেষতম। ঈশ্বরের অধ্যাদেশও তাই ছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছার চূড়ান্ত প্রতিভাস তাঁর মাধ্যমেই মানুষের কাছে পৌঁছেছিল এবং ভবিষ্যতের জন্য ধর্মগ্রন্থটি তাঁর দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর অনুগত অনুসারীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এই ঘটনাক্রমকে নিশ্চিত করার জন্য পয়গম্বরের একটি মহান বিপ্লবের সূচনা করা প্রয়োজন ছিল, যা তাঁকে বিশ্ব জুড়ে অপ্রতিরোধ্য রকমের জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

মুহাম্মদ(স.) তোমাদের মধ্যে কারো পিতা নন। তিনি ঈশ্বরের বার্তাবাহক এবং পয়গম্বরদের মধ্যে শেষতম। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ।'-৩

ঈশ্বর পয়গম্বরকে নির্বাচন করেছিলেন, যাতে তিনি মানুষদের এমন পথনির্দেশ দিতে পারেন, যা তাদের নৈতিক ঋজু জীবন যাপন করার জন্য

প্রয়োজন। মানুষ যা করে তার উপরে যদি তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে মনে হয়, সেটা এই কারণে যে, এই পৃথিবীতে সে এক পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে। স্বাধীন ইচ্ছার মোহে যদি মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, যা খুশি তাই করার কথা ভাবে, সেটা এই কারণে, যে তার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। ঐশী মিশন থাকা সত্ত্বেও পয়গম্বরেরা মানুষকে তার পথ পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে পারেন না। তাঁরা যা করতে পারেন, তা হল ঈশ্বর তাঁদের যে বার্তা দিয়েছেন, সেই বার্তাটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া:

"(ঈশ্বরের) বার্তাবাহকদের কর্তব্য তো কেবল স্বষ্টভাবে সতর্ক করা।"-৪

জীবনের চলার পথে আমরা যাতে বিপথগামী না হই, তার জন্য ঈশ্বর চূড়ান্ত যত্নবান। তিনি আমাদের একটি বিবেক দিয়েছেন, যা দিয়ে আমরা ঠিক এবং ভুলের পার্থক্য করতে পারি এবং তিনি ন্যায়ের ভিত্তিতে তৈরি একটি পৃথিবীতে আমাদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু যখনই মানুষ তার বিবেকের কথা শুনতে ব্যর্থ হয়েছে অথবা ঈশ্বরের সৃষ্টি করা প্রতিটি বস্তু থেকে যে নীরব বার্তা আসে, তার প্রতি উদাসীন কিংবা বধির হয়েছে, তখনই ঈশ্বর সত্যবার্তা দিয়ে তাঁর পয়গম্বরদের পাঠিয়েছেন, যাতে ঈশ্বর প্রেরিত বার্তাগুলি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের কাছে অবোধ্য না থাকে, যাতে সেগুলি তাদের নিজেদের ভাষায় তাদের কাছে প্রচারিত হয়।

প্রাক-ইসলামি সময়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নশ্বর মানুষের উপাসনার মাধ্যমে হীনমান হয়ে গিয়েছিল; হজরত মুহাম্মদ(স.) কেবলমাত্র একজন অবিনশ্বর ঈশ্বরের উপাসনার উপরেই ভিত্তি করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনেক সময়েই কুসংস্কার ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি হয়; কিন্তু হজরত মুহাম্মদ(স.) সমস্ত কিছুই বাস্তব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মানুষকে শিখিয়েছিলেন প্রকৃতির উপাসনা না করে তাকে জয় করতে; এর ফলে বৈজ্ঞানিক যুগের সূচনা হয়েছিল। যেখানে একজন বংশানুক্রমিক রাজার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল, তিনি জনগণের শাসনের পথ দেখিয়েছিলেন। সাধারণভাবে যেখানে শিক্ষার ভিত্তি ছিল অনুমান এবং ধারণা, তিনি মানুষকে বাস্তবতার পর্যবেক্ষণ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে শিখিয়েছিলেন। যে সমস্ত ক্ষেত্রে মানব সমাজ নিষ্ঠুরতা এবং নিপীড়ন দ্বারা কলুষিত হয়েছিল, তিনি মানুষকে পথ দেখিয়েছিলেন কীভাবে ন্যায়ের পথে শান্তিতে থাকা যায়। এই সবগুলিই ছিল

হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর কৃতিত্ব। তিনি মানব ইতিহাসের ধারাটিকে পালটে দিয়েছিলেন।

যে দৃষ্টিকোণ থেকেই ইতিহাসকে দেখা হোক না কেন, হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর প্রভাবের সদা প্রসারমান অনুরণনগুলি সবখানেই প্রতিভাত হবে। মানব মূল্যবোধের মধ্যে যা সেরা, মানবসভ্যতার যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি, সবই তাঁর আনা বিপ্লবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল।

তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবন মানবতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। যেহেতু তিনি নিজে সমস্ত রকমের বিশেষ অবস্থার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, তিনি ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্তরে জীবনযাপনের একটি আদর্শ তুলে ধরতে পেরেছিলেন। তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন পৃথিবীতে আমাদের জীবন কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসারী হয়ে উঠতে পারে, কারণ সমস্ত বিষয়ে তাঁর প্রতিটি কাজ ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারাই পরিচালিত ছিল। তিনি শুধু ঈশ্বরের উপাসনার একটি নিখুঁত নকশা প্রতিষ্ঠা করেননি, তিনি দেখিয়েছিলেন যারা যথার্থই ঈশ্বরের কাজে তাদের জীবন নিবেদিত করে, ঈশ্বর কীভাবে তাদের সাহায্য করেন। তাঁর জীবন থেকে আমরা দেখতে পাই কীভাবে কেউ যদি ঈশ্বরকে ভয় করেন, তাহলে তাঁর আর অন্য কোনো কিছুকে ভয় করার প্রয়োজন পড়ে না। কেউ যদি প্ররোচনার মুখে ধৈর্যশীল থাকতে পারেন, তাহলে তিনি ফেনিয়ে ওঠা জলে তেল ঢেলে দিতে পারেন। যদি কেউ নেতিবাচক আবেগের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন, তাহলে তিনি সবাইকে, এমনকি শত্রুদেরও জয় করে নিতে পারবেন। কেউ যদি পরবর্তী জগতের কথা ভেবে এই পৃথিবীতে আত্মত্যাগ করেন, তাহলে ঘটনাক্রমে তিনি দুই জগতেরই সেরা জিনিসগুলো লাভ করবেন।

ঠিক যেমন, ঐশী অনুপ্রাণিত পদ্ধতিতে যে কৃষক তাঁর জমি চাষ করেন, তিনি সেরা ফসল পান, ঠিক তেমনই হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর অনুগামীরা যে-কোনো সময় অন্যদের উপরে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাঁর ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অনুকূল সব পূর্বশর্তগুলি ঈশ্বর আগেই পাঠিয়েছিলেন। সেগুলি বুঝে এবং ব্যবহার করে এই ধর্মের অনুগামীরা ইসলামি চিন্তনকে শ্রেষ্ঠত্বের পর্বে নিয়ে যেতে পারেন।

ভূমিকা

হজরত ইবরাহীম(আ.)-এর সময়কাল এবং হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর আগমনের মধ্যে আড়াই হাজার বছরের ব্যবধান ছিল। এই সময় জুড়ে হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর আগমনের ক্ষেত্রটি তৈরি হচ্ছিল। ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে হজরত মুহাম্মদ(স.) তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকাটি যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। সেই কারণে তাঁর কর্মকাণ্ড চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছিল।

হজরত মুহাম্মদ(স.)-কে শ্রেষ্ঠ চরিত্রে উন্নীত করে এবং মানব ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল দিকচিহ্ন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ঈশ্বর মানবতার জন্য শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। যে কেউ তার নিজের জন্য একজন পথপ্রদর্শক খুঁজলে তাঁকে দেখতে পাবেই, কারণ তিনি স্তম্ভের মতো দণ্ডায়মান, তিনি যেন দিগন্তে একটি পর্বত, তিনি যেন বাতিঘরের মতো আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে সকলকে সত্য পথের দিক নির্দেশ করছেন। যদি কেউ সত্য সন্ধানী হন, তাহলে তিনি অবশ্যই এই মহৎ চূড়ায় অবস্থানকারী হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সময়কালের চোদ্দশো বছর পরে, বহু ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেছে। মানবজ্ঞানের পরিসরে দিগন্তপ্রসারী উত্তরণ ঘটেছে। এই সবগুলিই ইসলামের পক্ষে কাজ করেছে। হজরত মুহাম্মদ(স.) যে ধর্ম শিখিয়েছিলেন, তা আজও অন্য সব ধর্মের উপরে নিজের গৌরবের স্থান ধরে রাখতে পারে। তবে তার জন্য ঐশী অনুপ্রাণিত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এই নিয়ম, যা হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর জন্য প্রযোজ্য ছিল, তা তাঁর অনুগামীদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।

প্রথম পর্ব

১. আদম থেকে মসিহ

এই পৃথিবীতে আসা প্রত্যেক পয়গম্বরের একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা সকলেই শিখিয়েছিলেন, এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন তার শাশ্বত জীবনের একটি অতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

এই পৃথিবীতে মানুষকে পাঠানো হয়েছিল পরীক্ষার জন্য। পুরস্কার বা শাস্তি এর পরবর্তীতে আসবে। যদি কোনো মানুষ ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করে থাকে, তাহলে মৃত্যুর পরে সে স্বর্গে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পাবে। কিন্তু, যদি কেউ তা থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে তাকে সরাসরি নরকে নিমজ্জিত করা হবে। তার চিরস্থায়ী নরকভোগ হবে। প্রত্যেক পয়গম্বর জীবনের এই চূড়ান্ত বাস্তবতা শিখিয়েছেন।

আদম ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ এবং প্রথম পয়গম্বর। তাঁর পর থেকে মসিহর সময় পর্যন্ত পয়গম্বরদের একটি দীর্ঘ ধারা বিদ্যমান। সব মিলিয়ে প্রায় ১,২৪,০০০ ঈশ্বরের বার্তাবাহক রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৩১৫ জন পয়গম্বর ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন লোকেদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেছিলেন এবং মানবজাতিকে ঈশ্বরের নির্দেশিত পথ মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা যাদের সম্বোধন করেছিলেন, তাদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই ঈশ্বরের জন্য তাদের স্বাধীনতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, নিতান্ত অল্প কিছু ব্যক্তিই হজরত ইয়াহিয়া (জন দ্য ব্যাপটিস্ট)–কে অনুসরণ করেছিল এবং তিনি একজন শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন। লুত(আ.) বা লোট যখন তাঁর লোকেদের ছেড়ে যান, তখন তাঁর সঙ্গে কেবল মাত্র তাঁর দুই মেয়েই ছিল। ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুসারে, নুহ(আ.) বা নোয়ার সঙ্গে মাত্র আটজন লোক নৌকায় উঠেছিল। ইবরাহীম(আ.)

বা আবরাহাম যখন তাঁর জন্মভূমি ইরাক ত্যাগ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সারা এবং তাঁর ভাগ্নে লোট, যদিও পরবর্তীতে তাঁর দুই পুত্র, ইসমায়িল এবং ইসহাক বা আইজ্যাক তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এমনকি মসিহ বা যিশুর মহান প্রচারকর্মের পরেও, যাজকরা এবং ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ যাঁরা তাঁর উপদেশ শুনেছিলেন, তাঁরাও তাঁকে অনুসরণ করেননি, এমনকি তাঁর বারোজন বন্ধুও সাময়িকভাবে যথার্থ মুহূর্তে তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন।

এটা ছিল অধিকাংশ পয়গম্বরের দুর্ভাগ্যজনক নিয়তি। কিছু কিছু ভাগ্যবানেরা অবশ্য আত্মীয়স্বজন ও মুষ্টিমেয় অনুরাগীদের সঙ্গে পেয়েছেন, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পয়গম্বরেরা তাঁদের পরিবেষ্টন করে থাকা মানুষজনের উদাসীনতা এবং অসংবেদনশীলতার কারণে নিঃসঙ্গ এবং নিপীড়িত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কুরআনের এই আয়াতটি মানবজাতির ইতিহাস জুড়ে পয়গম্বরত্বের প্রতি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরে: “বান্দাদের জন্য আফসোস! তাদের কাছে আসা প্রত্যেক পয়গম্বরকে তারা উপহাস করে।”–৫

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, পয়গম্বরেরা মানবজাতির মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করে আছেন। তা সত্ত্বেও, এটা কতই না বিস্ময়কর যে, তাদেরকে ইতিহাসে সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস রাজা এবং সমরনায়কদের জীবন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় একজন পয়গম্বরের জীবনকে যথাযথ স্থান দেওয়া হয়নি। অ্যারিস্টটল (৩৮৪– ৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), যিনি হজরত মুসা(আ.) বা মোজেসের এক হাজার বছর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি মোজেস নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। এর কারণ খুঁজে বের করা খুব অসম্ভব নয়: অধিকাংশ পয়গম্বর তাঁদের নিজেদের মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন; তাঁদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হয়েছিল; তাঁরা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হন; তাঁরা এতটাই গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হয়েছিলেন যে, কেউ তাঁদের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজনও বোধ করেনি।

কেন পয়গম্বরদের সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়েছিল? এর একটি মাত্র প্রধান কারণ হল — তাঁরা তৎকালীন প্রথাসমূহের, বিশেষ করে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ও যাজকতন্ত্রের সমালোচনা করেছিলেন। মানুষ প্রশংসিত হওয়া ছাড়া যেমন কিছুই ভালোবাসে না, তেমনি তারা সমালোচনাকে বড়ই অপছন্দ করে। পয়গম্বরেরা মানুষের সঙ্গে কোনো আপস না করে সঠিক ও

ভুলের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা ক্রমাগতভাবে মানুষের বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপের ত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে জনগণ তাঁদের বিরুদ্ধে চলে যায়। সকলে যা শুনতে চায়, তা যদি পয়গম্বরেরা উপদেশ হিসেবে দিতেন, তাহলে তাঁদের সঙ্গে এই আচরণ করা হতো না।

যদিও বেশিরভাগ পয়গম্বরের পরিণতি এমন হয়েছিল, তবে তাঁদের মধ্যেও কয়েকজন অব্যাহতি পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ইউসুফ (জোসেফ), সুলায়মান (সলোমন) এবং দাউদ (ডেভিড)-এর নাম মনে আসে। কিন্তু এই পয়গম্বরেরা যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন, তা তাঁদের প্রচারিত শিক্ষার জনপ্রিয়তার কারণে হয়নি; তাদের উৎস ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

যে সময়ে ইসরায়েলীয় এবং প্যালেস্টাইনিরা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, সেই সময় দাউদ (ডেভিড) ছিলেন রাজা তালুত (সৌল)-এর অধীনস্থ ইসরায়েলীয় সেনাবাহিনীর একজন তরুণ সৈনিক। প্যালেস্টাইনের সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিলেন মহাকায় জালুথ (গোলিয়াথ)। তিনি এত শক্তিশালী একজন যোদ্ধা ছিলেন যে, কেউ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল না। রাজা সৌল তখন ঘোষণা করেছিলেন যে, গোলিয়াথকে যে হত্যা করবে, তিনি তাঁর মেয়ের সঙ্গে সেই ব্যক্তির বিয়ে দেবেন। ডেভিড এগিয়ে এলেন, সেই মহাকায় যোদ্ধাকে যুদ্ধে আহ্বান জানালেন এবং তাঁকে হত্যা করলেন। এভাবে তিনি ইজরায়েলের রাজার জামাতা হন। পরবর্তী এক যুদ্ধে, রাজা সৌল এবং তাঁর উত্তরাধিকারী উভয়েই নিহত হন। ডেভিড তখন ইজরায়েলের রাজার মুকুট লাভ করেন। সলোমন ছিলেন ডেভিডের পুত্র, এবং তাঁর পিতার পর তিনি সিংহাসনে বসলেন।আবার ইউসুফ (জোসেফ) ঈশ্বরের থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার বিশেষ ক্ষমতা লাভ করেছিলেন এবং মিশরের রাজা তাঁর ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে রাষ্ট্রের ভার অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু রাজা তখনও রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন এবং তিনি ও তাঁর প্রজারা তাঁদের পৌত্তলিক ধর্ম মেনে চলতেন।

যুগে যুগে পয়গম্বরদের প্রতি যে বৈরী আচরণ করা হয়েছে, তার ফলে মানুষ প্রকৃত পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে; এবং আরও গুরুতর বিষয় হলো, এই বৈরিতা ধর্মগ্রন্থ এবং পয়গম্বরদের প্রচারিত শিক্ষার সংরক্ষণকে অসম্ভব করে তোলে। যে কোনো পয়গম্বরের পরে শুধুমাত্র তাঁর অনুসারীরাই

তাঁর উপদেশ সংরক্ষণ করতে পারে; কিন্তু পয়গম্বরদের হয় কোনো অনুগামী ছিল না, অথবা তারা সংখ্যায় এত কম ছিল যে, সমাজের বিরোধিতার মুখে তারা ধর্মগ্রন্থগুলো সংরক্ষণ করতে পারে নি।

ঈশ্বরের জ্ঞান চিরন্তন। তিনি অতীতের মতোই ভবিষ্যৎ দেখতে পান। তিনি পয়গম্বরদের পাঠানোর আগেই জানতেন যে, এটিই হবে মানবজাতির ভাগ্য। তাই তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে, পয়গম্বরীয় যুগের শেষের দিকে তিনি পৃথিবীতে তাঁর নিজস্ব বিশেষ দূত প্রেরণের মাধ্যমে এই পরিস্থিতির প্রতিকার করবেন। সেই পয়গম্বরের কাজ কেবল ধর্মপ্রচার করাই হবে না, তিনি তাঁকে অন্যান্য পার্থিব বিষয়গুলি অপেক্ষা আরও উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য দেওয়া হবে, তাঁকে সক্ষম করা হবে যাতে তাঁর সমসাময়িক লোকেরা এই অভিনব সত্যের সামনে সসম্মানে নত হতে বাধ্য হয়। সমাজের বিকৃতিগুলি সংশোধন না করা পর্যন্ত ঈশ্বর তাঁকে পৃথিবীতে রাখবেন। পয়গম্বরের চারপাশে আবর্তিত ঈশ্বরের শক্তি তাঁর শত্রুদের পরাজিত করতে সাহায্য করবে। এইভাবেই প্রকৃত ধর্ম দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ঈশ্বরের বাক্য চিরস্থায়ী হবে, যেমনটি বাইবেলে বলা আছে, "সমুদ্র যেমন জলে ভরা থাকে, তেমনই ঈশ্বরের মহিমার জ্ঞানে পৃথিবী পরিপূর্ণ হবে।"–৬

অনুবাদ এবং সংযোজনের কারণে বর্তমান সময়ের বাইবেল মৌলিক বাইবেল থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। তবুও এর মধ্যে এখনও হজরত মুহাম্মদ(স.)–এর আগমনের একাধিক উল্লেখ রয়েছে। যদি কেউ বস্তুনিষ্ঠভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করে, তবে সে এমন কিছু উল্লেখ খুঁজে পাবে, যা অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। ঈসা বা যিশুর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বিশ্ব এবং বিশেষ করে ইহুদি জাতির কাছে শেষ পয়গম্বরের আগমনের কথা ঘোষণা করা।তিনি যে 'নিউ টেস্টামেন্ট'–এর কথা বলেছিলেন, বাস্তবে সেটাই ছিল ইসলাম; কারণ ইসলামই ইহুদিদের ধর্মীয় আধিপত্যের অবসান ঘটিয়েছে এবং ইসমায়িলের সন্তানদের ঈশ্বরের বাণীর প্রকৃত গ্রহীতা হিসেবে তুলে ধরেছে। সেই কারণেই হজরত মুহাম্মদ(স.)–এর উত্থান।

শেষ পয়গম্বরের ছশো বছর পূর্বে যিশু (ঈসা) পৃথিবীতে আসেন। কুরআনে যিশু সম্পর্কিত একটি উদ্ধৃতিতে এই কথা বলা হয়েছে — 'এবং পয়গম্বর যিশুকে স্মরণ কর, যিনি ইসরায়িলের সন্তানদের বলেছিলেন, "আমি

ঈশ্বরের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি ইতিমধ্যে প্রকাশিত তোরাহ-কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং এমন একজন ঈশ্বরের বার্তাবাহকের সংবাদ দেওয়ার জন্য যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমদ।”-৭

‘আহমদ’ এবং ‘মুহাম্মদ’ শব্দের একই অর্থ প্রশংসিত। বার্নাবাসের গসপেলে সেই অনাগত পয়গম্বরের নাম হিসাবে ‘মুহাম্মদ’ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু খ্রিস্টানরা যেহেতু বার্নাবাসের গসপেলকে অপ্রামাণিক মনে করে, তাই আমরাও সেই উৎস থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া সঠিক মনে করি না। এমনকি আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে যিশু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে আহমদ বলেছিলেন, না মুহাম্মদের বলেছিলেন। সম্ভবত তিনি এই নামগুলির মতো একই অর্থবহ একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

ইবন হিশাম, তাঁর লেখা পয়গম্বরের জীবনীতে, ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন, যেটি পয়গম্বরের জীবনের সবচেয়ে প্রামাণিক সূত্র। সেখানে বলা হয়েছে যে, যিশু যখন তাঁর মাতৃভাষা সিরিয়ান ভাষায় কথা বলেছিলেন, তখন তিনি আগত পয়গম্বরের জন্য যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তা ছিল ‘মুনহামান’, যার অর্থ ‘প্রশংসিত’। পরম্পরাগতভাবে চলতে থাকা এই বিশেষণটি তিনি সম্ভবত প্যালেস্টাইনি খ্রিস্টানদের, যারা ইসলামি শাসনের অধীনে এসেছিল, তাদের থেকে পেয়েছিলেন। যখন বাইবেল গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়, তখন শব্দটি ‘প্যারাক্লিট’ বা ‘ধর্মের পক্ষে সওয়ালকারী ব্যক্তি’র সমার্থক হয়ে ওঠে।

২. হজরত মুহাম্মদ (স.)–এর আবির্ভাব এবং তাঁর উত্তরাধিকার

প্রাচীন বিশ্বে আরব উপদ্বীপ এমন একটি কেন্দ্রে অবস্থিত যা আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। তবুও কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিজয়ী এই অঞ্চলে আক্রমণ করেনি; কোনো শাসক এটিকে তাঁর অধীনে আনার চেষ্টা করেননি। সমস্ত সামরিক অভিযান আরব সীমান্তবর্তী এলাকা অর্থাৎ ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং লেবাননে সীমাবদ্ধ ছিল। আরব উপদ্বীপের জন্য কেউ লড়াই করা প্রয়োজন বলে মনে করেনি। এটা ঠিক যে, আরব উপকূল তিনটি সাগর দিয়ে ঘেরা ছিল, কিন্তু এর ভিতরে বসবাসের অযোগ্য মরুভূমি এবং উষর পর্বতমালা ছাড়া আর কিছু ছিল না।

মক্কা ছিল এই ভূখণ্ডের কেন্দ্রীয় জনপদ। যে 'উষর উপত্যকায়' এটি অবস্থিত ছিল, সেখানে ইসলামের পয়গম্বর, হজরত মুহাম্মদ(স.)–এর জন্ম হয়েছিল। হজরত মুহাম্মদ(স.)–এর জন্মের কয়েক মাস আগে তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আবদুল মুত্তালিব মারা যান। মাত্র ছয় বছর বয়সে তাঁর মা আমিনাও মারা যান। দুই বছর ধরে তিনি তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের কাছে প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং যখন তিনিও মারা যান, তখন হজরত মুহাম্মদ(স.)–এর কাকা আবু তালিব তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। হজরত মুহাম্মদ(স.) মদিনা চলে যাওয়ার তিন বছর আগে আবু তালিবের মৃত্যু হয়। যখন তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন পর্যায় চলছিল, তখন পয়গম্বর আক্ষরিক অর্থেই অভিভাবকহীন হয়ে গেলেন। কিন্তু প্রকৃতি পয়গম্বরকে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দিয়েছিল। যৌবনে যারা তাঁকে দেখেছিল তারা বলেছিল "এই ছেলেটির ভবিষ্যৎ দুর্দান্ত হবে।" বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব ক্রমশ বিকশিত হচ্ছিল। 'আলি(-৮) একবার মন্তব্য করেছিলেন, "যারা তাঁকে প্রথমবার দেখত, তারা বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে যেত, এবং যারা তাঁর কাছে

আসত, তারা তাঁকে ভালোবাসতে শুরু করত।” হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর মহৎ চরিত্র ছিল সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে; তবুও যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর, তিনি তাঁর পয়গম্বরীয় মিশনের কথা ঘোষণা করেন এবং তা শোনার পরই তাঁর প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছিল। তারা তাঁর পয়গম্বরত্বের দাবীকে তীব্র বিদ্রূপ করেছিল। “এই গ্রাম্য ছেলেটিকে দেখো, যে মনে করে সে স্বর্গের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে”, এই কথা বলে তারা তাঁকে উপহাস করত।

তাঁর ঈশ্বরের বাণী প্রচারের কাজ মাত্র তেইশ বছর ধরে বিস্তৃত ছিল। এই স্বল্প সময়েই তিনি আরব জাতির মধ্যে এমন এক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, যা বিশ্ব আগে কখনও দেখেনি। একশো বছরের মধ্যে এই বিপ্লব সাসানীয় এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য উভয়কেই পরাজিত করেছিল। বিশ্বের এই দুটি মহান সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্ম ইরান ও ইরাক থেকে পূর্বে বুখারা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, অন্যদিকে পশ্চিমে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর এবং তারপর সমগ্র উত্তর আফ্রিকাও ইসলামের অধীনস্থ হয়। প্রবাহটি সেখানেই থামেনি, ৭১১ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম জিব্রাল্টার প্রণালী পেরিয়ে আইবেরিয়ান উপদ্বীপে এগিয়ে যায়। ৭৩২ সালে একজন ফ্রাঙ্কিশ রাজপুত্র, চার্লস মার্টেল, ইসলামের অগ্রযাত্রাকে স্থগিত করেন। তারপর দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ক্রুসেড চলতে থাকে, এবং ক্রুসেডের পরে আসে তাতার উপজাতিদের ভয়াবহ আক্রমণ। কিন্তু এই বহিঃআক্রমণ সত্ত্বেও, পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ইসলামি সাম্রাজ্য তার দখল জারি রেখেছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে, তারা স্পেন হারিয়েছিল।

তখন ইসলামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তুর্কি ও মুঘলরা উজ্জীবিত হয়। ১৪৫৩ সালে তুর্কিরা কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করে এবং পূর্ব ইউরোপে যুগোস্লাভিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ১৬৮৩ সাল পর্যন্ত একটি তুর্কি সেনাবাহিনী ভিয়েনার বাইরে শিবির করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘলরা ভারত ও আফগানিস্তানে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। গত তেরো শতাব্দী জুড়ে মুসলমানরা পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে পড়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় চার ডজন দেশে মুসলিম ভাবধারা বিস্তারে মুসলিম বিশ্ব গঠন হয়েছে। ওয়ার্ল্ড মুসলিম গেজেটিয়ার (-৯) অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বে ৯০০ মিলিয়ন মুসলিম রয়েছে।

এ সবই হল আরবে পয়গম্বরের নির্দেশে পরিচালিত সেই তেইশ বছরের প্রচেষ্টার ফল। এই স্বল্প সময়ের পরিধিতে, ইসলামি বিপ্লব শুধু মানব ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসনই গ্রহণ করেনি, পাশাপাশি তার নিজস্ব একটি নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। এত বড় কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা একা মানুষের নেই, এটা একমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন। ইসলামি বিপ্লব প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের কাজ। বদর যুদ্ধে বিজয়ের পরে যখন মুসলমানরা ফিরে আসছিল, তখন কিছু শুভানুধ্যায়ী রওহা নামক স্থানে তাদের সঙ্গে দেখা করে, যারা যুদ্ধের ফলাফলের জন্য তাদের অভিনন্দন জানায়। "আপনারা কেন আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন?" সালমা ইবন সালামা জিজ্ঞেস করলেন। "শত্রুরা যেন ঠিক বাঁধা উটের মতো ছিল এবং আমরা তাদের যথাযথভাবে বধ করেছি।–১০

এই সব স্পষ্টতই ঈশ্বর দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ছিল। ধূ ধূ আরব মরুভূমিতে তিনি অসাধারণ দৃঢ়চেতা একটি মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেনঃ প্রকৃতি ও পরিবেশ তাদের চরিত্রে একটা প্রবল ছাপ রেখেছিল। তারা কেবল গ্রহণ বা অস্বীকার করতে জানত, তাদের জন্য তৃতীয় কোনো বিকল্প ছিল না। তাদের মধ্যে কোনো একটি কারণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মতো প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রাকৃতিক গুণাবলী অন্তর্লীন ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের দেশের সীমানায় থাকা দুটি মহান শক্তি। এটা স্বাভাবিক ছিল যে, রোম এবং পারস্যের শক্তিশালী সাম্রাজ্যগুলি তাদের দ্বারপ্রান্তে একটি নতুন শক্তির উত্থানকে সদয়ভাবে গ্রহণ করবে না। ইসলামের উত্থানকে রুখে দেওয়ার চেষ্টায় তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এভাবে তারা মুসলমানদের পাল্টা লড়াই করতে বাধ্য করে। এটা মুসলমানদের রোম এবং পারস্যের সাম্রাজ্যগুলিকে জয় করার সুযোগ দিয়েছিল; যেগুলির সীমানা, সেই সময়ে, পরিচিত বিশ্বের সুদূরতম সীমা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামের বিজয় অন্যদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের যুদ্ধ ছিল না, বরং এই যুদ্ধগুলি ছিল অন্যদের আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া। সেগুলি ছিল আত্মরক্ষার যুদ্ধ এবং পৃথিবীর কোনো দেশ কখনোই এই ধরণের যুদ্ধের ন্যায্যতা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করে না।

এই ঘটনাগুলির রাজনৈতিক তাৎপর্যের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে, ইসলামি বিপ্লব মানবতার জন্য এখনও অবধি অনাবিষ্কৃত সুযোগগুলি

খুলে দিয়েছিল। এটি ঈশ্বরের প্রকাশিত ধর্মকে একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতায় পরিণত করেছিল, যা আগে ছিল না। এটি মুদ্রণ শিল্পের যুগের সূচনা করে, সর্বকালের জন্য কুরআনের সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। এটি বিশ্বে গণতন্ত্র এবং বাকস্বাধীনতার যুগ এনেছে, সমস্ত কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতাকে সরিয়ে দিয়েছে যা প্রচারকদের তাদের সত্যের প্রতি আহ্বানের কাজে বাধাস্বরূপ ছিল। এটি বিজ্ঞানের জগতে নতুন আবিষ্কারকে সম্ভব করেছে, ধর্মীয় সত্যকে যুক্তিযুক্ত ও বৌদ্ধিক স্তরে প্রমাণিত ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম করেছে।

এই বিপ্লবের আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যে, পয়গম্বরের মাধ্যমে ঈশ্বর পৃথিবীকে দেখিয়েছিলেন পরকালে কী হবে। তাঁর জীবন এবং কর্মকাণ্ড আমাদের পরবর্তী জীবনের ঘটনাগুলির পূর্বরূপ দেখিয়েছিল। যাঁরা তাঁদের কাছে নিয়ে আসা সত্যকে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের জীবনকে সেই পথে চালিত করেছিলেন, তাঁরা সর্বোত্তম হয়েছিলেন এবং ঈশ্বর চাইলে তাঁরা পরকালেও চিরজীবী হবেন। এদিকে, দুষ্টদের অপদস্থ করে এটা বোঝানো হয়েছিল যে, তারা ভবিষ্যতে জগতেও এই ধরণের অপমানের শিকার হয়ে থাকবে।

ইতিহাস দেখায় যে, যারা ঈশ্বরের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করে তারা সর্বদা একটি নিস্তেজ এবং অবদমিত অবস্থায় থাকে, আর যারা সম্পদ এবং ক্ষমতার জন্য নিবেদিত প্রাণ তারা সর্বদা পৃথিবীতে তাদের পথ খুঁজে নেয়। মহাপুরুষ ও পয়গম্বরদের ক্ষেত্রে ইতিহাসের এমনই নিদারুণ অনেক প্রমাণ রয়েছে। এই অবস্থা বাস্তবের সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ অবশেষে, ঈশ্বর তাঁর প্রকৃত অনুসারীদের চিরস্থায়ী সম্মান ও গৌরব দান করবেন, যখন আত্ম-উপাসক এবং জাগতিক বিষয়ের উপাসকরা চিরকালের জন্য অপমান ও অসম্মানে নিক্ষিপ্ত হবে।

এই পৃথিবী আমাদের জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্র। এখানে, মানুষ তাদের খুশি মতো কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। তাই এই পৃথিবীতে ঈশ্বর কাউকে বাধ্য করেন না। কিন্তু একবার, অন্তত, ইসলামের পয়গম্বরদের মাধ্যমে, ঈশ্বর পৃথিবীতে এমন পরিস্থিতি দেখিয়েছেন যা পরবর্তীলোকে সবচেয়ে সম্পূর্ণ এবং স্থায়ীরূপে বিরাজ করবে।

পয়গম্বরের সহযোগীরা, যাঁদের বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছিল, যাঁদের জন্য পৃথিবী নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারের ক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়েছিল, যাঁদের সম্পত্তি লুট করা হয়েছিল, যাঁরা এতটাই নির্যাতিত ও আতঙ্কিত হয়েছিলেন যে, তাঁরা সর্বদা সমূলে বিনষ্ট হওয়ার আতঙ্কে বাস করতেন, এই লোকেরাই মহান সম্মানের অবস্থানে উন্নীত হয়েছিলেন। কুরাইশ এবং ইহুদিরা, রোমান ও ইরানিরা, ইয়েমেনি ও গাসানিরা(–১১) যারা তাদের সম্পদ ও ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করত, তারা তখন অবজ্ঞা ও অপমানে পতিত হয়েছিল।

ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা প্রত্যেক পয়গম্বরই ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের মাপকাঠি নিয়ে আসেন। তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বর মানবজাতির কাছে সেই সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণা করেন যা 'তিনি' নিজেই পরলোকে ঘোষণা করবেন। কিন্তু ইসলামের পয়গম্বর ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার এমনভাবে প্রদর্শন করেছিলেন যে, সেটি একটি লৌকিক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছিল; এটি একটি স্বীকৃত ঐতিহাসিক বাস্তব হয়ে উঠেছিল। আমরা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম যে, কীভাবে ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারীদের সম্মানিত করেন এবং যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদের অবনমিত করেন। স্বর্গ ও নরক ছিল বাস্তবতা যা পরলোকে প্রকাশ পাবে। কিন্তু আমরা যাতে সতর্ক হতে পারি, সেইজন্য আমাদের এই পৃথিবীতে সেই দুটির প্রাথমিক একটি আভাস দেওয়া হয়েছিল।

মুহাম্মদ(স.)-এর পয়গম্বরত্বের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে যা আবির্ভূত হয়েছিল তা হল স্বয়ং ঈশ্বরের ঐশ্বরিকতা। এই কারণেই নিউ টেস্টামেন্ট তাঁর পয়গম্বরত্বকে 'ঈশ্বরের রাজ্য' হিসাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। পয়গম্বরের বিপ্লবের যে ব্যাপক রাজনৈতিক ও কৌশলগত প্রভাব ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর প্রধান গুরুত্ব ছিল ঈশ্বরের মহিমার পার্থিব বহিঃপ্রকাশ, ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের প্রকাশ। হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর বিপ্লব আমাদের আগেই তার একটি ঝলক দেখিয়েছিল, যা পরলোকে আমাদের উপর প্রখর এবং পরম আকারে আসবে।

৩. দৃষ্টান্তমূলক ব্যবহার

ইসলামের পয়গম্বর, মুহাম্মদ, তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, ২২ এপ্রিল ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আরবে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮ জুন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি একজন অত্যন্ত সুদর্শন এবং শক্তিশালী মানুষ ছিলেন। তাঁর শৈশবেই ভবিষ্যতের একজন সূক্ষ্ম ও গতিশীল ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। তিনি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের আভিজাত্য, যারা তাঁকে দেখত, তাদের সকলের উপর প্রভাব ফেলত। তবে তিনি এতই মৃদুভাষী এবং এমন উদার স্বভাবের ছিলেন যে, কেউ তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে তাঁকে ভালো না বেসে পারতেন না। নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব — সহনশীল, সত্যবাদী, দূরদর্শী এবং মহিমান্বিত, — তিনি মানব আভিজাত্যের সর্বোচ্চ উদাহরণ উপস্থাপন করেছিলেন। দাউদ ইবনে হুসাইনের মতে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী, সহনশীল, সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত, সর্বদা ভালো প্রতিবেশী হিসাবে পরিচিত হন। তিনি সমস্ত ঝগড়া এবং অশান্তি থেকে দূরে থাকতেন এবং কখনোই অশ্লীল কথা উচ্চারণ, গালিগালাজ বা আক্রমণাত্মক আচরণে লিপ্ত হতেন না। এমনকি অনেকেই তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র তাঁর হেফাজতে রাখত, কারণ তারা জানত যে তিনি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। তাঁর প্রশ্নাতীত বিশ্বস্ততার জন্য তাঁকে ‘আল আমিন’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়, যিনি একজন বিশ্বস্ত অভিভাবক, একজন অবিচল বিশ্বস্ততার প্রতীক।

পঁচিশ বছর বয়সে যখন তিনি বিয়ে করেন, তখন তাঁর কাকা আবু তালিব বিয়ের দায়িত্ব পালন করেন। “আমার ভাইপো মুহাম্মদ ইবনে ‘আবদুল্লাহর সঙ্গে তুলনা করার মতো কেউ নেই,” তিনি বলেছিলেন। “তিনি আভিজাত্য, ভদ্রতা, বিশিষ্টতা এবং প্রজ্ঞায় সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। ঈশ্বরের শপথ, তাঁর জন্য একটি মহান ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে এবং তিনি একটি অতি উচ্চ

অবস্থানে পৌঁছে যাবেন।” আবু তালিব এই কথাগুলো সেই অর্থে উচ্চারণ করেননি, যে অর্থে পরবর্তী ঘটনাবলীতে সেগুলিকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে। তিনি সেগুলি জাগতিক অর্থে বুঝিয়েছিলেন। প্রকৃতি তাঁর ভাইপোকে একটি চৌম্বক এবং বহুমুখী ব্যক্তিত্ব দিয়েছিল। তাঁর লোকেরা অবশ্যই তাঁর গুণাবলীর প্রশংসা করবে এবং তাঁকে উচ্চপদে উন্নীত করবে। আবু তালিব তাঁর ভাইপোর জন্য পার্থিব সাফল্য এবং কৃতিত্বের একটি ভবিষ্যৎ কল্পনা করেছিলেন; এটিই আবু তালিবের মতে ছিল “মহান ভবিষ্যৎ”, যা তিনি তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে পয়গম্বরের পার্থিব উন্নতির সব সুযোগ ছিল। তিনি মক্কার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর গুণাবলী তাঁর জীবনে সাফল্যের নিশ্চয়তা বহন করে। একথা সত্য, তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে একটি উট এবং একজন ভৃত্য পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর জন্মগত উচ্চ গুণাবলী মক্কার সবচেয়ে ধনী মহিলা খাদিজাকে মুগ্ধ করেছিল। খাদিজা ছিলেন মক্কার একটি প্রতিষ্ঠিত বণিক পরিবারের একজন চল্লিশ বছর বয়সি বিধবা। পয়গম্বরের বয়স যখন পঁচিশ বছর তখন তিনি তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। খাদিজার সঙ্গে বিয়ে পয়গম্বরকে শুধু সম্পদ ও সম্পত্তি প্রদান করেনি; এটি তাঁর জন্য আরবে এবং তার বাইরেও ব্যবসার একটি বিশাল ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছিল। পয়গম্বরের জন্য একটি সফল এবং আরামদায়ক জীবনযাপনের সব সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনি এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করে নিজের জন্য একেবারে ভিন্ন কিছু বেছে নিয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় এমন একটি রাস্তা নিয়েছিলেন যা কেবলমাত্র জাগতিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলতে পারে। বিয়ের আগে তিনি বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। এখন তিনি সব ছেড়ে দিয়ে তাঁর আজীবনের বৃত্তি, সত্যের সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে সৃষ্টির রহস্য নিয়ে ভাবতেন। সামাজিক মেলামেশা এবং মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে নিজের জন্য একটি জায়গা অর্জনের চেষ্টায় সময় নষ্ট করার পরিবর্তে, তিনি মরুভূমির উপত্যকা এবং পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। প্রায়শই তিনি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে ‘হিরা’ পাহাড়ের একটি গুহায় একাকী অবসর সময় কাটাতেন এবং সেখানেই থাকতেন, যতক্ষণ না তাঁর সঙ্গে থাকা স্বল্প খাদ্য ও পানীয় শেষ হয়ে যায়। তিনি তাঁর রসদ পূরণ করতে পুনরায়

বাড়ি ফিরে যেতেন, এবং তারপর আবার প্রার্থনা ও ধ্যানের জন্য প্রকৃতির নির্জনতায় ফিরে যেতেন। তিনি তাঁর মনে উদ্ভূত প্রশ্নের উত্তরের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করতেন। জীবনে আমাদের প্রকৃত ভূমিকা কী? প্রভু তাঁর দাস হিসেবে আমাদের থেকে কী আশা করেন? আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং মৃত্যুর পরে কোথায় যাব? মানব ক্রিয়াকলাপের জনপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেয়ে তিনি নিজেকে মরুভূমির নিস্তব্ধতার দিকে নিয়ে গেলেন; সম্ভবত, সেখানে, উত্তর পাওয়া সহজ হবে।

রোমানিয়ান প্রাচ্যবিদ কনস্টান ভার্জিল জর্জ (জন্ম ১৯১৬) তাঁর বই, 'দ্য প্রফেট অব ইসলাম'-এ লিখেছেন: 'আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের বন্য অঞ্চলে কিছু সময় না কাটানো পর্যন্ত, মরুভূমির বিশালতা ও প্রশান্তি কীভাবে মানুষের বুদ্ধিকে প্রসারিত করে এবং কল্পনাশক্তিকে শক্তিশালী করে, তা বোঝা যায় না। ইউরোপীয় এবং আরবীয় উদ্ভিদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। মরুভূমির শুষ্ক প্রান্তে এমন কোনো উদ্ভিদ নেই যা মিষ্টি সুবাস ছড়ায় না: এমনকি এই দেশের বাবলা গাছও সুগন্ধযুক্ত। মরুভূমিটি ৩০,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত। এখানে মানুষ যেন সরাসরি ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসে। অন্যান্য দেশগুলি অট্টালিকার মতো, যার বিশাল দেওয়ালগুলি মানুষের দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু আরবের বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত অঞ্চল বাস্তবতার দৃষ্টিপথে কোনো বাধা হয়ে ওঠে না। যেদিকেই তাকানো যায়, সেদিকেই দেখা যায় অন্তহীন বালুরাশি এবং উন্মুক্ত আকাশ। এখানে, ঈশ্বর এবং আজ্ঞাবহ(ফেরেশতা)-দের একাত্ম হতে কাউকে বাধা দেওয়ার মতো কিছু নেই।'-১২

এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিল না — একজন যুবক তাঁর জীবনের প্রথম দিকে এই পথ বেছে নিচ্ছেন। তিনি পার্থিব সুখ ত্যাগ করে কষ্ট ও দুঃখে ভরা পথ বেছে নিচ্ছিলেন। একটি আরামদায়ক জীবনের জন্য তাঁর সমস্ত উপকরণ, উপায় এবং সুযোগ ছিল, কিন্তু তাঁর অশান্ত অন্তর তাদের মধ্যে সন্তুষ্টি খুঁজে পায়নি। তিনি এ সবের কোনো মূল্য দেননি এবং জীবনের রহস্য উন্মোচন না করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। তিনি দৃশ্যমান বাহ্যিক চেহারার উর্ধ্বে অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন এবং জীবনের বাস্তবতা সন্ধান করে ফিরেছিলেন। পার্থিব লাভ-ক্ষতি, আরাম-আয়েশ-দুঃখ, তাঁকে চিন্তিত করেনি; সত্য ও মিথ্যার সকল প্রকার প্রশ্ন তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পয়গম্বরের জীবনের এই পর্যায়টিকে কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে: ‘তিনি কি আপনাকে ইতস্তত বিচরণ করতে দেখেননি, এবং সঠিক পথ নির্দেশ করেননি?’–১৩

এই অংশে ব্যবহৃত ‘বিচরণ’ (‘জাল্লান’) শব্দটি বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে একা দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাছকে বর্ণনা করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তখন পয়গম্বরও ছিলেন সেই সময়কার আরব মরুভূমির বিশাল প্রান্তরের সার্বিক অজ্ঞতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একলা গাছের মতো। এই সমাজে শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত অবস্থানকে সুসংহত করার চিন্তা তাঁর কাছে ঘৃণ্য ছিল। তিনি সত্যের সন্ধান করেছিলেন, এবং সত্যের চেয়ে কম কোনো কিছুই তাঁর অন্তরকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাঁর অনুসন্ধান এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যখন জীবন তাঁর কাছে একটি অসহনীয় বোঝা হয়ে উঠেছিল। কুরআন সেই সময়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে:

আমি কি তোমার হৃদয়কে উঁচু করে দিইনি এবং প্রশস্ত করিনি এবং তোমাকে সেই বোঝা থেকে মুক্তি দিইনি, যা তোমার পিঠে ভার হয়ে ছিল?–১৪

ঈশ্বর, সত্যই, তাঁকে তাঁর বোঝা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর পয়গম্বরের প্রতি দয়া দেখিয়েছিলেন, তাঁর পথকে আলোকিত করেছিলেন এবং তাঁর যাত্রাকালে তাঁকে পথ দেখিয়েছিলেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি, পয়গম্বর একা তাঁর গুহায় বসেছিলেন। ঈশ্বরের ফেরেশতা (আজ্ঞাবহ) মানব রূপে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে সেই শব্দগুলি শিখিয়েছিলেন, যা কুরআনের ৯৬তম অধ্যায়ের শুরুতে দেখা যায়। পয়গম্বরের অনুসন্ধান অবশেষে পুরস্কৃত হয়েছিল। তাঁর অস্থির অন্তর ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। ঈশ্বর তাঁকে শুধু পরামর্শই দান করেননি; তিনি তাঁকে তাঁর পয়গম্বর এবং বিশ্বের বিশেষ দূত হিসাবেও বেছে নিয়েছিলেন। পয়গম্বরের কর্মকাণ্ড পরবর্তী তেইশ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সময়ের মধ্যে কুরআনের সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু চূড়ান্ত ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ হিসেবে তাঁর কাছে প্রকাশ পায়।

ইসলামের পয়গম্বর তাঁর কঠোর সাধনায় জীবনের চল্লিশতম বছরে ‘সত্য’ আবিষ্কার করেছিলেন। যদিও এটি এমন একটি অর্জন ছিল যা স্বাচ্ছন্দ্য

এবং আরামের সূচনা করে না, তবে এই সত্যের স্বরূপ ছিল এই যে, তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। এটা ছিল ঈশ্বরের শক্তির সামনে তাঁর নিজের অসহায়ত্বের আবিষ্কার, সর্বশক্তিমানের অতিপ্রাকৃত বিশালতার সামনে তাঁর নিজের শূন্যতার আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঈশ্বরের বিশ্বস্ত অনুসারীর জন্য এই পৃথিবীতে দায়িত্ব ছাড়া আর কিছুই নেই; তার কোন অধিকার নেই। সত্য উন্মোচিত হওয়ার পর পয়গম্বরের জীবন যে অর্থ বহন করেছিল তা এই কথাগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়ঃ

প্রভু আমাকে নয়টি জিনিস আদেশ করেছেন—

অপ্রকাশ্যে এবং প্রকাশ্যে ঈশ্বরের ভয় থাকতে হবে;

ক্রোধ অথবা শান্ত, উভয় অবস্থাতেই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে;

দারিদ্র্য এবং সচ্ছলতা উভয় ক্ষেত্রেই সংযমী থাকতে হবে;

যারা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে; যারা বঞ্চিত করে, তাদের বঞ্চিত না করে দান করতে হবে;

যারা আমার উপর অন্যায় করে, তাদের ক্ষমা করতে হবে,

আমার নীরবতা যেন হয় গভীর ধ্যান;

আমার কথা যেন ঈশ্বরের স্মরণ (জিকির);

এবং আমার দৃষ্টি যেন হয় গভীর পর্যবেক্ষণ।–১৫

এগুলি কেবল আলঙ্কারিক অভিব্যক্তি ছিল না; এগুলি ছিল পয়গম্বরের জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই ধরণের মর্মস্পর্শী এবং আশ্চর্যজনকভাবে কার্যকর শব্দগুলি একটি শূন্যগর্ভ আত্মা থেকে নির্গত হতে পারে না; তারা নিজেরাই বক্তার অবস্থা নির্দেশ করে; তারা তাঁর অভ্যন্তরীণ সত্ত্বার একটি বহিঃপ্রকাশ, — এক অপ্রশমনীয় আত্মার মুখর প্রকাশ।

তাঁর পয়গম্বরত্বের সূচনা হওয়ার আগেও পয়গম্বরের জীবন একই ধারা অনুসরণ করেছিল। তবে প্রেরণা তখনও অবচেতনে ছিল; পরে এটি চেতনার পর্যায়ে এসেছে। সহজাত প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে করা পূর্বের কাজগুলি ক্রমে গভীর চিন্তার সুপরিচিত ফলাফলে পরিণত হয়েছে। এটি এমন একজনের অবস্থা যিনি বস্তুগত চাহিদাকে ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারেন, যাঁর

জীবন একটি অনন্য ধারার প্রতিভূ। যিনি দেহগতভাবে এই পৃথিবীতে থেকেও আত্মিকভাবে অন্য স্তরে বাস করেন।

পয়গম্বর একবার বললেন, 'একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির কিছু বিশেষ মুহূর্ত থাকা উচিত; ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের একটি মুহূর্ত; আত্ম-পরীক্ষার একটি মুহূর্ত; সৃষ্টির রহস্যের উপর চিন্তনের একটি মুহূর্ত, এবং একটি মুহূর্ত যা সে খাওয়া এবং পান করার জন্য আলাদা করে রাখে।'-১৬

অন্য কথায়, ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাসের দিন এভাবেই কাটে। কখনও কখনও তাঁর আত্মার আকুলতা তাঁকে ঈশ্বরের এত কাছে নিয়ে আসে যে, তিনি প্রভুর সঙ্গে সংযোগস্থাপনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা খুঁজে পান। কখনো কখনো সেই দিনের ভয়ে, যেদিন তাঁকে হিসেব নেওয়ার জন্য প্রভুর সামনে হাজির করা হবে, তাঁকে নিজের সঙ্গে হিসেব করতে বাধ্য করে। কখনও কখনও তিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির বিস্ময় দেখে এতটাই অভিভূত হন যে, তিনি সেখানে স্রষ্টার মাহাত্ম্যের প্রতিফলন দেখতে শুরু করেন। এইভাবে তিনি তাঁর প্রভু, তাঁর নিজের এবং তাঁর চারপাশের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। পাশাপাশি তাঁর শারীরিক প্রয়োজনগুলি পূরণের জনাও সময় খুঁজে নেন।

এই কথাগুলো কোনো দূরবর্তী সত্তার বর্ণনা নয়, এগুলো পয়গম্বরের নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন, তাঁর হৃদয় থেকে উদ্দীপিত হওয়া বিশ্বাসের আলোর একটি ঝলক। এই 'মুহূর্তগুলো' ছিল পয়গম্বরের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে নিজে এই অবস্থাগুলি অনুভব করেনি, সে কখনই এগুলিকে এত মহিমান্বিত ভাবে বর্ণনা করতে পারে না। যে অন্তর থেকে এই শব্দগুলি উৎসারিত হয়েছিল সেই আত্মা নিজেই সেই বর্ণিত অবস্থায় ছিল; আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার সেই অনন্য অবস্থা অন্যদের কাছে তিনি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

তিনি ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করার আগে, এই পৃথিবী — তার সমস্ত ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে — পয়গম্বরের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। এরপর ঈশ্বর তাঁর কাছে এটা প্রকাশ করেন যে, এই জগৎ ছাড়াও আর একটি নিখুঁত ও চিরন্তন জগৎ রয়েছে, যা মানুষের প্রকৃত বাসস্থান। তাখন তিনি বিশ্ব সংসারের নতুন অর্থ খুঁজে পেলেন। তিনি তখন এমন একটি স্তর খুঁজে পেলেন

যেখানে তাঁর আত্মা আশ্রয় পেতে পারে, এমন একটি জীবন যেখানে তিনি সর্বান্তঃকরণে নিজেকে জড়িত করতে পারেন। পয়গম্বর এমন একটি অভীষ্ট জগৎ খুঁজে পেলেন, যা সত্যি করেই তাঁর সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য, তাঁর জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য, যেখানে তিনি তাঁর হৃদয় ও আত্মাকে স্থাপিত করতে পারেন।

এই বাস্তবতা নিছক বৌদ্ধিক স্তরে আবিষ্কৃত হয়নি। যখন এটি দৃঢ়মূল হয়, তখন এই বাস্তবতা একজনকে সম্পূর্ণভাপে পরিবর্তিত করে এবং তার অস্তিত্বের স্তরকে উন্নত করে। ইসলামের পয়গম্বর আমাদের কাছে এই জাতীয় জীবনধারার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদান করেছেন। তাঁর জীবন থেকে পাওয়া সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল, যতক্ষণ না কেউ নিজের অস্তিত্বের স্তরের পরিবর্তন করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার কর্মের পরিধিরও পরিবর্তন করতে পারে না।

হজরত মুহাম্মদ(স.) যখন ইহলোক-পরবর্তী জগতের বাস্তবতা আবিষ্কার করলেন, তখন তা তাঁর সারাজীবনের উপর প্রাধান্য পেল। তিনি নিজেও সেই স্বর্গকে সবচেয়ে বেশি কামনা করেছিলেন, যার খবর তিনি অন্যদের দিয়েছিলেন, এবং তিনি নিজেও সেই নরককে সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিলেন যার বিষয়ে তিনি অন্যদের সতর্ক করেছিলেন। তাঁর অন্তরে সর্বদা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য গভীর উদ্বেগ জেগেছিল। সেই উদ্বেগ কখনো মিনতির আকারে, আবার কখনো হৃদয়গ্রাহী আক্ষেপের আকারে তাঁর ঠোঁটে বেজে উঠত। তিনি সাধারণ মানুষের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানে বসবাস করতেন। এটি অনেক ঘটনা দ্বারা পরিস্ফুট হয়, যার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

একবার পয়গম্বর উম্মে সালামার সঙ্গে বাড়িতে ছিলেন। তিনি দাসীকে ডাকলেন, দাসী আসতে কিছুটা সময় নিলেন। পয়গম্বরের মুখে রাগের চিহ্ন দেখে উম্মে সালামা জানালার কাছে গিয়ে দেখলেন দাসী খেলছে। তিনি যখন এলেন, তখন পয়গম্বরের হাতে একটি মিসওয়াক(-১৭) ছিল। "যদি বিচার দিবসে শাস্তির ভয় না থাকত", তিনি দাসীকে বললেন, "আমি তোমাকে এই মিসওয়াক দিয়ে আঘাত করতাম।" কিন্তু এই মৃদুতম শাস্তিও পরিহার্য ছিল।

বদরের যুদ্ধে বন্দি হওয়া ব্যক্তিরা ছিল পয়গম্বরের চরম শত্রু, তবুও তাদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল প্রশ্নাতীত রূপে সদয়। এই বন্দিদের মধ্যে

একজন ছিলেন সুহাইল ইবন ‘আমর। তিনি একজন জ্বালাময়ী বক্তা ছিলেন। তিনি জনসমক্ষে পয়গম্বর এবং তাঁর কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মানুষকে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে তীব্রভাবে নিন্দা করতেন। ‘উমর ইবন আল-খাত্তাব পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাঁর বাগ্মিতাকে কমিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর নীচের দুটি দাঁত উপড়ে ফেলা হোক। উমরের পরামর্শে পয়গম্বর হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি ‘উমরকে বললেন, “এই অপরাধ করলে ঈশ্বর কেয়ামতের দিনে আমাকে বিকৃত করবেন, যদিও আমি তাঁর বার্তাবাহক।”

এর অর্থ — পৃথিবী হল পরজীবনের আবাদ-ক্ষেত্র। যে ব্যক্তি এই সত্যটি উপলব্ধি করে, সে পরকালের দিকে তাকিয়ে এমন একটি জীবন যাপন করে, যেখানে সমস্ত প্রচেষ্টা সেই পরবর্তী, অনন্ত জগতের সাফল্য অর্জনের জন্য নিবেদিত থাকে। যেখানে জীবনের প্রকৃত মূল্য এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সঙ্গে নয়, মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। একজন সচেতন ব্যক্তি এই সত্যটি উপলব্ধি করেন যে, এই পৃথিবী চূড়ান্ত গন্তব্য নয়; এটি কেবলমাত্র গন্তব্যের দিকে একটি রাস্তা, ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির একটি সূচনা বিন্দু। পার্থিব মানুষেরা প্রতিটি কাজ যেমন পার্থিব স্বার্থের কথা মাথায় রেখে করেন, তেমনি ঈশ্বরের বিশ্বস্ত অনুসারীরা প্রতিটি কাজই পরকালের কথা মাথায় রেখে করেন। জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর পরের জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত বিষয়কে দেখার মনোভাবকে প্রতিফলিত করে। সুখ বা দুঃখ, সাফল্য বা বার্থতা, আধিপত্য বা বিষণ্ণতা, প্রশংসা বা নিন্দা, প্রেম বা রাগ — জীবনের প্রতিটি অবস্থাতেই তারা পরকালের চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয়। শেষ পর্যন্ত এই চিন্তাগুলিই তাদের অচেতন মনের অংশ হয়ে যায়। তারা মরণশীল মানুষ হয়ে বেঁচে থাকে, তবে তাদের মন কেবল অনন্ত জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে, যার ফলে তারা জাগতিক বিষয়ে তাদের আগ্রহ প্রায় হারিয়ে ফেলে।

ক. বিনম্রতা এবং সহনশীলতা

পয়গম্বর অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। আনন্দদায়ক জিনিস তাঁকে খুশি করত এবং দুঃখজনক বিষয়গুলি তাঁর ব্যথার উদ্রেক করত।

যাই হোক, তিনি সর্বপ্রথম এবং সর্বাগ্রে ঈশ্বরের দাস, — এই উপলব্ধি তাঁকে কখনও ঈশ্বরের ইচ্ছার চেয়ে নিজের অনুভূতিকে বেশি গুরুত্ব দিতে দেয়নি।

পয়গম্বরের জীবনের শেষ দিকে মারিয়া কিবতিয়াহ্ তাঁর একটি সুন্দর ও প্রাণবন্ত পুত্রের জন্ম দেন। পয়গম্বর তার নামকরণ করেছিলেন ইবরাহীম, তাঁর সবচেয়ে বিশিষ্ট পূর্বপুরুষের নামানুসারে। আবু রাফি' পয়গম্বরকে সুসংবাদটি দিয়েছিলেন। শুনে তিনি এতটাই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি আবু রাফিকে একজন ক্রীতদাস উপহার দিয়েছিলেন। পয়গম্বর শিশুটিকে কোলে নিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতেন। আরব প্রথা অনুসারে, ইবরাহীমকে একজন পালিতা মা, উম্মে বুরদাহ্ বিনতে আল মুনজির ইবন জায়েদ আনসারীকে স্তন্যপান করানোর জন্য দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন কামারের স্ত্রী। তাঁর ছোট ঘরটি সাধারণত ধোঁয়ায় ভরা থাকত, তবুও, পয়গম্বর দুর্বল অবস্থায়ও তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করতে সেই কামারের বাড়িতে যেতেন। তাঁর চোখ ও নাসারন্ধ্র ধোঁয়ায় ভরে গেলেও তিনি তাঁর ছেলেকে দেখতে যেতেন। ইবরাহীম, যখন তার মাত্র দেড় বছর বয়স, হিজরি দশম বর্ষে (জানুয়ারি ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে) মারা যায়। পয়গম্বর তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন, যে কোনো পিতাই এই কাজ করে। এইদিক দিয়ে পয়গম্বরকে অন্য পিতার মতোই মনে হয়। তাঁর সুখ-দুঃখ ছিল একজন সাধারণ পিতার মতো। কিন্তু সে সবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর হৃদয়কে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর দৃঢ়ভাবে স্থির করেছিলেন। এমনকি তাঁর প্রবল দুঃখের মধ্যেও এই কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করেছিলেন: ঈশ্বর জানেন, ইবরাহীম, তোমার বিদায়ে আমরা কতটা দুঃখিত। চোখ কাঁদে এবং হৃদয় দুঃখ পায়, কিন্তু আমরা এমন কিছু বলব না যা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করতে পারে।

ইবরাহীমের মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে একটি সূর্যগ্রহণের সময়। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বিশ্বাস করত যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয়। মদিনার লোকেরা পয়গম্বরের পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে এই সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত করে। এটি পয়গম্বরকে ব্যথিত করেছিল কারণ স্থানীয় মানুষ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনাটিকে তাঁর শিশু পুত্রের মৃত্যুর প্রতিফলন বলে মনে করে। তিনি লোকেদের একত্রিত করেন এবং তাদের নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন:

'সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ কোনো মানুষের মৃত্যুর কারণে হয় না; এগুলি ঈশ্বরের দুটি নিদর্শন মাত্র। যখন আপনারা কোনো (চন্দ্র বা সূর্য) গ্রহণ দেখবেন, তখন আপনারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন।'

একবার কোনো একটি সফরে পয়গম্বর তাঁর সহযোগীদের একটি ছাগলের মাংসের কাবাব করতে বলেছিলেন। একজন পশু জবাই করতে, অন্যজন তার চামড়া ছাড়াতে এবং আর একজন রান্না করতে এগিয়ে এসেছিলেন। পয়গম্বর বললেন যে তিনি কাঠ সংগ্রহ করবেন। "হে ঈশ্বরের বার্তাবাহক", তাঁর সঙ্গীরা প্রতিবাদ করে বলে ওঠে, "আমরা সব কাজ করব।" "আমি জানি যে আপনারা সেটা সানন্দে করবেন", পয়গম্বর উত্তর দিলেন, "কিন্তু সেটা বৈষম্য করা হবে; আমি তা অনুমোদন করি না। ঈশ্বর পছন্দ করেন না যে তাঁর বান্দারা তাদের সঙ্গীদের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করুক।"

পয়গম্বর নিজে এতই নম্র ছিলেন যে তিনি একবার বলেছিলেন: "ঈশ্বরের শপথ, আমি সত্যিই জানি না, যদিও আমি ঈশ্বরের বার্তাবাহক, আমার কী হবে এবং তোমাদের কী হবে।–১৮

একদিন আবু জার আল-গিফারি একজন কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমানের পাশে বসে ছিলেন। আবু জার তাকে 'কালো মানুষ' বলে সম্বোধন করলেন। এই কথা শুনে পয়গম্বর খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং আবু জারকে সংশোধিত হতে বললেন। "সাদারা কালোদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়", তিনি বললেন। পয়গম্বর তাঁকে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবু জার তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি অনুশোচনায় মাটিতে গড়াগড়ি দিলেন এবং যাকে তিনি সেই অপমানসূচক কথা বলেছিলেন তাকে বললেন, "উঠে দাঁড়াও এবং আমার মুখের উপর তোমার পা ঘষে দাও।"

পয়গম্বর একবার একজন ধনী মুসলমানকে তার পাশে বসা একজন দরিদ্র মুসলমান থেকে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য তার ঢিলেঢালা পোশাক গোটাতে দেখেছিলেন। "তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে ওর দারিদ্র তোমাকেও আঁকড়ে ধরবে?" পয়গম্বর মন্তব্য করেছিলেন।

একবার পয়গম্বরকে জায়েদ ইবন সা'নাহ নামে এক ইহুদির কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিতে হয়েছিল। ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ আসার কয়েকদিন আগে ইহুদি তার টাকা ফেরতের দাবি করতে আসে। সে পয়গম্বরের কাছে গেল, তাঁর জামা চেপে ধরল এবং তাঁকে কঠোরভাবে বলল, "মুহাম্মদ, আপনি কেন আমাকে আমার পাওনা পরিশোধ করছেন না? আমি মুত্তালিবের বংশধরদের সম্পর্কে যা জানি, তারা সবাই তাদের ঋণ পরিশোধ বন্ধ করে দিয়েছে।" 'উমর ইবন আল-খাত্তাব তখন পয়গম্বরের সঙ্গে ছিলেন। তিনি খুব

রেগে যান, সেই ইহুদিকে তিরস্কার করেন, এবং তাকে প্রহার করতে উদ্যত হন। কিন্তু পয়গম্বর শুধু হাসতে থাকেন। তিনি ইহুদিকে যা বলেছিলেন তা হল, "আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য আমার কাছে এখনও তিন দিন বাকি আছে।" তারপর তিনি 'উমরকে সম্বোধন করে বললেন, "জায়েদ এবং আমি আপনার কাছ থেকে আরও ভালো আচরণ পাওয়ার যোগ্য। আমাকে আমার ঋণ পরিশোধে আরও সচেতন হতে বলা আপনার উচিত ছিল এবং পাওনা টাকা পরিশোধের দাবিতে তাকে আরও সদয় হতে বলা উচিত ছিল।" তিনি বলেন, "উমর, তাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান এবং তাকে তার প্রাপ্য পরিশোধ করুন। প্রকৃতপক্ষে, তাকে ২০ সা'আহ্ (প্রায় চল্লিশ কিলো) খেজুর অতিরিক্ত দিন, কারণ আপনি তাকে হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়েছেন।" এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মদিনার মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও পয়গম্বর এমন ধৈর্য এবং নম্রতার সঙ্গে আচরণ করেছিলেন।

পয়গম্বরের জীবন এতটাই সফল ছিল যে, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি প্যালেস্টাইন পর্যন্ত সমগ্র আরবের শাসক হয়েছিলেন। ঈশ্বরের বার্তাবাহক হিসেবে তিনি যা বলেছেন, তাই আইন হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তাঁর অনুসারীদের কাছে তিনি এতটাই শ্রদ্ধেয় ছিলেন যা অন্য কোন মানুষের জন্য কল্পনাও করা যায় না। হিজরি সন ৬-এ 'উরওয়া ইবন মাস'উদকে যখন তাঁর কাছে কুরাইশদের দূত হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, তখন তিনি অবাক হয়ে দেখেছিলেন যে, মুসলমানরা পয়গম্বরের অজু করার জন্য ব্যবহৃত কোনো জল মাটিতে পড়তে দেয় না; সেই জল তাদের হাতে ধরে তারা শরীরে ঘষে নেয়। এমনই ছিল তাঁর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা। পয়গম্বরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী আনাস ইবনে মালিক বলেছেন, পয়গম্বরের প্রতি তাদের প্রচুর ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও, শ্রদ্ধাবশত তাঁরা কখনও তাঁর মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে সরাসরি তাকাতেন না। মুগিরাহ-র মতে, পয়গম্বরের সহযোগীদের কেউ যদি তাঁকে ডাকতে আসতেন, তাহলে সেই ব্যক্তি তাঁর নখ দিয়ে দরজায় মৃদু টোকা দিতেন একবার। এক পূর্ণিমার রাতে, পয়গম্বর একটি লাল চাদরে ঢেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জাবির ইবন সামরাহ্ বলেন, তিনি কখনো চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলেন আবার কখনো পয়গম্বরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, দুইয়ের মধ্যে পয়গম্বর বেশি সুন্দর।

শত্রু পক্ষ থেকে পয়গম্বরের উপর তীর বর্ষণ করা হলে তাঁর অনুসারীরা তাঁর চারপাশে একটি বলয় তৈরি করে তাঁকে রক্ষা করেন এবং তীরের আঘাত তাদের নিজেদের শরীরে গ্রহণ করেন। যেন তারা রক্তমাংসের নন; কাঠের তৈরি ছিলেন। তাদের কারও কারও শরীর থেকে ক্যাকটাস গাছের কাঁটার মতো তীর ঝুলে ছিল।

এতো ভক্তি এবং শ্রদ্ধা একজন মানুষের মধ্যে অহংকার তৈরি করতে পারে এবং শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু পয়গম্বরের ক্ষেত্রে তা হয়নি। তিনি অন্যদের সঙ্গে পড়শির মতোই সাধারণ ভাবে বসবাস করতেন। কোনো তিক্ত সমালোচনা বা উস্কানি তাঁকে তাঁর সংযম থেকে বিচ্যুত করে নি। একবার একজন মরুবাসী তাঁর কাছে এসে তাঁর গায়ের চাদরটি এত জোরে টেনে ধরে যে তাঁর ঘাড়ে একটা দাগ পড়ে যায়। এরপর সে বলে, “মুহাম্মদ! আমাকে জিনিসপত্র বোঝাই দুটি উট দাও, কারণ তোমার কাছে এখন যে ধন-সম্পদ আছে, তা তোমার নয়, তোমার পিতারও নয়।” “সব কিছুই ঈশ্বরের”, পয়গম্বর বললেন, “এবং আমি তাঁর অনুসারী।” তারপর তিনি মরুভূমির বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি আমার সঙ্গে যে আচরণ করেছ, তা কি তোমাকে ভীত করেনি?” সে বলল “না।” পয়গম্বর তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। “আমি জানি যে তুমি মন্দের প্রতিফল মন্দ দিয়ে দাও না।”, লোকটি উত্তর দিল। একথা শুনে পয়গম্বর মুচকি হাসলেন, এবং তাকে তাঁর কাছে থাকা এক উট-বোঝাই বার্লি এবং এক উট-বোঝাই খেজুর দিয়ে বিদায় করলেন।

পয়গম্বর ঈশ্বরের সম্পর্কে এমন ভীতির মধ্যে থাকতেন যে তিনি সর্বদা নম্র ও নিরহঙ্কারী ছিলেন। তিনি খুব কম কথা বলতেন এবং এমনকি তিনি যেভাবে হাঁটা চলা করতেন, তাও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার ইঙ্গিত দিত। সমালোচনা কখনো তাঁকে বিরক্ত করেনি। যখন তিনি তাঁর পোশাক পরিধান করতেন, তিনি বলতেন: “আমি ঈশ্বরের ভৃত্যমাত্র এবং আমি সেই মতোই পোশাক পরিধান করি।” তিনি শ্রদ্ধার ভঙ্গিতে বসে খাবার গ্রহণ করতেন এবং বলতেন, এভাবেই একজন ঈশ্বরের অনুসারীর খাওয়া উচিত।

একবার এক সহযোগী বলতে শুরু করলেন, “যদি এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, এবং পয়গম্বরের ইচ্ছা হয়...” একথা শুনে রাগে পয়গম্বরের মুখের রং বদলে গেল। “আপনি কি আমাকে ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা করছেন?”

তিনি লোকটিকে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। বরং বলুন, “যদি একমাত্র ঈশ্বর চান।” অন্য এক উপলক্ষে পয়গম্বরের একজন সহযোগী বলেন: “যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও তাঁর বার্তাবাহকের অনুগত সে সঠিক পথপ্রাপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি তাঁদের অমান্য করে, সে পথভ্রষ্ট হয়।” “আপনি সবচেয়ে নিকৃষ্ট বক্তা,” পয়গম্বর মন্তব্য করেন। তিনি সেই প্রসঙ্গ অপছন্দ করতেন, যেখানে তাঁকে সর্বশক্তিমানের সঙ্গে একই সারিতে উল্লেখ করা হতো।

পয়গম্বরের তিনটি পুত্র সন্তানের জনক হয়েছিলেন। সকলেই শৈশবে মারা যায়। তাঁর চার মেয়ে, সবই তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদিজার গর্ভে, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিল। ফাতিমা ছিলেন পয়গম্বরের কনিষ্ঠা কন্যা এবং তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। যে কোনো সফর থেকে ফিরে মসজিদে দুই রাকা’ত নামাজ পড়ার পর প্রথমে তিনি ফাতিমাকে দেখতেন এবং তার হাত ও কপালে চুমু দিতেন। জুমাই’ ইবন ‘উমাইর একবার আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলেন পয়গম্বর কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন? “ফাতিমা,” তিনি উত্তর দিলেন।

কিন্তু পয়গম্বরের সমগ্র জীবনই ছিল পরপারের চিন্তায় বিন্যাস্ত। তিনি তাঁর সন্তানদের ভালোবাসতেন, কিন্তু কোনো পার্থিব উপায়ে নয়। ফাতিমার স্বামী ‘আলি ইবন আবি তালিব একবার ইবন ‘আবদুল ওয়াহিদকে পয়গম্বরের সবচেয়ে প্রিয় কন্যা ফাতিমার সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ক্রমাগত পেষাইয়ের কাজ করতে থাকার জন্য তার হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল; ঘাড়ে করে নিয়মিত জল বয়ে আনার কারণে তার ঘাড়ে ঘা হয়েছিল; মেঝে ঝাঁট দিতে দিতে তার কাপড় নোংরা হয়ে গিয়েছিল। যখন পয়গম্বরের কাছে কোনো স্থান থেকে কয়েকজন দাস-দাসী এলো, তখন ‘আলি তাঁর স্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পিতার কাছে গিয়ে কাজ করার জন্য একজন দাস চাইতে পারেন। তিনি গেলেন, কিন্তু ভিড়ের কারণে পয়গম্বরের সঙ্গে কথা বলতে পারলেন না। পরের দিন, পয়গম্বর তাঁদের বাড়িতে আসেন এবং ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করেন তিনি তাঁর সঙ্গে কী কারণে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ‘আলি তখন পয়গম্বরকে পুরো ঘটনা বললেন এবং এও বললেন যে তিনি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। “ঈশ্বরকে ভয় কর, ফাতিমা”, পয়গম্বর বললেন, “ঈশ্বরের প্রতি তোমার দায়বদ্ধতা পূর্ণ করো, এবং তোমার গৃহস্থালির কাজ চালিয়ে যাও। যখন তুমি রাতে ঘুমাতে যাবে, তখন তেত্রিশ

বার ঈশ্বরের প্রশংসা করো, এবং একই সংখ্যক বার তাঁর মহিমা ঘোষণা করো; তাঁর নাম চৌত্রিশ বার উচ্চারণ করো, এবং এইভাবে একটি শতক পূর্ণ হবে। একজন চাকর থাকার চেয়ে এটা অনেক ভালো হবে।” “যদি এটা ঈশ্বর এবং তাঁর পয়গম্বরের ইচ্ছা হয়”, ফাতিমা উত্তর দিলেন, “তাহলে তাই হোক।” পয়গম্বরের একমাত্র উত্তর ছিল এটি। তিনি ফাতিমাকে গৃহকর্মে সাহায্য করার জন্য কোনো দাস বা দাসী দেননি।

পয়গম্বরের কাছে যে সত্যটি প্রকাশিত হয়েছিল তা হল — এই পৃথিবী নিজে থেকে গড়ে ওঠেনি, বরং এক ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, যিনি এটিকে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করেন। সমস্ত মানুষ তাঁর দাস, এবং তাদের কর্মের জন্য তাঁর কাছে দায়বদ্ধ। মৃত্যু মানুষের জীবনের শেষ নয়, বরং এটি অন্য স্থায়ী জগতের সূচনা, যেখানে সুশীল ব্যক্তি স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করবে এবং দুষ্টরা ভয়ানক নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। এই সত্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা দূর-দূরান্তে প্রচার করার নির্দেশও আসে। সেইমতো, সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে পয়গম্বর জনতাকে একত্রিত করলেন। প্রথমে তিনি ঈশ্বরের মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করলেন। তারপর তিনি বলতে লাগলেন; ‘ঈশ্বরের শপথ, তুমি যেমন ঘুমাও তেমনি তোমার মৃত্যু হবে, আর যেভাবে তুমি জেগে ওঠো, সেভাবেই মৃত্যুর পরে তোমাকে পুনরুত্থিত করা হবে; তোমার কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। ভালোকে ভালোর দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে। আর মন্দের প্রতিদান মন্দ হবে: এবং অনন্তকালের জন্য উত্তম ব্যাক্তিরা থাকবে স্বর্গে এবং মন্দরা থাকবে নরকে।’

যে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে সময়ের বিরুদ্ধে যায় তাকে প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তবে এই অসুবিধাগুলি ক্ষতিকারক প্রকৃতির নয়। তারা কারও অনুভূতিকে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে, কিন্তু কারও শরীরকে নয়। সর্বোপরি, তারা একটি পরীক্ষার অংশ যেখানে প্রয়োজন নিশ্চল সহনশীলতা। একজন যখন জনসমক্ষে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের কর্মকাণ্ড গড়ে তোলে, অর্থাৎ যখন সে জনতাকে বলতে শুরু করে, — তাদের কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়, — তখন বিষয়টি একেবারেই ভিন্ন হয়ে যায়। পয়গম্বর শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না; তিনি অন্যদের কাছে ঈশ্বরের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও পেয়েছিলেন। এই ভূমিকাই তাঁকে তার দেশবাসীর সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে নিয়ে আসে। সব ধরণের প্রতিকূলতা,

ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে শুরু করে যুদ্ধের আতঙ্ক, তাঁর ওপর আরোপিত হয়। তবুও তাঁর কর্মকাণ্ডের তেইশ বছর জুড়ে তিনি সর্বদা তাঁর কর্মে ন্যায়পরায়ণ এবং সতর্ক ছিলেন। এটা এমন নয় যে তাঁর মধ্যে কোনো মানবিক অনুভুতি ছিল না এবং তাই তিনি তিক্ততাহীন ছিলেন; বরং তাঁর আচরণ শুধু মাত্র ঈশ্বরের ভয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

পয়গম্বরের মদিনায় অভিবাসনের তিন বছর পর, মক্কার বিরোধীরা মদিনায় আক্রমণ চালায় এবং উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানরা আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু পরবর্তীতে পয়গম্বরের কয়েকজন সহযোগীর ভুলের কারণে শত্রুপক্ষ পিছন থেকে আক্রমণ করে এবং যুদ্ধটিকে তাদের (শত্রুপক্ষের) অনুকূলে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। তখন একটি জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং অনেকেই যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করে। শত্রুর সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পয়গম্বর একাই রয়ে গেলেন। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো তারা তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। পয়গম্বর সহযোগীদের ডাকতে লাগলেন। “হে ঈশ্বরের অনুসারীরা, আমার কাছে ফিরে এসো”, তিনি চিৎকার করে বললেন। “এমন কেউ কি নেই যে আমার জন্য তার জীবন উৎসর্গ করবে, যে এই অত্যাচারীদের আমার কাছ থেকে দূরে রাখবে এবং স্বর্গে আমার সঙ্গী হবে?”

চিন্তা করুন, পরিস্থিতি কতটা ভয়ঙ্কর ছিল, যখন পয়গম্বর এভাবে সাহায্যের জন্য আকুল প্রার্থনা করছেন। তাঁর কয়েকজন সঙ্গী তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু এই সময় এমন বিভ্রান্তি বিরাজ করছিল যে এই বীর সৈন্যরাও তাঁকে পুরোপুরি রক্ষা করতে পারেনি। ‘উতবাহ ইবন আবি ওয়াক্কাস পয়গম্বরের মুখ লক্ষ্য করে একটি পাথর ছুঁড়ে তাঁর নিচের কিছু দাঁত ভেঙে ফেলে। কুরাইশদের একজন বিখ্যাত যোদ্ধা, ‘আব্দুল্লাহ ইবন ক্বমাইয়া, তাঁকে একটি যুদ্ধ-কুঠার দিয়ে আক্রমণ করে, যার ফলে তাঁর শিরস্ত্রাণের দুটি কড়ি তাঁর মুখমণ্ডলে এত গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে আবু উবায়দা সেগুলো বের করার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজের দুটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবন শাহাব জুহরী পয়গম্বরকে পাথর ছুড়ে তাঁর মুখমন্ডলে আঘাত করেন। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে তিনি একটি গর্তে পড়ে যান। যখন দীর্ঘ সময় ধরে পয়গম্বরকে যুদ্ধের ময়দানে দেখা যায় নি, তখন চারিদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে

যে তিনি নিহত হয়েছেন। তখন পয়গম্বরের একজন সহযোগী তাঁকে গর্তে পড়ে থাকতে দেখেন, তাঁকে জীবিত দেখে আনন্দের সঙ্গে কাঁদতে থাকেন, “পয়গম্বর এখানে!” পয়গম্বর তাকে চুপ থাকতে ইশারা করলেন, যাতে শত্রুরা বুঝতে না পারে, যে তিনি কোথায় পড়ে আছেন।

এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে, পয়গম্বর কিছু কুরাইশ কিছু নেতাদের, বিশেষ করে সাফওয়ান, সুহায়েল এবং হারিসের বিরুদ্ধে কিছু অভিশাপ উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, “যে লোকেরা তাদের পয়গম্বরকে আহত করেছে, তারা কী করে কখনও সমৃদ্ধ হবে?” এটাও ঈশ্বরের পছন্দ ছিল না, এবং জিবরায়িল (গ্যাব্রিয়েল) এই ঐশীবাণী নিয়ে এলেন: “তিনি ক্ষমা করবেন, না শাস্তি দেবেন তা আপনার বিচার্য বিষয় নয়। তারা অন্যায়কারী।”

এই ভৎর্সনা পয়গম্বরের জন্য যথেষ্ট ছিল এবং তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয়। আঘাতে পঙ্গু হয়েও তিনি সেই লোকদের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন, যারা তাঁকে আহত করেছিল। আবদুল্লাহ ইবন মাস’উদ পরে স্মরণ করেন কীভাবে পয়গম্বর তাঁর কপাল থেকে রক্ত মুছেছিলেন এবং একই সঙ্গে প্রার্থনা করেছিলেন: “ঈশ্বর, আমার লোকেদের ক্ষমা করুন, কারণ তারা জানে না তারা কী করে।”–২১

পয়গম্বরের জীবনী এই ধরণের ঘটনা দিয়ে পরিপূর্ণ, যা তাঁর জীবনকে মানবজাতির জন্য একটি আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করে। এই ঘটনাগুলি দেখায় যে, আমরা ঈশ্বরের দাস, এবং আমাদের সব অবস্থায় তাই থাকা উচিত। ঈশ্বরের বিনীত দাস হওয়ার কারণে, ঈশ্বরের সামনে এবং পরকালের জীবনের জন্য আমাদের সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা উচিত। মহাবিশ্বের সবকিছু আমাদের ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য পরিবেশিত হয়। আমাদের বোঝা উচিত, প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমানের হাত রয়েছে, এবং প্রতিটি বস্তুই ঈশ্বরের নিদর্শন বহন করে। পার্থিব সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সবকিছু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা হবে। নরকের ভয় আমাদের নম্রভাবে জীবনযাপন করতে শেখায়, এবং স্বর্গের জন্য আকাঙ্ক্ষা আমাদের এই বিশ্বের তাৎপর্যকে বুঝতে সাহায্য করে। ঈশ্বরের মহত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের এতটাই চেতনাপূর্ণ হওয়া উচিত যে, তার সামনে আমাদের নিজস্ব

মহত্ত্ব প্রদর্শনের যে কোনও ধারণা হাস্যকর বোধ হয়। কোনো সমালোচনা যেন আমাদের প্ররোচিত না করে এবং কোনো প্রশংসা যেন আমাদের অহংকারী করে না তোলে। এটাই আদর্শ মানব চরিত্র, যা ঈশ্বর তাঁর পয়গম্বরের আচরণের মাধ্যমে আমাদের সামনে রেখেছিলেন।

৪. মহৎ চরিত্র

কুরআনে হজরত মুহাম্মদ(স.)-কে 'উৎকৃষ্ট চরিত্র'(–২২) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পয়গম্বরের দুটি উক্তি দেওয়া হলো, যা তাঁর 'উৎকৃষ্ট চরিত্রে'র উপর আলোকপাত করে:

"এই কথা বলে নিজের চরিত্রকে কখনই হেয় করবে না যে, কেউ যদি তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তাহলে তুমি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এবং কেউ যদি তোমার ক্ষতি করে, তাহলে তুমি তাদের আরও খারাপ করবে। বরং তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে যাও যারা তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, এবং যারা তোমার ক্ষতি করে, তাদের প্রতি অন্যায় কোরো না।"–২৩

"যারা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাদের সঙ্গে হাত মেলাও, যারা তোমার সঙ্গে অন্যায় করে তাদের ক্ষমা করো এবং যারা ক্ষতি করে, তাদের ভালো করো।"–২৪

এখানে বর্ণিত মহৎ চরিত্রটি সর্বোৎকৃষ্ট আকারে পয়গম্বর স্বয়ং প্রদর্শন করেছিলেন। এই ধরণের চরিত্র আনুষঙ্গিক গুণ হিসাবে সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজন, কিন্তু পয়গম্বরের ক্ষেত্রে এটা ছিল মৌলিক প্রয়োজন।

চরিত্রের দুটি স্তর রয়েছে, একটি সাধারণ এবং একটি উচ্চতর। একটি সাধারণ চরিত্র এই নীতির উপর ভিত্তি করে নির্মিত — 'আপনি যেমন আচরণটি পেয়েছেন, প্রতিদানে তেমনই আচরণ করুন।' এই ধরণের একটি চরিত্রকে 'হঠকারী' বলা যেতে পারে। যারা এই ধরণের চরিত্রের অধিকারী তারা চটজলদি অন্যদের আচরণে প্রতিফলিত প্রতিক্রিয়া দেখায়। যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, যারা তাদের সঙ্গে অন্যায় করে এবং যারা তাদের ক্ষতি করে; তাদের প্রতি যথাক্রমে একইরকম অন্যায় এবং ক্ষতি করা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু উচ্চ স্তরের চরিত্র এই নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে — 'আপনি সেইরকম আচরণ করুন, যা আপনার সঙ্গে হওয়া উচিত ছিল।' যাঁরা এই ধরণের চরিত্রের অধিকারী, বন্ধু এবং শত্রু উভয়েই তাঁদের সঙ্গে কী আচরণ করেছে তার ভিত্তিতে তাঁরা তাদের সঙ্গে প্রতি-আচরণ করেন না। নীতিগতভাবে তাঁরা সকলের সঙ্গেই সমান আচরণ করেন। যারা তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, যারা তাঁদের ক্ষতি করতে চায়, তাদের প্রতিও সমঝোতাপূর্ণ আচরণ করে। এমনকি যারা তাঁদের প্রতি অন্যায় করে, তাঁরা তাদের সকলের প্রতি নিরপেক্ষভাবে সহনশীল ও সহানুভূতিশীল।

ফরাসি দার্শনিক, ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮)-এর মতে, "কেউ তার খানসামার কাছে নায়ক নয়।" এর কারণ হল যে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে একজন খানসামার প্রবেশাধিকার থাকে এবং ব্যক্তিগত জীবনে কেউই নিখুঁত নয়। একজন ব্যক্তির কাছের লোকেরা সাধারণত তাকে এত বেশি সম্মান করে না, যতটা দূরে থাকা মানুষেরা তাকে সম্মানিত করে। কিন্তু হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর জন্য এটি সত্য নয়। ইতিহাস দেখায়, কেউ যত তাঁর কাছে আসত, ততই সে তাঁর সুক্ষ্ম গুণাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হতো।

একবার তায়' নামক গোষ্ঠীর একটি শাখা, বানু কায়েন ইবন জাসর গোষ্ঠীর কিছু সদস্য, বানু মা'আন-এর শিবিরে আক্রমণ করে। লুণ্ঠনের মাঝে তারা জায়েদ নামক এক আট বছর বয়সী বালককে বন্দি করে, যাকে তারা 'উকাজের মেলায় ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে। পরবর্তীতে সে পয়গম্বরের সেবায় এসেছিল। তার মালিকরা পয়গম্বরের সঙ্গে খাদিজার বিয়ের কিছু আগে খাদিজার কাছে তাকে বিক্রি করেছিলেন। ছেলেটির বাবা এবং কাকা অচিরেই তার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারলেন। তাকে উদ্ধার করতে এবং তাদের সঙ্গে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা মক্কায় আসেন। তারা পয়গম্বরের সঙ্গে দেখা করলেন এবং বললেন যে, শিশুটিকে তাঁদের কাছে ফেরত দেওয়া হলে, তারা তার প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেবেন। পয়গম্বর বললেন, তিনি কোনো ক্ষতিপূরণ চান না; যদি জায়েদ তাদের সঙ্গে যেতে চায়, তবে তারা তাকে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি জায়েদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে এই লোকদের চেনে কিনা। জায়েদ বলল, সে চেনে, তারা ছিল তার পিতা ও কাকা। "তারা তোমাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চান।" "আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও

যাব না”, জায়েদ জবাব দিল। তার বাবা এবং কাকা এটা শুনে ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন। “কী, তুমি স্বাধীনতার চেয়ে দাসত্ব পছন্দ করো?” তারা জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি তোমার নিজের লোককে ত্যাগ করে অন্যদের মধ্যে বাঁচতে চাও?” “আমি মুহাম্মদের চেয়ে কাউকে পছন্দ করতে পারি না”, জয়েদ উত্তর দিল, “তাঁর গুণাবলী দেখার পরে তো নয়ই।” তখন তাকে রেখে বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। এমনই ছিল পয়গম্বরের ক্যারিশমা।

হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির আগে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটি তাঁর স্বভাবের অন্তর্নিহিত কোমলতাকে প্রকাশ করে। কুরআন তাঁর এই বৈশিষ্ট্যকে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেছে:

‘ঈশ্বরের করুণায় আপনি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছিলেন। আপনি যদি নিষ্ঠুর এবং কঠোর হৃদয় হতেন, তবে তারা অবশ্যই আপনাকে পরিত্যাগ করত।’-২৫

পয়গম্বরের এই মহানুভবতাই তাঁকে মানুষের হৃদয় অধিকার করার শক্তি দিয়েছিল: কেউ তাঁর যত কাছে আসত, ততই তাঁর মহৎ চরিত্রের অনুগামী হয়ে পড়ত।

পয়গম্বর একবার বলেছিলেন: “সম্পর্কের বন্ধনকে সম্মান করার অর্থ এই নয়, যারা আপনার সম্পর্ককে সম্মান করে তাদের সম্পর্ককে সম্মান করা; এর অর্থ, যারা আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের সঙ্গেও আপনার সম্পর্ককে সম্মান করা।” পয়গম্বরের স্ত্রী এবং আবু বকরের কন্যা আয়েশাকে ব্যভিচারে অভিযুক্ত করার সুবিদিত ঘটনাটি এই নীতির একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত।

এই অভিযোগটি আয়েশার বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল যখন তিনি ঘটনাচক্রে বানু আল-মুস্তালিক (হিজরি সাল ৬)-এর অভিযান থেকে ফিরে আসার সময় পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন, তারপর সাফওয়ান ইবন আল মু’আত্তাল নামে পয়গম্বরের এক যুবক সহযোগী তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, পর্বটি ইসলামি ইতিহাসে ‘অপবাদের ঘটনা’ হিসাবে বিখ্যাত হয়ে আছে। মিসতাহ্ নামে আবু বকরের একজন আত্মীয় এই মিথ্যা অপবাদ তৈরি করে তা দূর দূরান্তে ছড়িয়ে দেওয়া চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন। যখন আবু

বকর জানতে পারলেন যে মিসতাহ্ তাঁর নিষ্পাপ কন্যার চরিত্রহননকারীদের একজন, তখন তিনি মিসতাহকে একজন অভাবী আত্মীয় হিসাবে যে ভাতা দিতেন, তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যখন আবু বকর এই পদক্ষেপ নেন, তখন পয়গম্বরের কাছে কুরআনের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় :

"একজন অভাবী ব্যক্তিকে তার কুকর্মের জন্য আর্থিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। উপরন্তু তাকে ক্ষমা করে সাহায্য করা উচিত। তুমি কি ঈশ্বরের থেকে ক্ষমা আশা করো না? তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।"–২৬

অর্থাৎ, একজন অভাবী মানুষকে তার অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ অর্থসাহায্য বন্ধ করা উচিত নয়। তাকে ক্ষমা করে দিয়ে সাহায্য করতে থাকাই উচিত।

একদিন আবু বকর পয়গম্বরের সঙ্গে বসে ছিলেন, তখন হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে তাঁকে অপমান করতে শুরু করল। আবু বকর শুনলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। লোকটি তাঁকে ক্রমাগত গালি দিতে থাকে। আবু বকর তখনও শান্ত রইলেন। লোকটি যখন তার নোংরা কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, তখন আবু বকর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি এবং জবাব দেন। একথা শুনে পয়গম্বর তক্ষুণি উঠে চলে গেলেন। "কেন আপনি আপনার জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন, ঈশ্বরের পয়গম্বর?" আবু বকর জিজ্ঞাসা করলেন। "যতক্ষণ আপনি নীরব ছিলেন, আবু বকর", পয়গম্বর জবাব দিলেন, "ঈশ্বরের ফেরেশতা (আজ্ঞাবহ) আপনার হয়ে উত্তর দিচ্ছিলেন। কিন্তু আপনি মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতা চলে গেলেন।" এইভাবে পয়গম্বর দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর অবশ্যই একজনের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া প্রতিটি অন্যায়ের হিসাব নেন, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি নিজে প্রতিশোধ নিতে উদ্যোগী হয়ে পড়েন। যে প্রতিশোধ চায়, ঈশ্বর তার কথা শোনেন না। স্পষ্টতই প্রতিশোধ আরও সম্পূর্ণ হবে যদি তা ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

পয়গম্বর একবার এক ইহুদি পণ্ডিতের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। কিছু দিন পর ইহুদি তার ঋণ পরিশোধের দাবিতে আসেন। "এই মুহূর্তে, আমার কাছে তোমাকে পরিশোধ করার মতো কিছু নেই", পয়গম্বর তাঁকে বললেন। "আপনি আমাকে টাকা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে যেতে দেব না," ইহুদি জবাব দিলেন। ইহুদি ব্যক্তিটি সেখানে

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত থেকে গেলেন, এবং পয়গম্বরকে কার্যত বন্দি করে রেখেছিলেন। এই সময়ে পয়গম্বর মদিনার প্রতিষ্ঠিত শাসক ছিলেন; তাঁর কাছে ইহুদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সহযোগীরা লোকটিকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পয়গম্বর তাঁদের কোনো পদক্ষেপ নিতে নিষেধ করেছিলেন। "একজন ইহুদি আপনাকে বন্দি করে রেখেছে" তাঁদের একজন প্রতিবাদ করেন। "সত্য," পয়গম্বর উত্তর দিলেন, "কিন্তু ঈশ্বর আমাদের কারো প্রতি অন্যায় করতে নিষেধ করেছেন।" রাত পেরিয়ে ভোর হল। ভোরের আলোয় ইহুদির চোখ খুলে গেল। পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সহনশীলতা দেখে তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হলেন; তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এই ইহুদি, একজন ধনী ব্যক্তি, আগের দিন পয়গম্বরকে আটক করেছিলেন কিন্তু পয়গম্বরের মহৎ আচরণ তাঁর উপর এমন প্রভাব ফেলেছিল যে, তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ পয়গম্বরকে দিতে রাজি হলেন; তিনি হজরত মুহাম্মদ(স.)-কে বললেন, "এই সম্পদ আপনার ইচ্ছামতো খরচ করুন।"

আবদুল্লাহ ইবন আবি আল-হাসমা' একবার পয়গম্বরের সঙ্গে একটি লেনদেন করেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে কোনো জরুরি কাজে বাড়ি যেতে হল। "এখানে অপেক্ষা করুন", তিনি পয়গম্বরকে বললেন। "আমি ফিরে এলে আমরা বিষয়টি মিটিয়ে ফেলব।" বাড়িতে পৌঁছে তিনি কিছু কাজে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েন যে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ভুলে যান। তিন দিন পরে তাঁর সেই বিষয়টি মনে পড়ে এবং সেই স্থানে ফিরে যান। তিনি দেখতে পান যে পয়গম্বর তখনও অপেক্ষা করছেন। তিনি শুধু বললেন, "আবদুল্লাহ ইবন আবি আল- হাসমা, তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ; আমি এখানে তিন দিন ধরে অপেক্ষা করছি।" এই ধরণের আচরণের একটি শক্তিশালী চুম্বকত্ব রয়েছে, যা এমনকি সবচেয়ে কঠোর ব্যক্তিও প্রতিরোধ করতে পারে না।

একবার একদল রাব্বি পয়গম্বরের কাছে এলেন। যখন তাঁরা প্রবেশ করলেন, সাধারণ 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম না দিয়ে তাঁরা বললেন, 'আসসামু আলাইকুম', যার অর্থ "তোমার মৃত্যু।" আয়েশা এটা শুনেছিলেন, এবং নিজেকে সামলাতে পারেন নি। "তার বদলে তোমার মৃত্যু হোক", আয়েশা বললেন, "ঈশ্বর তোমাদের ধ্বংস করুন"। পয়গম্বর আয়েশাকে এভাবে উত্তর

দিতে নিষেধ করলেন। “ঈশ্বর কোমল,” তিনি বললেন, “এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।” সত্যিকার অর্থে, রূঢ় কথার বিনিময়ে নরম কথা ফিরিয়ে দেওয়ার চেয়ে একজন ব্যক্তির মন জয় করার জন্য কার্যকরী উপায় আর নেই। সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব, কিন্তু মহৎ আচরণ নিজেই এমন একটি শক্তি যা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। এটা সব পরিস্থিতিতে জয় নিশ্চিত করে।

পয়গম্বরের মতো একজন ব্যক্তির কাছে এটা কতটা ভয়ানক ছিল — যখন রাত নেমে আসছিল, তখন তিনি দেখতে পেলেন তা’ইফের দুষ্টু ছেলেরা তাঁকে শহরের বাইরে তাড়িয়ে দিচ্ছে এবং পাথর ছুঁড়ে মারছে। তা’ইফ ছিল সেই জায়গা যেখানে হিজাজের অভিজাতরা তাদের গ্রীষ্মের দিনগুলিতে থাকত। তাদের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে দিতে পয়গম্বর মক্কা থেকে পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন। কিন্তু তা’ইফের অভিজাতরা তাঁর মঙ্গলময় কথায় কান দেয়নি; পরিবর্তে তারা রাস্তার ভবঘুরেদের তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। তারা তাঁকে রাত নামা পর্যন্ত তাড়া করতে থাকে। তাঁর শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল এবং সম্পূর্ণভাবে ক্লান্ত হয়ে তিনি একটি আঙুর বাগানে আশ্রয় নেন। এটা যে কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা মনে হবে। পয়গম্বর একবার তাঁর স্ত্রী আয়েশাকে বলেছিলেন, এটা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন রাত। কিন্তু এই কঠিন মুহূর্তেও পয়গম্বর তাঁর শত্রুদের কোনো ক্ষতি করতে চাননি। তিনি শুধু বলেছিলেন: “ঈশ্বর, ওদের পথ দেখান, কারণ ওরা জানে না ওরা কী করছে।” পয়গম্বরের চরিত্র এমনই মহৎ ছিল। এই মহত্ত্ব শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরোধীদের দমন করে সমগ্র আরবকে ইসলামের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসে। তাঁর মহৎ চেতনার শক্তিই সকলকে তাঁর পথে জয় করতে যথেষ্ট ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভালোর যে ঐশ্বরিক শক্তি মূর্ত ছিল, কোনো কুসংস্কার, বৈরিতা অথবা বিদ্বেষের পক্ষে তা প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না।

ক. রুক্ষতাহীন আচরণ

হুদায়বিয়াতে (ষষ্ঠ হিজরি) পয়গম্বর কুরাইশদের সাথে যে সন্ধি করেছিলেন তার একটি শর্ত ছিল, কোনো মক্কাবাসী যদি ইসলাম গ্রহণ করে

এবং মদিনায় বসতি স্থাপন করতে চায় তবে তাঁকে অবশ্যই কুরাইশদের কাছে সমর্পণ করতে হবে। কিন্তু যদি মদিনার কোনো মুসলমান মক্কায় যায়, মক্কাবাসীরা তাকে মদিনায় ফেরত পাঠাবে না। এই চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার অল্পকাল পরেই আবু জান্দাল নামে মক্কার এক যুবক মক্কা থেকে পালিয়ে হুদায়বিয়ায় চলে আসেন। তাঁর শরীরে শিকলের আঘাতে তৈরি হওয়া অনেক কাঁটাছেড়া ও ক্ষতচিহ্ন ছিল। "আমাকে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাও!" তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কেঁদে কেঁদে বলছিলেন। এটি ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল মুহূর্ত। হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সহযোগীরা তাদের তরবারি হাতে তুলে নেন। আবু জান্দালকে দেখে তাঁদের অনুভূতি এমন মাত্রায় জেগে উঠেছিল যে, তাঁদের অধিকাংশই চুক্তি ভঙ্গ করে তাঁর জীবন বাঁচাতে চেয়েছিল। এদিকে কুরাইশরা পয়গম্বরকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, এটি এমন একটি উপলক্ষ যেখানে তিনি তাদের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল, তা মেনে চলতে বাধ্য হবেন।

অবশেষে পয়গম্বর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি যে শর্তে সহমত হয়েছিলেন, তিনি তা থেকে সরে যেতে পারেন না। এটা মুসলমানদের জন্য বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত ছিল, তবুও আবু জান্দালকে কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আপাতভাবে মনে হতে পারে যে, পয়গম্বর নিপীড়নের শিকার একজন নিরপরাধ মানুষকে তার নিগ্রহকারীদের খপ্পরে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শের উপর কাজ করছিলেন। এই স্তরের উচ্চ নৈতিক আচরণ দেখে জান্দালের নিগ্রহকারীরা সম্পূর্ণ হতচকিত এবং বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। তারপরে আবু জান্দালকে নিয়ে যাওয়া এবং তাকে বন্দি করা তাদের পক্ষে আর সাধারণ বিষয় ছিল না; উল্টে ঘটনাটি ইসলামের নৈতিক উত্তরণের পাশে তাদের নিজস্ব অধঃপতনের প্রতীক হয়ে ওঠে। ইসলামের এই উচ্চ নৈতিক মানের দ্বারা মক্কার লোকেদের হৃদয় জয় করে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল, এবং তাদের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। মক্কায় আবু জান্দালের উপস্থিতি পয়গম্বরের প্রচারিত মতের সত্যতার জীবন্ত প্রমাণ হয়ে ওঠে। বন্দি হিসেবেও আবু জান্দাল তাঁর অপহরণকারীদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠেন। শেষমেশ, তাঁরা মনে করেন, তাকে মুক্ত করা এবং মক্কা থেকে নির্বাসিত করা বুদ্ধিমানের কাজ।

পয়গম্বর যখন মদিনায় বসবাস করছিলেন, এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক

নেতৃত্ব অর্জন করেছিলেন, তখন তিনি কয়েকজন অশ্বারোহীকে নাজদ-এ প্রেরণ করেছিলেন। সেখানকার বাসিন্দারা ছিল তাঁর কট্টর শত্রু। পথিমধ্যে তারা ইয়ামামাহ্ শহরের শাসক সামামা ইবন উত্থালের দেখা পেল। তারা তাঁকে বন্দি করে মদিনায় নিয়ে আসে এবং মসজিদের স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রাখে। পয়গম্বর তার খোঁজ নিতে এলেন। "তুমি যদি আমাকে হত্যা কর", সামামা বলল, "আমার লোকেরা আমার রক্তের প্রতিশোধ নেবে, এবং যদি তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি সর্বদা তোমার কাছে ঋণী থাকব। যদি তুমি টাকা চাও, তবে আমি তোমাকে যত খুশি টাকা দিতে প্রস্তুত।" পয়গম্বর সামামাকে হত্যা করেননি, কিন্তু তাঁর মানবিক আচরণের মাধ্যমে তিনি তার অন্তর জয় করেছিলেন। মুক্তির পর, সামামা নিকটবর্তী একটি বাগানে যান, স্নান করেন এবং তারপর মসজিদে ফিরে আসেন। লোকেরা আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল তিনি কিসের জন্য ফিরে এসেছেন। কিন্তু যখন তিনি উচ্চকণ্ঠে ঈমানের সাক্ষ্য উচ্চারণ করে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন, তখন সবাই বুঝতে পারে যে, সামামাকে মুক্ত করে পয়গম্বর আসলে তাকে সর্বকালের জন্য বন্দি করে ফেলেছেন। তখন সামামা মক্কায় তীর্থযাত্রায় যান। মক্কার লোকের যখন তাঁর ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা শুনলো, তখন তারা তাঁকে বলল, তিনি তাঁর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। "আমি আমার বিশ্বাস হারাইনি," সামমা উত্তর দিলেন, "বরং আমি ঈশ্বর ও তাঁর পয়গম্বরের বিশ্বাস গ্রহণ করেছি।" এরপর সামামা ইসলামের শক্তির উৎস হয়ে ওঠেন।

ইয়ামামাহ ছিল মক্কাবাসীদের জন্য শস্য সংগ্রহের অন্যতম প্রধান স্থান। সামামা তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর অনুমতি ছাড়া তিনি তাদের একটি শস্যও দেবেন না। সামামার ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, আপাতভাবে মহৎ আচরণের কোনো মূল্য নেই বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এটা এমন একটি বিষয় যা বিশ্ব জয় করতে পারে।

নীতিশাস্ত্রের উচ্চ বিধি অবলম্বন করার অর্থ হল — একজন যা বলে, নিজে তা পালন করে; দুর্বলদের প্রতি একই সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন করে যা সে শক্তিশালীদের প্রতি দেখায়; নিজের জন্য যে মান নির্ধারণ করে অন্যদের জন্য তা-ই নির্ধারণ করে; সে কখনও তার নীতি থেকে বিচ্যুত হয় না; অন্যেরা অধঃপতনের গভীরে গিয়ে পড়লেও সে তার উচ্চ নৈতিকতা

বজায় রাখে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ইসলামের পয়গম্বর মানব নৈতিকতার সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনি যে উচ্চ মানগুলি প্রচার করেছিলেন তা কখনও ত্যাগ করেননি। অবস্থা সুবিধাজনক হোক বা বিরোধপূর্ণ হোক, তিনি কখনো অনৈতিক আচরণ করেননি। এই ব্যাপারে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো তাঁর নিকটতম সঙ্গীদের সাক্ষ্য।

সা'ঈদ ইবন হিশাম ছিলেন হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর প্রত্যক্ষ অনুসারীদের পরবর্তী প্রজন্মের একজন। তিনি একবার পয়গম্বরের বিধবা স্ত্রী আয়েশাকে তাঁর প্রয়াত স্বামীর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। "তিনি কুরআনের মনুষ্যরূপ ছিলেন", 'আয়েশা উত্তর দেন। অর্থাৎ পয়গম্বর তাঁর নিজের জীবনকে আদর্শ জীবনের নিদর্শন অনুসারে সাজিয়েছিলেন, যা তিনি কুরআনের আকারে অন্যদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। আনাস ইবন মালিক দশ বছর ধরে পয়গম্বরের সান্নিধ্যে ছিলেন। তিনি বলেছেন যে, পয়গম্বর কখনো তাঁকে তিরস্কারও করেননি। "যখন আমি কিছু করতাম, তিনি কখনই আমার কার্যপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি; এবং যখন আমি কিছু করে উঠতে পারিনি, তিনি কখনোই আমার ব্যর্থতা নিয়ে তিরস্কার করেননি। তিনি ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভালো স্বভাবের।" আয়েশার মতে, পয়গম্বর কখনও কোনো ভৃত্য, কোনো মহিলা বা অন্য কাউকে মারধর করেন নি। তিনি সর্বদা ন্যায়ের জন্য লড়াই করেছিলেন। তাঁকে যদি দুটি বিকল্পের মধ্যে বেছে নিতে হতো, তাহলে তিনি অপেক্ষাকৃত সহজ পথটি বেছে নিতেন — অবশ্য যদি তাতে পাপ জড়িত না থাকে। পাপ এড়াতে তাঁর মতো কেউ এত বেশি সতর্ক থাকত না। তিনি কখনও নিজের জন্য করা কোনো অন্যায়ের প্রতিশোধ নেননি। কেবলমাত্র ঐশ্বরিক আদেশ ভঙ্গ হলেই তিনি ঈশ্বরের পক্ষ থেকে তাঁর নির্দেশক্রমে প্রতিশোধ নিতেন।

হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর এই আচার-আচরণই তাঁকে শত্রুদের চোখেও সম্মানীয় করে তুলেছিল। তাঁর অনুসারীরা সকল প্রকার কষ্ট ও দুর্দশার মধ্যেও তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। বিজয় ও আধিপত্যের সময়ে যেমন তিনি প্রিয় ছিলেন, দুঃসময়েও তিনি ছিলেন সমান প্রিয়। তাঁর নিকটবর্তী অনুসারীরা তাঁকে খুঁজে পেয়েছিল ত্রুটিমুক্ত ভাবে; দূর থেকেও তিনি ছিলেন একইরকম। তিনি মানবজাতিকে অনুকরণীয় আচার-আচরণের এক অনবদ্য আদর্শ প্রদান

করেছিলেন। যে নীতির উপর পয়গম্বর তাঁর জীবন ধারণ করেছিলেন, তা তাঁর মহিমান্বিত স্বভাবের মতোই ছিল। এই নীতিগুলি কখনই অন্তর্হিত হয়নি। এগুলো তাঁর জীবনে একটি স্থায়ী স্থান করে নিয়েছিল। যারা তাঁর পথ অনুসরণ করে এবং যারা তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল বা তাঁর ক্ষতির কারণ হয়েছিল, তাদের সকলের জন্য তিনি সমানভাবে তাঁর নীতি প্রয়োগ করেছিলেন।

এমনকি প্রাক-ইসলামি যুগেও, যা অজ্ঞতার যুগ বা জাহেলিয়াতের যুগ নামে পরিচিত, কা'বাহর দ্বাররক্ষকের পদটি উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীনকাল থেকে এই কাজটি একটি নির্দিষ্ট পরিবারের জন্য বরাদ্দ ছিল। হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সময়ে সেই পরিবারের একজন সদস্য, 'উসমান ইবন তালহা দ্বাররক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন।

আল-বুখারি, পয়গম্বরের ঐতিহ্য (হাদিস)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলক, পয়গম্বর মদিনায় চলে যাওয়ার আগে কীভাবে প্রার্থনার জন্য কা'বাহর ভিতরে যেতে চেয়েছিলেন, তা বর্ণনা করেছেন। তিনি উসমানের কাছে চাবি চাইলেন, যাতে তিনি দরজা খুলতে পারেন। উসমান প্রত্যাখ্যান করলেন এবং পয়গম্বরকে অপমান করলেন। "উসমান," পয়গম্বর বললেন, "হয়তো তুমি দেখতে পাবে একদিন আমার হাতে এই চাবিগুলো থাকবে। আমার ইচ্ছামতো সেগুলো ব্যবহার করার ক্ষমতা আমার থাকবে।" "সেদিন কুরাইশদের জন্য অপমান ও দুর্ভোগের দিন হবে, যেদিন কা'বাহর চাবি তোমার মতো একজনকে হস্তান্তর করা হবে।", উদ্ধত 'উসমান জবাব দিয়েছিলেন।

তারপর এমন একটা সময় আসে যখন পয়গম্বর মক্কা জয় করেন এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হন। পবিত্র নগরীতে প্রবেশের পর তিনি সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিলেন, তা হল ঈশ্বরের ঘরে যাওয়া। তিনি সাতবার কা'বাহ শরীফ প্রদক্ষিণ করেন। তারপর তিনি 'উসমান ইবন তালহাহকে ডেকে পাঠালেন। এক হিসাব অনুযায়ী, হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে 'উসমান ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিলেন। পয়গম্বর তার কাছ থেকে চাবি নিলেন, কা'বাহর দরজা খুলে ভিতরে গেলেন। তিনি কিছুক্ষণ সেখানে রইলেন, এবং তার দেওয়ালের মধ্যে যে মূর্তিগুলি ছিল, সেগুলি ভেঙে ফেললেন।

তারপর চাবি হাতে নিয়ে বাইরে এলেন। তাঁর ঠোঁটে ছিল কুরআনের

এই আয়াত: 'ঈশ্বর আপনাকে আপনার কাছে গচ্ছিত সম্পত্তি তাদের সঠিক মালিকদের কাছে প্রত্যর্পণ করার আদেশ দিচ্ছেন।'-২৭

তখনই পয়গম্বরের খুড়তুতো ভাই এবং জামাতা 'আলি ইবন আবি তালিব উঠে দাঁড়ালেন: "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন", তিনি পয়গম্বরকে বললেন, "কিন্তু আমরা, বানু হাশিম গোষ্ঠীর মানুষরা সবসময় তীর্থযাত্রীদের জন্য জল বহনের দায়িত্ব পালন করেছি। এখন সময় এসেছে দ্বাররক্ষীর দায়িত্ব নেওয়ার।" 'আলিকে উত্তর না দিয়ে পয়গম্বর জিজ্ঞাসা করলেন, "উসমান ইবন তালহাহ্ কোথায়?" তিনি এগিয়ে এলে পয়গম্বর তাঁর হাতে চাবি তুলে দেন। "'উসমান", তিনি বললেন, "এই হল তোমার চাবিকাঠি। আজ ধর্মনিষ্ঠা এবং প্রতিশ্রুতি পূরণের দিন। এরপর থেকে এগুলি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তোমার পরিবারের কাছেই থাকবে। কেবল অন্যায়কারীরাই তোমার কাছ থেকে এই চাবিগুলি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে।"

হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর এই পদক্ষেপটি দেখিয়ে দেয় যে, বাধ্যবাধকতা পূরণ এবং আমানত ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত। এমনকি যাদের সঙ্গে তারা লেনদেন করছে, তারা যদি তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করে, তাহলেও তাদের সম্পূর্ণ প্রাপ্য পরিশোধ করা উচিত। যত আঘাতই আসুক না কেন, কখনোই জনগণের অধিকার অস্বীকার করা উচিত নয়।

জাগতিক লোকেরা যখন ক্ষমতা লাভ করে, তখন তারা প্রথম যে কাজটি করে সেটা হল, — তারা তাদের প্রতিপক্ষকে শাস্তি দেয়, তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেয় এবং তাদের পরিবর্তে তাদের নিজস্ব লোকজন বসায়। ক্ষমতায় আসা সব মানুষই সমর্থক বা প্রতিপক্ষের নিরিখে সমস্ত কথা চিন্তা করে। সমর্থকদের তুলে ধরা এবং বিরোধীদের অবনমিত করা, তাদের নীতির একটি অপরিহার্য অংশ। কিন্তু ইসলামের পয়গম্বর যখন আরবে ক্ষমতা লাভ করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করেন। তিনি সমর্থক ও প্রতিপক্ষের দিক থেকে বিষয়গুলিকে বিবেচনা করলেন না; তিনি কেবল যা সঠিক এবং ন্যায্য, তাই বিবেচনা করলেন। তিনি সমস্ত ক্ষোভ ও বিরূপতা ত্যাগ করে, সকলের সঙ্গে সংবেদনশীলতা ও ন্যায়বিচারের প্রেক্ষিতে আচরণ করলেন।

৫. পয়গম্বরের জীবনের শিক্ষা

ক. সংযম–এর পুরস্কার

বিশ্বস্তদের উদ্দেশ্যে কুরআনে বলা হয়েছে: 'ঈশ্বরের দূতের মধ্যে তাদের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্তমান, যারা ঈশ্বর এবং শেষের দিনের দিকে নজর রাখে, এবং সব সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করে।'–২৮

এই আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, প্রতিটি মানুষের অনুসরণের জন্য হজরত মুহাম্মদ(স.)–এর জীবন একটি আদর্শ উদাহরণ। কিন্তু প্রকৃত সুফল তাঁরাই পাবেন, যাঁদের মধ্যে ঈশ্বরের ভয় ইতিমধ্যেই গভীর, যাঁদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বর চেতনায় কেন্দ্রীভূত, যাঁরা ঈশ্বরের শাস্তির ভয়ে একটি সংযত জীবন কাটান। যাঁরা চিরন্তন সুখের চিন্তাকে লালন করেন, এবং তাঁদের সত্তার প্রতিটি তন্ত্র দিয়ে যথার্থভাবে চিরন্তন সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁরাই পয়গম্বরের উদাহরণ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন।

কেন এমনটাই হতে হবে? এর কারণ হল, কেউ যদি সত্যের সন্ধান করতে চান, তবে সেই সন্ধানে তাঁকে আন্তরিক হতে হবে। যদি কেউ "ঈশ্বর এবং শেষ দিনের দিকে তাকান" তবে তিনি অবশ্যই, এগুলোর প্রতি আন্তরিক হবেন। আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারাই তিনি পয়গম্বরের জীবনকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারবেন এবং তা থেকে সঠিক শিক্ষা নিতে পারবেন।

এই বিষয়টি একটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায়। হাদিসে পয়গম্বরের নিম্নোক্ত উক্তিটি রয়েছে:

'যে ব্যক্তি তার সম্পত্তি রক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ। যে নিজের জীবন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে একজন শহীদ। যে নিজ ধর্ম রক্ষায় নিহত হয়, সে একজন শহীদ। যে তার পরিবারের প্রতিরক্ষায় নিহত হয়, সে একজন শহীদ।'–২৯

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট, এই হাদিসটি 'নিহত হওয়া' বিষয়ে কথা বলে,

যুদ্ধের বিষয়ে নয়। হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর কথার অর্থ এই নয়, যখনই কারও সম্পত্তি, জীবন, ধর্ম বা পরিবার বিপদের সম্মুখীন হয়, তখনই তাকে অস্ত্রের আশ্রয় নিতে হবে — এমনকি তার ফলে একজন নিহত হলেও। তিনি যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা হল, যদি এই কারণে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করা হয়, তবে তার মৃত্যু শহীদের মৃত্যু বলে বিবেচিত হবে। তাহলে হাদিসটি যুদ্ধের জন্য প্ররোচনা নয়; যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁরা শহীদত্ব বা শাহাদত প্রাপ্ত হবেন, এটি তার প্রতিশ্রুতি।

যারা ধর্মের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আন্তরিক নয়, বরং নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে পয়গম্বরীয় অনুমোদনের সিলমোহর দেওয়ার বিষয়ে বেশি আগ্রহী, তারা হাদিসের শব্দগুলি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করবে এবং তাদের স্বার্থপর কোন্দল ও জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্বকে মান্যতা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করবে। তারা বলবে, ইসলাম মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য দাঁড়াতে শেখায়; এটি আপনাকে আপনার বিশ্বাস, আপনার জীবন এবং সম্পত্তি, আপনার পরিবার এবং আত্মীয়কে রক্ষার জন্য লড়াই করার আহবান জানায়। যদি আপনি বিজয়ী হন, তবে আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জন করেছেন; এবং যদি আপনি পরাজিত হন, তাহলে আপনি একজন শহীদ, এবং শাহাদাত শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান মানুষই অর্জন করতে পারে।

কিন্তু যারা ঈশ্বরকে ভয় করে, তারা বিষয়টিকে গভীরভাবে দেখবে। তারা গভীরভাবে চিন্তা করে নিজেদের প্রশ্ন করবে: যদি তোমাদের সম্পত্তি, জীবন, ধর্ম ও পরিবার রক্ষায় যুদ্ধ করা প্রয়োজন হয়, তাহলে পয়গম্বর তাঁর নিজের জীবনে কেন তা করেননি? পয়গম্বর কেন, প্রকাশ্য নিপীড়নের মুখে, অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন, এবং অন্যদেরও একই কাজ করার উপদেশ দিয়েছিলেন?

উদাহরণস্বরূপ, আবু ‘উসমান আল-নাহদীর বর্ণনার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি ইবন হিশাম লিপিবদ্ধ করেছেন। যখন সুহায়ব মদিনায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন কুরেইশরা তাঁকে বলে, “তুমি আমাদের কাছে নিঃস্ব এবং অসহায় অবস্থায় এসেছিল। আমাদের সঙ্গে থাকা অবস্থায় তুমি ধনী হয়েছ, অবশেষে তুমি তোমার বর্তমান সম্পদশালী অবস্থায় পৌঁছেছ। তুমি কি মনে করো আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব? তুমি তোমার সব কিছু সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে

যাবে? সুহায়ব জিজ্ঞেস করলেন, "আমি যদি আমার সমস্ত সম্পদ তোমাদের কাছে হস্তান্তর করি, তাহলে কি তোমরা আমাকে ছেড়ে দেবে?" তারা তাতে রাজি হল; তখন তাঁর যা কিছু ছিল সুহায়ব সবই তাদের দিয়ে দিলেন। পয়গম্বর একথা শুনে বললেন, "সুহায়বের জন্য ভালো হল, সে প্রকৃতই লাভবান হয়েছে।"

পূর্বে উল্লিখিত হাদিসের অর্থ যদি এই হয় যে, নিজের সম্পত্তি রক্ষার জন্য যে কোনো পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করা এবং প্রাণ দেওয়া অপরিহার্য, তাহলে হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর উচিত ছিল সুহায়বের কাজের জন্য তাকে অভিনন্দন জানানোর পরিবর্তে তার ব্যর্থতার জন্য তাকে তিরস্কার করা।

আবু জান্দালের ঘটনাও (প্রথম পর্ব, চতুর্থ অধ্যায় দেখুন) এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে। যখন, হুদায়বিয়ায়, হিজরি ৬ সালে, শান্তি চুক্তি আলোচনার সময় কুরেইশ যুবক আবু জান্দাল রক্তাক্ত ও শৃঙ্খলিত অবস্থায়, মুসলমানদের কাছে কাতর অনুরোধ করেন যে, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা যেন তাঁকে আর পৌত্তলিকদের কাছে ফেরত না পাঠান, তখন পয়গম্বর আদেশ দেন যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে। "আবু জান্দাল," তিনি বলেন, "ধৈর্য্য ধরো। ঈশ্বর তোমাকে এবং তোমার সঙ্গে যারা নির্যাতিত হয়েছে, তাদের কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন।"

পূর্বে উল্লিখিত হাদিস যদি অবস্থা নির্বিশেষে একজনকে যুদ্ধ করতে এবং শহীদ হওয়ার প্রাথমিক নির্দেশ দেয়, তবে পয়গম্বর আবু জান্দালকে ধৈর্য্য ধরে রাখার আহ্বান জানাতেন না; বরং তাকে শাহাদত চাইতে বলতেন; তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আবু জান্দালের পক্ষে যুদ্ধ করতেন।

এই হুদায়বিয়ার ঘটনার সময়ে কুরাইশরা পয়গম্বরকে বলেছিল যে, তারা তাঁকে সে বছর মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। এটা মেনে নিয়ে, 'ঈশ্বরের গৃহ' কা'বা পরিদর্শনের জন্য জোর না করে পয়গম্বর মদিনায় ফিরে আসেন। এটা ছিল সম্পূর্ণ ধর্মীয় ব্যাপার; প্রকৃতপক্ষে, পয়গম্বর তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণায় কাজ করেছিলেন। তারপরও, তিনি সরে দাঁড়ান। পূর্বে উল্লিখিত হাদিসটি যদি আসলেই যুদ্ধ এবং শহীদ হওয়ার কথা উল্লেখ করত, তাহলে পয়গম্বর সে বছরই ঈশ্বরের গৃহ

পরিদর্শনের জন্য জোর দিতেন, তাতে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হোক বা তাঁকে শহীদ হতে হোক, যাই হোক না কেন।

'আম্মর ইবন ইয়াসির এবং তার পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণ করার সময় তারা মক্কার বানু মাখজুম গোষ্ঠীর ক্রীতদাস ছিলেন। বানু মাখজুম গোষ্ঠীর কাছে তাদের এই সপরিবার ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়া অভিসম্পাত স্বরূপ ছিল। তারা দুপুরের রোদে ওই পরিবারটিকে মরুভূমিতে নিয়ে যেত এবং উত্তপ্ত বালির উপর তাদের শুইয়ে দিত, এবং তাদের উপর নির্মম নির্যাতন করত। এমনকি তারা 'আম্মারের মাকে হত্যা পর্যন্ত করেছিল।

এই ঘটনাটি বর্ণনা করে পয়গম্বরের জীবনীকার ইবন হিশাম লিখেছেন:

"পয়গম্বর যখন তাদের পাশ দিয়ে যেতেন, আমি যা শুনেছি, তখন তিনি তাদের বলতেন: 'ইয়াসিরের পরিবার, ধৈর্য ধরো, স্বর্গ তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান।"-৩০

উপরে উল্লিখিত হাদিসটি যদি আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হতো, তাহলে ইয়াসিরের প্রতি হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর উপদেশ কাপুরুষতাকে উৎসাহিত করার সামিল বলে বিবেচিত হতো। পয়গম্বর নিশ্চয় কখনো এমন উপদেশ দিতেন না। বরং তিনি ইয়াসিরকে যুদ্ধ করে শহীদ হওয়ার আহ্বান জানাতেন। তিনি অবশ্য নিজেই এই পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, ফলাফল ইয়াসিরের মুক্তি হোক বা তাঁর নিজের শাহাদত হোক।

বস্তুত, হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর দৃষ্টান্তকে একাধিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, এবং তা ভুল বা সঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে। যদি কেউ আন্তরিক হয় তবেই পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং এটি কেবলমাত্র ঈশ্বরের ভীতি থেকে আসা বাস্তববাদের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে।

পয়গম্বরের জীবনের এই ঘটনাগুলো যখন মানুষ আন্তরিকভাবে বিবেচনা করে, তখন তাদের মনে কিছু প্রশ্ন জাগে। তারা কেবল সেই অর্থ খোঁজেন না, যা তাদের উদ্দেশ্য সাধন করবে; বরং তারা পয়গম্বরের দৃষ্টান্তের সঠিক অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। এই পদ্ধতি তাদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে দূরে রাখে। তারা বিষয়টিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখেন এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে তারা

বিষয়টির গভীরে পৌঁছাতে সক্ষম হন। তারা বুঝতে পারেন, এর মূল শিক্ষা হলো — বড় লাভের জন্য ছোট ক্ষতি সহ্য করতে হবে।

একজন আস্তিকের মনে যে বিবেচনাটি সর্বাগ্রে আসা উচিত তা হল ইসলামের স্বার্থ, তার নিজস্ব স্বার্থ নয়। ইসলামের বাণী প্রচারে তাদের ব্যস্ত থাকাতে হবে। যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সত্যপ্রচারের স্বার্থের মধ্যে কোনো বিরোধ তৈরি হয়, তবে সত্যের প্রচারই প্রাধান্য পাবে। সত্যপ্রচারের স্বার্থে উপরে বর্ণিত পরিস্থিতিতে পয়গম্বর ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র সত্যের প্রচারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার স্বার্থে পয়গম্বর তাঁর জীবনে সকল প্রকার ব্যক্তিগত, আর্থিক ও গার্হস্থ্য ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেছেন। তিনি জানতেন যে, সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কাজ করলে মুসলমানদের ইহকাল ও পরবর্তী জীবন সফলতা পাবে।

যখন কারো জীবনে একটি উদ্দেশ্য থাকে, তখন সেই উদ্দেশ্যটি অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর প্রাধান্য লাভ করে। এটি অর্জনের জন্য একজন ব্যক্তি জীবনে কিছু ক্ষতি সহ্য করে নেবেন। এই ধরণের উদ্দেশ্যের অভাবে মানুষ প্রতিটি তুচ্ছ বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোনো ছোট ক্ষতি এড়ানোর জন্য, বড় ক্ষতি সহ্য করে। ঈশ্বরের বাণীর প্রচারকরা হলেন বিশ্বের সবচেয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণ মানুষ: তাঁরা তাঁদের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের জন্য ছোটখাটো ক্ষতি সহ্য করেন। তাঁরা অন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলেন, কারণ এটি তাঁদের ধর্মপ্রচার কাজের জন্য ক্ষতিকর হবে। তাঁরা কেবল আত্মরক্ষার জন্যই সক্রিয় হতে বাধ্য হন, কারণ এটি তাঁদের বৃহত্তর লক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করে না।

এই কথাটি মাথায় রেখে, আসুন, আমরা হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর জীবনে ঘটা কিছু নৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করি।

খ. হতাশার কাছে কখনোই নত না হওয়া

পয়গম্বরের সময়ে প্রচলিত গোষ্ঠী ব্যবস্থা এমন ছিল, যা ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদান করত। কদাচিৎ কেউ সেই সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারত। মক্কায় কাটানো সময়কালের প্রাথমিক পর্বে, হজরত মুহাম্মদ(স.), তাঁর কাকা, বানু হাশিম গোষ্ঠীর প্রধান আবু তালিবের সুরক্ষা উপভোগ করেছিলেন।

তাঁর কর্মকাণ্ডের দশম বছরে, আবু তালিব মারা যান, এবং আবু লাহাব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। যেহেতু আবু লাহাব তাঁকে কোনো সুরক্ষা দিতে অস্বীকৃত হন, পয়গম্বর অন্য গোষ্ঠীগুলির থেকে সুরক্ষা খুঁজতে শুরু করেন, যাতে তিনি তাঁর প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি তা'ইফে গিয়েছিলেন।

জায়েদ ইবন হারিসকে সঙ্গে নিয়ে পয়গম্বর মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে একটি উর্বর মরূদ্যান তাইফে ৬৫ মাইল ভ্রমণ করেছিলেন। সেই শহরে তাঁর কিছু আত্মীয় ছিল, কিন্তু সেই সময় তিনজন ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা ছিল: 'আব্দ ইয়ালাইল, মাস'উদ এবং হাবিব। পয়গম্বর তাঁদের তিনজনের সঙ্গেই দেখা করলেন এবং তিনজনই তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে, এমনকি তাঁকে সুরক্ষা দিতেও অস্বীকার করলেন। "আমি পবিত্র কা'বাহ্ ঘরের পর্দা ছিঁড়ে ফেলব, যদি ঈশ্বর তোমাকে তাঁর পয়গম্বর করে থাকেন," তাদের একজন বলল। "ঈশ্বর কি তাঁর পয়গম্বর হিসাবে পাঠানোর জন্য অন্য কাউকে খুঁজে পেলেন না?" আর একজন বিদ্রূপ করলেন। তৃতীয়জন বললেন, "আমি শপথ করছি যে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব না। আপনি যদি একজন সত্যিকারের পয়গম্বর হন, তবে আমার এই শপথ আপনার জন্য অপমানকর, এবং আপনার দাবি যদি মিথ্যা হয়, তবে তা আমার জন্য অপমানকর হবে।"-৩১

ঈশ্বরের বার্তাবাহক নিরাশ হয়ে প্রত্যাবর্তন শুরু করলেন। কিন্তু তারপরও তা'ইফবাসীরা তাঁকে একা ছাড়েনি। তারা দুষ্টু ছেলেদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল, তারা পাথর ছুঁড়ে এবং গালাগালি দিয়ে তাঁকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিল। জায়েদ তার কম্বল দিয়ে পয়গম্বরকে আড়াল করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয়নি: তিনি মাথা থেকে পা পর্যন্ত জখম হয়েছিলেন।

শহরের বাইরে কিছু দূরে 'উতবাহ ও শায়বাহ নামে দুই ভাইয়ের একটি আঙুরের বাগান ছিল। ঈশ্বরের বার্তাবাহক যখন সেখানে পৌঁছালেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে; তিনি সেখানে আশ্রয় নিলেন। তাঁর শরীর ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু ঠোঁটে ছিল প্রার্থনা। "ঈশ্বর," তিনি চিৎকার করে বললেন, "আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে একা ছেড়ে দেবেন না।"

'উতবাহ এবং শায়বাহ দুজনেই মূর্তিপূজক ছিল, কিন্তু পয়গম্বরের অবস্থা দেখে তারা তাঁর প্রতি করুণা করেছিল। 'আদ্দাস নামে তাদের একজন খ্রিস্টান ক্রীতদাস ছিল। তারা তাকে কয়েক থোকা আঙুর এনে সেগুলি তাদের

অতিথির সামনে বাটি করে নিয়ে যেতে বলেছিল। তাকে যেমন বলা হয়েছিল, ‘আদ্দাস তেমনটি করল: সে পয়গম্বরের কাছে কিছু আঙুর নিয়ে এলো এবং সেগুলি খাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। পয়গম্বর সেগুলি খাওয়ার জন্য হাতে নিয়ে ঈশ্বরের নাম পাঠ করলেন। আদ্দাস হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর মুখের দিকে তাকাল। “ঈশ্বরের দিব্যি,” সে বলল, “এই দেশের লোকেদের জন্য এই কথাগুলি উচ্চারণ করা স্বাভাবিক নয়।” তখন পয়গম্বর ‘আদ্দাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোথা থেকে এসেছে এবং তাঁর ধর্ম কী। ‘আদ্দাস উত্তর দিল যে সে একজন খ্রিস্টান এবং ইরাকের নিনেভে থেকে এসেছে। “সুতরাং তুমি ম্যাথিউর পুত্র, জোনাহ-র শহরের বাসিন্দা,” পয়গম্বর বললেন। “আপনি ম্যাথিউর পুত্র জোনাহ-কে কীভাবে জানেন?” ‘আদ্দাস জানতে চাইল। “তিনি একজন পয়গম্বর ছিলেন, আমিও তাই,” পয়গম্বর বললেন। এ কথা শুনে ‘আদ্দাস হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর মাথা, হাত ও পায়ে চুম্বন করল।

‘উতবাহ এবং শায়বাহ এসব দেখছিল। তারা একে অপরকে বলল, “দেখো, এই লোকটি আমাদের ভৃত্যকে প্রভাবিত করেছে।” ‘আদ্দাস ফিরে আসার পর তারা ‘আদ্দাসকে বলল, “তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তুমি কেন ওই লোকটির মাথা, হাত, পায়ে চুম্বন করলে?” “প্রভু”, আদ্দাস উত্তর দিল, “পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে বড় আর কিছু নেই। তিনি আমাকে এমন কিছু বলেছিলেন যা একজন পয়গম্বর ব্যতীত কেউ প্রকাশ করতে পারে না।” তারা আবার বলেছিল, “তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। সাবধানে থেকো, সে যেন তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়; কেননা তোমার ধর্ম তার ধর্মের থেকে উত্তম।”

একটি যাত্রাপর্বে ঈশ্বরের পয়গম্বরের সঙ্গে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর লোক তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আচরণ করেছিল: একজন তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল, দ্বিতীয়জন তাঁর জন্য আতিথেয়তা প্রসারিত করেছিল; তৃতীয়জন তাঁর পয়গম্বরত্ব স্বীকার করেছিল।

এই ঘটনা থেকে একটি বড় শিক্ষা পাওয়া যায়, এই পৃথিবীতে সম্ভাবনার কোনো শেষ নেই। আপনি যদি একটি খোলা সমভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে সেখানে অবশ্যই একটি গাছের ছায়া থাকবে যেখানে আপনি বিশ্রাম পাবেন।

কেউ যদি আপনার সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করে তবে হতাশ হবেন না; কারণ আপনি যদি সত্যের পথে থাকেন, এবং অন্যদের দ্বারা এই ধরণের আচরণের প্রতি নেতিবাচকভাবে সাড়া না দেন, তবে ঈশ্বর অবশ্যই আপনার সাহায্যে আসবেন। কেউ কেউ আপনার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যপূরণে যদি একত্রিত নাও হয়, তবুও আপনি অন্যদের হৃদয়ে নিশ্চয় একটি জায়গা পাবেন।

গ. পয়গম্বরকে অভিবাসনে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল

৬০৯ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় প্রচারকার্য শুরু করার সময় হজরত মুহাম্মদ(স.) মারাত্মক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যখন তিনি মক্কার বিধর্মীদের সামনে ইসলামের বাণী পেশ করেন, তখন তারা গর্বের সাথে উল্লেখ করে যে, তারা ইতিমধ্যেই মহান ধর্মীয় কাজে জড়িত রয়েছে। “আমরা কেন মুসলমান হব,” তারা প্রতিবাদ করে, “যখন আমরা পবিত্র মসজিদের দেখাশোনা করি এবং তীর্থযাত্রীদের জল দিই?” তাদের যুক্তির নিন্দায় কুরআনের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে:

‘তোমরা কি মনে করো যে, তীর্থযাত্রীদের জল পান করানো এবং পবিত্র মসজিদের দেখাশোনা করা, তাদের কাজের সমতুল্য যারা ঈশ্বর এবং শেষ-বিচারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করে? এই বিষয়গুলি ঈশ্বরের কাছে সমান নয়। তিনি অন্যায়কারীদের পথপ্রদর্শন করেন না। যারা এই সত্য বিশ্বাস গ্রহণ করেছে এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে তাদের ধন-সম্পদ ও লোকজনের দ্বারা ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করেছে, তারা ঈশ্বরের কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তারাই সফল হবে।’-৩২

প্রাথমিকভাবে, ইসলামের পয়গম্বরের বাণীর পেছনে ধারণাগত সত্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এটি একটি বিমূর্ত বার্তা ছিল, তার সঙ্গে কোনো বস্তুগত মহিমা সংযুক্ত ছিল না। অন্যদিকে, মক্কার কা’বাহ তার অনবদ্য স্থাপত্য এবং গৌরবময় ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। কা’বাহর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল, এমনকি এটি গৌরবের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, ইসলামের পয়গম্বরের বাণীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা, এমন একটি ধর্মে বিশ্বাসের সমান, যেটি তখনও

নিজের ক্ষমতা জাহির করেনি এবং দেওয়ার মতো কোনও বৈষয়িক সুযোগ সুবিধাও তার অধিগত ছিল না।

তাই মক্কার লোকেরা তাঁকে ব্যার্থ করার জন্য যা যা করা সম্ভব তাই করেছিল, এবং তাঁকে যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এতে তাঁর লক্ষ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হতে থাকে এবং অবশেষে ইসলামের বার্তা মদিনার জনগণের কাছে পৌঁছে যায় এবং তাদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মক্কায় হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সঙ্গে অন্যান্য মুসলমানরাও নির্যাতিত হয়েছিল। পয়গম্বর তাদের মদিনায় যেতে বললেন, যেখানে তাদের মুসলিম ভাইরা, যারা তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল, তাদের অভ্যর্থনা জানাবে। একে একে মুসলমানরা মদিনায় চলে যেতে শুরু করেন। কুরাইশরা যখন এই কথা জানতে পেরেছিলেন, তারা মুসলমানদের মক্কা ছেড়ে যেতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন: তারা কাউকে মারধর করেছিলেন, কাউকে বন্দি করেছিলেন; কিন্তু যে কোনোভাবে অধিকাংশ মুসলমানই মদিনায় তাঁদের আশ্রয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হন।

অবশেষে (৬২২ খ্রিস্টাব্দ) পয়গম্বরের পালা এলো। কুরাইশরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাকি মুসলমানরা মদিনায় নিরাপদে পৌঁছে গেলে, পয়গম্বর নিজে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বেশি সময় নেবেন না। বানু হাশিম ব্যতীত কুরাইশদের সমস্ত গোষ্ঠীর নেতারা কুসায় ইবন কিলাবের বাড়ির বিশাল হলটিতে মিলিত হন, যেখানে এই জাতীয় সমস্ত সভা অনুষ্ঠিত হতো। বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু অবশেষে সবাই একমত হয়েছিলেন যে প্রতিটি উপজাতি থেকে একজন ব্যক্তি মুহাম্মদ(স.)-কে আক্রমণ করে হত্যা করায় অংশগ্রহণ করবে। এইভাবে তাঁর রক্ত সর্বমোট এগারোটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হবে; বানু হাশিম, পয়গম্বর যে গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন, তাদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না পেরে ক্ষতিপূরণে রাজি হয়ে যাবে। পরের রাতে, তারা সকলে মিলে হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর বাড়ি ঘেরাও করে তাঁর বেরিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে; যাতে অতর্কিতে হামলা করে তারা তাঁকে হত্যা করতে পারে।

পয়গম্বর বুঝতে পারেন কী ঘটতে চলেছে। তিনি নিঃশব্দে তাঁর প্রস্তুতি চালিয়ে যান। পরিকল্পনা মতো সেই রাতেই তিনি আবু বকরের সঙ্গে মক্কা ত্যাগ

করেন। পয়গম্বর বুঝতে পারলেন যে, তাঁর চলে যাওয়ার খবর কুরাইশদের কাছে পৌঁছালে তারা তাঁর খোঁজে অনুসন্ধান দল পাঠাবে। তাই তিনি এবং আবু বকর মক্কা থেকে চার মাইল দূরে স'ওর পাহাড়ের একটি গুহায় লুকিয়ে ছিলেন। তাঁরা সেখানে কয়েকদিন থাকার পরিকল্পনা করেছিলেন, যতক্ষণ না কুরাইশরা তাদের অনুসন্ধান বন্ধ করে দেয় এবং তাঁরা দুজন নির্বিঘ্নে মদিনায় যেতে পারেন।

কুরাইশ ঘোড়সওয়াররা পয়গম্বরকে সর্বত্র খুঁজতে থাকে। একটি অশ্বারোহী দল স'ওর পর্বতে তাঁর গোপন আস্তানায় পৌঁছাতে খুব বেশি সময় নেয়নি। সেই সশস্ত্র বাহিনী গুহার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল; পয়গম্বর এবং আবু বকর তাদের পা দেখতে পান। তাঁরা যে গুরুতর বিপদের মধ্যে আছেন তা অনুধাবন করে, আবু বকর পয়গম্বরকে বললেন: "শত্রুরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে।"

পয়গম্বর তাঁকে আশ্বস্ত করলেন: "চিন্তা করবেন না, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা মাত্র দুজন," তিনি শান্তভাবে বললেন, "কিন্তু দুজন ব্যক্তির সঙ্গে তৃতীয় সঙ্গী হিসাবে যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহলে আপনি কী বুঝবেন?"

ঘ. ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ আস্থা

পয়গম্বরের যাতুর-রিকা' (হিজরি সাল ৪) নামে পরিচিত একটি অভিযানের সময় একটি ঘটনা ঘটেছিল। আল-বুখারিতে তা লিপিবদ্ধ আছে। হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর জীবনীতেও এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। জাবির থেকে বর্ণিত-

"আপনারা কি চান আমি মুহাম্মদকে হত্যা করি?" এই ভয়ঙ্কর প্রশ্নটি বানু গাতফান গোষ্ঠীর একজন সদস্য, গাওরিস ইবন আল-হারিস তার গোষ্ঠীর লোকদের কাছে করেছিল। উত্তরটি ভীষণভাবে ইতিবাচক ছিল, তবে তারা জানতে চেয়েছিল এটি কীভাবে সম্ভব হবে। গাওরিস আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিল, "আমি তাকে অতর্কিতে ধরে ফেলব এবং মেরে ফেলব" এবং ঠিক এটাই সে করতে চলল। যখন সে মুহাম্মদ(স.) এবং তাঁর সঙ্গীদের শিবিরে পৌঁছাল, তখন সে তার মুহূর্তটি ভালোভাবে বেছে নিয়েছিল। সে অপেক্ষা করতে লাগল যতক্ষণ না পয়গম্বর এবং তাঁর সঙ্গীরা গাছের ছায়ায় নিরস্ত্র হয়ে বিশ্রামের জন্য

বসে। পয়গম্বর একাই শুয়ে পড়লেন, এবং তাঁর তরবারিটি তাঁর উপরে গাছের শাখা থেকে ঝুলে রইল। গাওরিস তীরবেগে এগিয়ে গেল, অস্ত্রটি হাতে তুলে নিয়ে হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। "আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?" সে হজরত মুহাম্মদ(স.)-কে যুদ্ধে আহ্বান করল, সন্দেহ নেই যে তিনি এই মুহূর্তটি উপভোগ করছিলেন। "ঈশ্বর," পয়গম্বর খুব সহজভাবে উত্তর দিলেন। ভীত হয়ে গাওরিস বলল, "আমি যে তরবারি ধরে আছি, সেটির দিকে তাকাও! তোমার ভয় করে না?" "অবশ্যই না" পয়গম্বর বললেন। "আমি কেন ভয় করব, যখন আমি নিশ্চয় জানি যে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন?" পয়গম্বরের আত্মবিশ্বাস গাওরিসকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, এবং তার সাহস দমে গেল। পয়গম্বরকে আক্রমণ না করে সে তরবারিটি খাপে পুরে তাঁকে ফেরত দেয়। তারপর পয়গম্বর তাঁকে বসিয়ে দেন এবং সহযোগীদের ডেকে তাদের কাছে পুরো ঘটনাটি বলেন। গাওরিস ভীত হয়ে পড়ে, যে কোনো মুহূর্তে তাঁকে হত্যা করা হবে। কিন্তু পয়গম্বর কোনো শাস্তি না দিয়ে তাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন।"-৩৩

যারা ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখে তারা কাউকে বা কোনোকিছুকে ভয় পায় না। ঈশ্বর হলেন জীবন্ত এবং সর্বশক্তিমান সত্তা, যিনি সর্বদা সাহায্য করার জন্য আছেন — এই বিশ্বাস তাদেরকে যেকোনো শক্তির মুখোমুখি হতে সাহসী করে তোলে। শত্রুর মুখোমুখি হলে একজন মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তার নির্ভীকতা। কোনো শত্রুকে ভয় কোরো না, তাহলে শত্রু তোমাকে ভয় করতে শুরু করবে।

৬. একটি মতৈক্যে পৌঁছানো

বদরের যুদ্ধের (হিজরি সাল ২) কিছুকাল আগে কুরাইশরা ষাট জন লোকসহ একটি বিশাল পণ্যবাহী কাফেলা সিরিয়ায় পাঠিয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালে কুরাইশরা বদরে মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়েছিল, তাদের সেনাপতি আবু সুফিয়ান সফলভাবে এই কাফেলাকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের মাধ্যমে মক্কার লোকেরা তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ, একটি উপকূলীয় পথ দিয়ে মক্কায় পাঠাচ্ছিল। বদরের যুদ্ধে পরাজয় কুরাইশদেরকে

মুহাম্মদ(স.) ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মরিয়া করে তুলেছিল। তাই তাদের নেতারা ‘দার উন-নাদওয়াহ’ (অধিবেশন কক্ষ)-এ মিলিত হয়েছিল, যেখানে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে কাফেলার অংশীদারদের শুধুমাত্র তাদের মূলধন ফেরত নিতে হবে; লাভের অংশটি যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করতে হবে। লাভের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ দিনার, সেই সময়ে এটা ছিল একটা বিশাল অঙ্ক।

কুরাইশরা ব্যাপক প্রস্তুতি নেয় এবং হিজরি সাল ৩-এ মদিনার দিকে অগ্রসর হয়।

হজরত মুহাম্মদ(স)-এর মদিনায় আসার মাত্র তিন বছর পর উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কুরাইশদের অগ্রসর হওয়ার খবর পয়গম্বরের কাছে পৌঁছালে তিনি তাঁর সঙ্গীদের ডেকে পাঠালেন। তাদের অধিকাংশই শহরের ভেতর থেকে আক্রমণের মোকাবিলা করার বিষয়ে সমর্থন জানিয়েছিল। তাদের মধ্যে একদল তরুণ এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী ছিল। তারা প্রতিবাদ করেছিল, ‘আমরা যদি শহরে থাকি, তাহলে শত্রুরা এটিকে কাপুরুষতা এবং দুর্বলতার চিহ্ন হিসাবে ব্যাখ্যা করবে; তাই লড়াইটি শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া উচিত।’ ‘আবদুল্লাহ ইবন উবাই অবশ্য নেতৃস্থানীয় সহযোগীদের সঙ্গে একমত ছিলেন।-৩৪

শহরের মধ্যে থেকে আক্রমণের মুখোমুখি হওয়া উচিত — এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে তাদের উপযুক্ত যুক্তি ছিল। মদিনার ভূগোলে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা ছিল। দক্ষিণে এত ঘন খেজুরের বাগান ছিল যে, সেই দিক থেকে আক্রমণ করা ছিল অসম্ভব। পূর্ব এবং পশ্চিমে ছিল উঁচু পাহাড়, যে কোনো আক্রমণকারীর জন্য একটি প্রাকৃতিক বাধা সৃষ্টি করত। তখন একটাই উন্মুক্ত পথ ছিল, যেখান থেকে মদিনা আক্রমণ করা সম্ভব ছিল। শহরটি নিজেই ছিল একটি প্রাকৃতিক দুর্গের মতো। সেই শহর ছেড়ে বাইরে থেকে যুদ্ধ করতে যাওয়ার অর্থ চার দিক থেকে শত্রুর আক্রমণের জন্য নিজেকে উন্মুক্ত করা; যেখানে শহরের মধ্যে থেকে যুদ্ধ করলে কেবল একটি দিকে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে হতো। এই কারণে মদিনার অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান পরবর্তীকালে খন্দকের যুদ্ধে (ব্যাটল অব দ্য ট্রেঞ্চ) কাজে লাগানো হয়। শহরের একমাত্র উন্মুক্ত দিক, উত্তর-পশ্চিম বরাবর একটি পরিখা খনন করা হয়েছিল।

যদিও ‘আবদুল্লাহ ইবন উবাই সহ বেশিরভাগ নেতৃস্থানীয় সহযোগী, শহরের মধ্যে থেকে আক্রমণ মোকাবিলা করার পক্ষে ছিলেন, পয়গম্বর তরুণ মুসলমানদের ইচ্ছা মেনে নেন এবং এক হাজার সৈন্যদল সহ তিনি শহর ছেড়ে উহুদের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সঠিক পরামর্শকে অবমাননা করা হয়েছে ভেবে আবদুল্লাহ ইবন উবাই গভীরভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে গেলেন, কিন্তু মুসলমানরা উহুদে পৌঁছানোর আগেই তিনি ৩০০ অনুগামীসহ ফিরে যান। “তিনি তাদের সঙ্গে একমত, আমার সঙ্গে নয়”, আবদুল্লাহ ইবন উবাই সখেদে বলেন, “তাই আমি বুঝতে পারছি না কেন আমরা এই যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের ধ্বংস করব।”-৩৫

উহুদে মুসলমানদের পরাজয় প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, শহরের ভেতর থেকে আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার কৌশলটি বেশি উপযুক্ত ছিল। তাই, খন্দকের যুদ্ধে (হিজরি সাল ৫) এই কৌশলটি যথাযথভাবে গৃহীত হয়েছিল। পয়গম্বরের সকল নেতৃস্থানীয় সহযোগীরা অবশ্য তাদের মতানৈক্য ভুলে মুসলিম সেনাবাহিনীতে থেকে যান। যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা পয়গম্বরের সঙ্গে থেকে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। শুধুমাত্র ‘আব্দুল্লাহ ইবন উবাই নিজেকে মুসলিম বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন এবং সেই কারণে তিনি ‘ভণ্ডদের নেতা’ হিসাবে পরিচিত হন। নীতিগতভাবে, আবদুল্লাহ ইবন উবাইর মতামত সঠিক ছিল; যুদ্ধের ময়দানে অভিজ্ঞতার দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু, যদিও তিনি সঠিক ছিলেন, তার অবাধ্যতা ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তা সীমালঙ্ঘনের একটি দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল।

ইসলাম পরামর্শকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। প্রত্যেকেরই তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। যদি প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, তাহলে কোনো নীতিই কার্যকরভাবে অনুসরণ করা যায় না। কার্যক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি পথ অনুসরণ করতে হয়। তাই সেই পথটি কী হওয়া উচিত তা নিয়ে যখন মতবিরোধ থাকে, তখন সবার দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। যথার্থ মুসলমানদের উচিত, তাদের মতামত পেশ করার পর, নিজের ব্যক্তিগত মতামত ভুলে যাওয়া

এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সিদ্ধান্ত তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত ভেবে, সেই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা।

নিজের মতামত ত্যাগ করার চেয়ে বড় ত্যাগ আর কিছু নেই। যেমন একটি ইমারত তৈরি করতে হলে যথেষ্ট সংখ্যক ইট মাটিতে পুঁতে দিতে হয়, তেমন একটি শক্তিশালী সমাজও তখনই তৈরি হতে পারে যখন ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব মতামতকে ওই ইটের মতো মাটিতে প্রোথিত করে ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও অন্যদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। এটাই একমাত্র ভিত্তি যার উপর একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে; যেমন একটি ইমারতের ভিত্তির জন্য ইট জরুরি, তেমনি মানব সমাজের ভিত্তির জন্য এটা জরুরি।

হিজরি ৮ সালে মুতা অভিযান সংঘটিত হয়। এই অভিযান সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবন জারির আল-তাবারির বর্ণনার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো।

আবু কাতাদাহ্ আমাদের বলেন যে, পয়গম্বর মুতায় একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। তিনি জায়েদ ইবন হারিসকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন; যদি তিনি নিহত হন তবে জা’ফর ইবন আবু তালিব দায়িত্ব গ্রহণ করবেন; এবং যদি তিনিও ঘটনাক্রমে নিহত হন, তবে দায়িত্ব বর্তাবে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার উপর। পয়গম্বরের সিদ্ধান্ত শুনে জা’ফর লাফিয়ে উঠলেন এবং বললেন যে তিনি জায়েদের অধীনে কাজ করবেন না। পয়গম্বর তাকে সঙ্গে যেতে বললেন, “কারণ তুমি জানো না তোমার জন্য সর্বোত্তম কী।” এরপর সেনাবাহিনী রওনা হয়।-৩৬

ঈশ্বরে বিশ্বাসী একজন মানুষ ফেরেশতা (আজ্ঞাবহ) নন; তিনি অন্য যেকোনো মানুষের মতো একজন নশ্বর মানুষ। তবুও, একজন বিশ্বাসী এবং অন্য যে কোনও মানুষের মধ্যে একটি বিশাল পার্থক্য রয়েছে। অ-বিশ্বাসীরা জানে না কীভাবে ভুল এবং বিকৃত ধারণাগুলি তাদের মনে স্থির করে নেওয়ার পরে ফিরে যেতে হয়। সঠিক বা ভুল যাইহোক না কেন, তারা তাদের মতামতে অটল থাকে। তারা যুক্তিযুক্ত মতামতের পরিবর্তে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসরণ করে।

অন্যদিকে, একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া উচিত। সত্যিকারের বিশ্বাসী তারাই, যারা ভুল পথে যেতে যেতে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়; যখন তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া হয় তখন তারা

নিজেদের ঠিক করে নেয়। মতামতে অনড় থাকার পরিবর্তে, তাদের সর্বদা সমালোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত, সর্বদা নিজেকে সংশোধন করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, এমনকি তখনও, যখন তার অর্থ দাঁড়ায়,এমন কিছু করা, যা তারা করতে চায় না।

সুতরাং, একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি সত্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন; আর অবিশ্বাসীরা তাদের নিজেদের ছাড়া আর কিছুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন না।

চ. সংঘাত এড়ানো

হিজরি সাল ৬-এ খন্দকের যুদ্ধের পরের বছর, হজরত মুহাম্মদ(স.) মদিনায় একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি দেখেন যে, তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে তিনি মক্কায় 'ঈশ্বরের ঘর' কা'বায় পৌঁছেছেন। তাঁর সহযোগীরা এই কথা শুনে খুব খুশি হলেন, কারণ এর অর্থ হল, ছয় বছর পর, আবার তাঁরা শীঘ্রই মক্কায় যাবেন এবং পবিত্র কা'বাহ ঘর পরিদর্শন করবেন। এই স্বপ্ন অনুসারে, পয়গম্বর তাঁর ১৪০০ সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র মক্কা শহরের দিকে রওনা হন। যখন তাঁরা গাদীর আশতাতে পৌঁছলেন, তখন তাঁরা শুনতে পেলেন যে তাঁদের যাত্রার খবর কুরাইশদের কাছে পৌঁছেছে। মুসলমানরা 'ঈশ্বরের ঘর' পরিদর্শন করবে, এই সংবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে কুরাইশরা একটি সৈন্যবাহিনী জড়ো করেছিলেন এবং মুহাম্মদ(স.) ও তাঁর সঙ্গীদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার শপথ নিয়েছিলেন; যদিও কাউকে কা'বাহ পরিদর্শনে বাধা দেওয়া আরব ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। পয়গম্বর ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণায় কাজ করছিলেন: সম্ভবত সে কারণেই কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া শুনেও তিনি শান্ত ছিলেন। তাঁকে তাঁর গুপ্তচররা জানিয়েছিল যে, খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ মুসলমানদের পথ আটকানোর অভিপ্রায়ে দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ঘামিমের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। একথা শুনে পয়গম্বর তাঁর পথ পরিবর্তন করেন। একটি সুপরিচিত প্রচলিত পথ ছেড়ে তিনি একটি স্বল্প পরিচিত এবং কঠিন পথের দিকে চলে যান, এবং হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছান। এই ভাবে তিনি খালিদের বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে যান। ইতিহাসবিদ ইবন হিশাম ঘটনাগুলি এভাবেই বর্ণনা করেছেন:

"কে আমাদের এমন পথ দেখাতে পারেন, যা কুরাইশদের দখলে নেই?" পয়গম্বর জিজ্ঞেস করলেন। একজন স্বেচ্ছায় সেই দায়িত্ব নিলেন। এরপর তিনি মুসলমানদের একটি জন্য পথ দেখান, যেটি কঠিন, পাথুরে এবং পাহাড়ি গিরিখাতের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। এই গিরিখাতগুলি অতিক্রম করতে মুসলমানদের খুব অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু যখন তারা তা পার হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি খোলা সমভূমিতে পৌঁছেছিলেন, তখন পয়গম্বর তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার এবং তাঁর (ঈশ্বরের) দিকে ফিরে আসার আহবান জানান। তারা সেটা করেছিলেন এবং পয়গম্বর বলেছিলেন এটিই ছিল ক্ষমার বাণী, যা ইসরায়েলীয়দের উচ্চারণের জন্য বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা করতে ব্যর্থ হয়েছিল।-৩৭

প্রকৃতপক্ষে এটি মুসলমানদের জন্য একটি কঠিন সময় ছিল, কিন্তু তারা ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে এই পরীক্ষার মুখোমুখি হলেন। এটা ছিল তাদের জন্য ঈশ্বরের দেখানো পথ। সেই পথ অনুসরণে সামান্যতম দ্বিধাকেও সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য করা হতো, যার জন্য ক্ষমা চাইতে হতো। সে কারণেই পয়গম্বর তাঁর অনুসারীদের কোনো দুর্বলতা বা বিরক্তির জন্য (যা তারা সেই সময়ে দেখিয়েছিল) অনুতপ্ত হতে ও ক্ষমা চাইতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। অসুবিধাগুলিকে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। কোনো প্ররোচনায় ঈশ্বরের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া যায় না।

পরিস্থিতি জরিপ করার জন্য পয়গম্বর মক্কা থেকে নয় মাইল দূরে অবস্থিত হুদায়বিয়া নামক স্থানে থামলেন। হুদায়বিয়া থেকে তিনি খারায ইবন উমাইয়া নামক একজনকে উটের পিঠে মক্কাবাসীদের কাছে পাঠিয়ে জানিয়ে দেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধ করতে নয়, ঈশ্বরের ঘর পরিদর্শন করতে এসেছে। মক্কায় পৌঁছানোর পরে খারাযের উটটি জবাই করা হয়েছিল এবং খারাযকেও হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি কোনোভাবে পালিয়ে হুদায়বিয়ায় ফিরে যেতে সক্ষম হন। পয়গম্বর তখন শত্রুতা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানাতে 'উসমানকে মক্কাবাসীদের কাছে পাঠান এবং তাদেরকে জানান যে, মুসলমানরা 'উমরাহ পালনের পর নীরবে মদিনায় ফিরে যাবে। মক্কাবাসীরা এই বার্তায় কোনো কর্ণপাত করেনি এবং 'উসমানকে বন্দি করে নিয়েছিল। পরে মিকরাজ ইবন হাফস পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে রাতে মুসলমানদের

শিবিরে হামলা চালায়, তারা তীর্থযাত্রীদের উপর পাথর ও তীর বর্ষণ করতে থাকে। মিকরাজকে বন্দি করা হয়েছিল, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি: তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর মুসলমানরা যখন ভোরবেলা প্রার্থনা করছিলেন, তখন তান'ইম থেকে আশি জন লোক তাঁদের ওপর হামলা চালায়। তাদেরও বন্দি করা হয় এবং পরে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর কুরাইশদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়। আপাতভাবে মনে হতে পারে, এই যুদ্ধবিরতি কুরাইশদের জন্য একক বিজয় এবং মুসলমানদের পরাজয়। পয়গম্বরের সহযোগীরা বুঝতে পারছিলেন না যে, যখন ঈশ্বর স্বয়ং তাদেরকে তাঁর গৃহে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তখন পয়গম্বর সেই যাত্রা সম্পূর্ণ না করেই কীভাবে মদিনায় ফিরে যেতে রাজি হতে পারেন! তাঁদের পরের বছর আসার অনুমতি দেওয়া হবে, তবে এইবারে মাত্র তিন দিন থাকার পরে তাঁদের শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। মুসলমানদের জন্য ক্রোধ বাড়িয়ে দেওয়ার মতো এই ধরণের আপাত অবমাননাকর সব শর্তই পয়গম্বর প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করেছিলেন। দেখে মনে হল যেন তিনি পরাজয় মেনে নিয়েছেন।

কুরাইশরা ইচ্ছাকৃতভাবে পয়গম্বরকে অসন্তুষ্ট করার জন্য আগ্রাসী আচরণ করেছিল। তারা তাঁকে শত্রুতা শুরু করার জন্য উস্কে দিতে চেয়েছিল, যাতে তারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একটি অজুহাত খুঁজে পায়। কা'বাহ পরিদর্শন নিষিদ্ধ করা ছিল আরবীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অধিকন্তু, এটি ছিল জ্বিলকদ মাস, যেটি আরব ধর্মে পবিত্র চার মাসের মধ্যে একটি, যে সময় যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। কুরাইশরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা পবিত্র মাসকে অপবিত্র করার জন্য অভিযুক্ত হতে চায়নি। তারা মুসলমানদের ওপর দোষ চাপাতে চেয়েছিল। মুসলমানরা সেই সময়ে সংখ্যায় কম ছিল, এমনকি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতও ছিল না। সেখানে মুসলমানরা ছিল তাদের বাড়ি থেকে ২৫০ মাইল দূরে, শত্রু অঞ্চলের সীমান্তে। কুরাইশদের জন্য এটি ছিল মুসলমানদের উপর বন্য আক্রমণ চালানোর এবং তাদের শত্রুতাকে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করার একটি সুবর্ণ সুযোগ। তারা মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু করার জন্য প্ররোচিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পয়গম্বর প্রতিটি প্ররোচনাকে উপেক্ষা করেছিলেন; তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাদের ফাঁদে পা দেন নি।

পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর ছিল যে, সহযোগীদের মধ্যে একমাত্র আবু বকরই মনে করেননি, অপমানজনক শান্তি চুক্তির শর্ত মেনে নিয়ে তাঁরা আগ্রাসীর সামনে মাথা নত করেছেন। এইসময় কুরআনের একটি আয়াত অবতীর্ণ হলে তাঁরা আরও বিস্মিত হয়েছিলেন, যা চুক্তিকে 'সুস্পষ্ট বিজয়' হিসাবে উল্লেখ করেছিল।

"এটা কী ধরণের বিজয়?" তাঁদের একজন প্রতিবাদ করেন। "আমাদেরকে ঈশ্বরের ঘর পরিদর্শন করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। কুরবাণির জন্য আনা আমাদের উটগুলিকে এগোতে দেওয়া হয়নি। ঈশ্বরের পয়গম্বরকে হুদায়বিয়া থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। আমাদের দুই নির্যাতিত ভাই, আবু জান্দাল এবং আবু বাসিরকে হস্তান্তর করা হয়েছে তাদের নিপীড়কদের কাছে..." তবুও এই অপমানজনক চুক্তিই মুসলমানদের জন্য একটি মহান বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।

হুদায়বিয়ার সন্ধি আপাতভাবে শত্রুর সামনে আত্মসমর্পণ বলে মনে হয়েছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি মুসলমানদের শক্তিশালী করার এবং তাদের অবস্থানকে সুসংহত করার সুযোগ দিয়েছিল। পয়গম্বর কুরাইশদের সব দাবি মেনে নেন, বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে একটিমাত্র আশ্বাস গ্রহণ করেন যে, আগামী দশ বছরের জন্য তাঁরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমস্ত শত্রুতা বন্ধ করে দেবেন। ক্রমাগত আক্রমণ এবং যুদ্ধের হুমকি মুসলমানদের গঠনশীল প্রচারমূলক কাজ করতে বাধা দিচ্ছিল। হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই হজরত মুহাম্মদ(স.) আরবে এবং তার আশেপাশে প্রচারমূলক সমস্ত কাজ আরও জোরদার করেছিলেন, যার ভিত্তি আগেই তৈরি করা হয়েছিল। এখন শান্তি বিরাজ করার কারণে ইসলামের বাণী দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

হাজার হাজার মানুষ, গোষ্ঠীর পর গোষ্ঠী, ইসলাম ধর্মে যোগদানের জন্য ভিড় জমায়। আরবের সীমানা ছাড়িয়েও ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। মক্কার পৌত্তলিকদের বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে, পয়গম্বর খায়বারের ইহুদিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়েছিলেন, যারা ইসলামের শত্রুদের সাহায্য করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করেনি। তিনি মদিনায় ইসলামের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার দিকেও মনোযোগ দেন।

চূড়ান্ত পরিণতি এলো হুদায়বিয়ার চুক্তির মাত্র দুই বছরের মধ্যে — কুরাইশরা কোনো যুদ্ধ না করেই আত্মসমর্পণ করে। পয়গম্বরের বিজয়ী হিসাবে মক্কায় প্রবেশে তখন আর কোনো বাধা রইল না। প্রাথমিকভাবে মক্কা থেকে একটি অপমানজনক পশ্চাদপসরণ অপর একটি মহান বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।

মানুষ আজকাল তাদের শত্রুদের কাছ থেকে সামান্য প্ররোচনায় অস্ত্র ধারণ করে। যখন তাদের কাছে অর্থহীন যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ তুলে ধরা হয়, তখন তারা নিজেদের যুক্তি দিয়ে বলে যে, তারা আগ্রাসী ছিল না; শত্রুরা ষড়যন্ত্র করে তাদের যুদ্ধে জড়িয়ে দিয়েছিল। তারা যা বুঝতে পারে না, তা হল, অহিংসার অর্থ এই নয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তোমার প্রতি সহিংস আচরণ করছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ, অহিংস থাকা; অহিংসার প্রকৃত অর্থ হল সহিংসতার মুখেও সহিংসতা থেকে বিরত থাকা — এমনকি উসকানির মুখেও প্ররোচিত হতে অস্বীকার করা। প্রতারণামূলক চক্রান্তের সামনে গভীর শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে, সেই চক্রান্তকে সম্পূর্ণ পরাভূত, ব্যর্থ করা। শত্রুদের বিরোধিতা অত্যন্ত গভীর হলেও তাদের বিরোধিতাকে নিজের কাজের প্রেরণা বা যৌক্তিকতা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করা জীবনে সফল হওয়ার কোনো উপায় নয়। শুধুমাত্র সংঘাত এড়ানোর মাধ্যমেই নিজের শক্তিকে সংহত করা যায়। অতঃপর এক প্রকার ভয় মিশ্রিত সম্ভ্রমের দ্বারা শত্রুদের পরাভূত করা সম্ভব হবে। সামান্য উসকানিতে লড়াই করা এবং নিঃশব্দে নিজের শক্তি গড়ে তোলার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হল নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। এই ধরণের আচার-আচরণ কখনোই ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে না। পয়গম্বর অ-সংঘাতের নীতি গ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন; তাহলে, কীভাবে তাঁর অনুসারীরা সংঘর্ষের নীতি অনুসরণ করে সফল হতে পারে? কীভাবে তাদের হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর যথার্থ অনুসারী বলা যায়, যখন তারা তাঁর দৃষ্টান্তগুলি সম্পর্কে অন্ধ? কীভাবে তারা আশা করতে পারে কেয়ামতের দিন তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করবেন?

৬. পয়গম্বরের পথ

ক. বিপ্লব নয়, বিবর্তন

আরবিতে 'সুন্নাহ' শব্দের অর্থ 'পথ'। ধর্মীয় প্রেক্ষিতে এর দ্বারা এমন জীবনযাপনের পদ্ধতিকে বোঝায়, যা ঈশ্বরের পছন্দনীয় এবং যা তাঁর পয়গম্বরদের মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। শব্দটি কুরআনে ঐশী বিধানের সমস্ত রূপের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যা যুগে যুগে গৃহীত হয়েছে।

ঈশ্বর যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি একটি পথ নির্ধারণ করেছিলেন যা অনুসরণ করা উচিত। এই ঐশী নিয়ম প্রকৃতির জগতে তিনি এত কঠোরভাবে প্রয়োগ করেছিলেন যে এর থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও ঘটতে পারে না। কিন্তু মানব জাতির উপর ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা চাপিয়ে দেননি। তিনি মানুষকে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন: যারা স্বেচ্ছায় তাঁর পথ অনুসরণ করে, তাদের স্বর্গে পুরস্কৃত করা হয়; আর যারা তা থেকে বিচ্যুত হয় তারা জাহান্নামের আগুনে শাস্তি পায়।

'ঈশ্বর এটি তোমাদেরকে জানাতে চান এবং সেই পথে তোমাদেরকে চালিত করতে চান, যে পথ ধরে তোমাদের পূর্ববর্তীরা চলে গিয়েছে, এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করতে চান। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।–৩৯

ঈশ্বরের পয়গম্বরেরা এই নির্দেশিত পথটি আমাদের জন্য সহজ করে বুঝিয়ে দিতে পৃথিবীতে আসেন। তাঁরা তাঁদের কথায় ও কাজে আমাদের দেখিয়েছেন কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হয়। এই জীবন-পদ্ধতি ইসলামে 'সুন্নাহ' বা পয়গম্বরদের পথ হিসাবে পরিচিত। এটি ব্যক্তিগত বিষয় থেকে শুরু করে সামাজিক সংস্কার এবং জাতি গঠন পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি দিককে নিয়ে গড়ে উঠেছে। যারা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের মনোনীত অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তাদের অবশ্যই সর্বক্ষেত্রে

পয়গম্বরের পথ অনুসরণ করতে হবে। জীবনের কোনো পদচারণায় তারা অন্য পথে চলার জন্য নিজেদের স্বাধীন ভাবতে পারে না।

পয়গম্বরের ব্যক্তিগত জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা। তাঁর জীবন অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তাঁর সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল মানুষকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে আসা। এই বিষয়ে তাঁর উদ্বেগ যে যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছিল তা কুরআনের এই আয়াত থেকেই স্পষ্ট:

তাদের অবিশ্বাসের কারণে আপনি হয়তো নিজের প্রাণনাশ করে ফেলবেন।"–৪০

পয়গম্বর বলেছেন, যে তাঁর সুন্নাহকে অবজ্ঞা করে সে তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। এই মন্তব্যটি যেমন বিবাহ চুক্তি এবং অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি মানুষকে ঈশ্বরের পথে আহ্বান করার দায়িত্বের ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য। কেবলমাত্র তারাই নিজেদেরকে পয়গম্বরের প্রকৃত অনুসারী বলে পরিচিত করার অধিকার রাখে, যারা পয়গম্বরের নির্দেশিত অন্যান্য দায়বদ্ধতার পাশাপাশি তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিও গ্রহণ করে।

পয়গম্বরের দেখানো পথ এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল বাস্তবসম্মত; ধাপে ধাপে তিনি লক্ষ্য পূরণে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাত্ত্বিক মানদন্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সামাজিক সংস্কার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি ধীরস্থির ভাবে এবং ধাপে ধাপে অগ্রসর হতেন। আধুনিক পরিভাষায় তাঁর পন্থাকে বিপ্লবী না বলে বিবর্তনবাদী বলা যেতে পারে। হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সহধর্মিণী আয়েশা এই নীতিটি খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন:

'কুরআনের প্রথম অধ্যায়গুলোতে সংক্ষিপ্ত ভাবে স্বর্গ ও নরকের উল্লেখ আছে। অতঃপর, যখন মানুষ ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে, তখন বৈধ-অবৈধ (হালাল-হারাম) বিষয়ক আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। যদি প্রথমেই "মদ পান করবেন না" এবং "ব্যাভিচার করবেন না"র মতো আদেশগুলি প্রকাশিত হতো, তবে মানুষ এই বিষয়গুলো পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করত।'–৪১

হিজরি সাল ৮-এ মক্কা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পয়গম্বর আরবের রাজধানীতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তারপরও তিনি মক্কায় ইসলামি আইনের দ্রুত

বাস্তবায়ন চাননি; যা কিছু করার ছিল, তিনি ধীরে ধীরে করেছেন। হিজরি সাল ৮-এ যখন তীর্থযাত্রা আয়োজিত হয় তখন সেখানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তীর্থযাত্রাটি প্রাচীন, প্রাক-ইসলামি রীতিতে সম্পন্ন হয়। পরের বছর, ইসলামি যুগের দ্বিতীয় তীর্থযাত্রাটি নিষ্পন্ন হয়, তাতে পৌত্তলিকরা তাদের নিজস্ব রীতিনীতি অনুসরণ করে এবং মুসলমানরা তাদের নিয়ম মেনে চলে। তৃতীয় বছরে গিয়ে পয়গম্বর ঘোষণা করেছিলেন যে, তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণভাবে ইসলামি নীতি অনুসারে সম্পাদিত হবে। এই তীর্থযাত্রাটি ইসলামের ইতিহাসে 'হাজ্জা তুল-বিদা' নামে পরিচিত — হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর বিদায়ী তীর্থযাত্রা।

মূর্তিপূজারীরা পবিত্র মসজিদে এসে তাদের মূর্তিপূজা রীতি অনুযায়ী তীর্থযাত্রার অনুষ্ঠান পালন করে, এটা পয়গম্বরের কাছে স্বভাবতই পরিত্যাজ্য ছিল। তথাপি তিনি যে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, তা প্রয়োগ করে ইসলামি ব্যবস্থা রূপায়ণে কোনো তাড়াহুড়ো করেননি। বরং বিজয়ী হওয়ার পরেও তিনি নিজে দুই বছর তীর্থযাত্রায় মক্কা যাওয়া থেকে বিরত ছিলেন। হজ্জের সময় এলে তিনি বলতেন, "আমি তীর্থযাত্রায় যেতে চাই না যখন পৌত্তলিকরা সেখানে এসে উলঙ্গ হয়ে তাদের তীর্থযাত্রার আচার পালন করছে।"

মক্কা বিজয়ের (হিজরি সাল ৮) পরে কিছু মুসলমান হজ্জে গিয়েছিল, কিন্তু পয়গম্বর তাদের মধ্যে ছিলেন না। পরের বছর হিজরি সাল ৯-এ, আবু বকরের নেতৃত্বে মুসলমান তীর্থযাত্রীদের দল হজ্জ পালন করে। এর পরই পৌত্তলিকদের তীর্থযাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়। কুরআনের এই আয়াতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে:

'হে বিশ্বাসীরা! পৌত্তলিকরা অপবিত্র। এই বছর শেষ হওয়ার পরে তারা যেন মসজিদুল হারামের কাছে না আসে।'-৪২

পয়গম্বর তখন তাঁর খুড়তুতো ভাই আলিকে এই নির্দেশ দিয়ে মক্কায় পাঠান, তিনি যেন তীর্থযাত্রীদের জমায়েতে মিশে যান এবং ঘোষণা করেন যে এই বছরের পর কোনো পৌত্তলিককে হজ্জে আসতে দেওয়া হবে না এবং নগ্ন অবস্থা তাওয়াফ (ঈশ্বরের ঘরের প্রদক্ষিণ) অনুমোদিত হবে না। তারপর, তৃতীয় বছরে, ধীরে ধীরে বহুদেবতাবাদ প্রথা দূর করার পর, পয়গম্বর পবিত্র মসজিদে তাঁর অন্তিম তীর্থযাত্রার উদ্যোগ নেন।

এখানে আমরা এটা দেখি যে কীভাবে পয়গম্বর ধীরে ধীরে ঈশ্বরের দেখানো পথে সংস্কার প্রবর্তন করতে সতর্ক ছিলেন। এমনকি যখন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন, তখনও তিনি ইসলামি আইন প্রণয়নের জন্য তাড়াহুড়ো করেননি; তিনি বিষয়গুলিকে তাদের স্বাভাবিক গতিপথ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছিলেন, পছন্দসই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো পর্যন্ত ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যেতেন; তিনি কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা প্রবর্তন থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন, কিন্তু বহুদেবতাবাদীদের তাদের কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখতে চান নি, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তাদের কাজকর্ম থেকে স্বেচ্ছায় বিরত হচ্ছে।

পয়গম্বরের কাজের অনেক দিক রয়েছে যেগুলিকে সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করা হয়নি। তাঁর বাস্তববাদী এবং ধীরগতির ক্রমান্বয়িক পদ্ধতি গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিকে কখনোই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রশংসা করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পয়গম্বর তাঁর কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার পর তেরো বছর মক্কায় বসবাস করেছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে একবারও তিনি কা'বাহ ঘরের ক্রমাগত অপবিত্রকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি। এমনকি সেই শহর জয় করার পরেও, তিনি নিরর্থক এবং অযৌক্তিক প্রথাগুলি বাতিল করার জন্য তাড়াহুড়ো করেননি। অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি দুই বছর অপেক্ষা করেছিলেন। শুধুমাত্র তৃতীয় বর্ষে পৌঁছে, তাঁর মনে যে সংস্কারগুলির কথা ছিল, তিনি সেগুলির বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

একটি ক্রমান্বয়িক পদ্ধতির থেকে বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়, যা অন্য কোনো পদ্ধতি থেকে পাওয়া যায় না। এটি লক্ষ্য অর্জনে সাফল্যের নিশ্চয়তা দেয়। যে ব্যক্তি এই পন্থা অবলম্বন করেন, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত অগ্রসর হন না যতক্ষণ না তিনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে, তিনি তাঁর নিজের অবস্থানকে সুসংহত করেছেন। তিনি তাঁর নিজের ক্ষমতার বলে ভেসে যান না, বরং বাহ্যিক কারণগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে সময়ের সঙ্গে ধাপে ধাপে এগিয়ে যান। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যিনি অগ্রগতিতে এত সতর্ক, তিনি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাবেন।

অধিকন্তু, এই পদ্ধতিতে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি বা দায় বহনের ঝুঁকিও কম। যারা খুব শীঘ্রই খুব বেশি অর্জন করতে চায়, তারা অনিবার্যভাবে টের পায় যে কাজটি করার অবস্থানে আসার আগে তাদের বিশাল বাধা অতিক্রম করতে

হবে। এই ধরণের প্রচেষ্টার ফলে ব্যাপক প্রাণহানি এবং সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। সেই জাতীয় অযৌক্তিকতার সংশোধন করতে কয়েক শতাব্দী সময় লাগতে পারে।

খ. অনড় আনুগত্য

পয়গম্বরের জীবনের শেষ দিকে প্রাক-ইসলামি আরবের সীমান্তবর্তী উর্বর অঞ্চলগুলি তখনকার দুটি মহান সাম্রাজ্য — সাসানীয় এবং বাইজান্টাইনদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। উত্তরে বসরা ও ঘাসাসিনার আমিরাত এবং রোমান প্রদেশ পেত্রোয়া আরব সর্দাররা শাসন করত। রোমান প্রভাব সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্বে ছিল বাহরাইন, ইয়ামামা, ইয়েমেন এবং ওমানের আমিরাত, ওমান মাজুন প্রদেশ নামে পরিচিত। এই রাজ্যগুলি পারস্য (সাসানীয়) সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল এবং পারস্য প্রভুদের ধর্ম- জরাথুষ্ট্রবাদ তাদের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হিজরি ৬ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ) সালে হুদায়বিয়ায় কুরাইশদের সঙ্গে পয়গম্বর দশ বছরের চুক্তি করেছিলেন। নিজ ভূমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে, তিনি আরবের আশেপাশের অঞ্চলগুলির শাসকদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাদের ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এমনই একটি চিঠি পয়গম্বরের দূত, সুজা' ইবন ওয়াহব আল-আসাদি, ঘাসাসিনার শাসক আল-হারিস ইবন আবু শিমরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল, 'ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখুন, আপনি আপনার সার্বভৌমত্ব বজায় রাখবেন।" এতে আরব সর্দার ক্ষুব্ধ হন। তিনি চিঠিটি একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন: "কে আমার রাজ্য কেড়ে নিতে পারে?"

বসরার শাসক, শুরাব-বিল ইবন 'আমর ঘাসানি আরও বেশি অবমাননাকর আচরণ করেন। পয়গম্বর হারিস ইবন 'উমাইরকে এই রোমান গভর্নরের কাছে একটি চিঠি দিয়ে পাঠান। তিনি সিরিয়ার সীমান্তবর্তী মু'তাহ শহরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে গভর্নরের নির্দেশে এক আরব রক্ষী তাকে হত্যা করে।

আন্তর্জাতিক নিয়মরীতি অনুসারে এই কাজটি এক রাষ্ট্রের দ্বারা অন্য

রাষ্ট্রের আগ্রাসনের সমান। সেখানে আরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সিরিয়ার রোমান বাহিনী মদিনায় অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করছিল: বাইজান্টিয়ামরা আরবের মাটিতে একটি স্বাধীন শক্তির উত্থান ও বিকাশকে সহ্য করতে পারেনি।

হারিস ইবন 'উমায়ের-এর হত্যার খবর মদিনায় পৌঁছালে পয়গম্বর সিদ্ধান্ত নেন যে, এই ধরণের সুপরিকল্পিত আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি হুকুম দিলেন, মুসলমানরা যেন তাদের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হার্ক নামক স্থানে জড়ো হয়। জায়েদ ইবন হারিস এর নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী একত্রিত হয়। যাওয়ার সময় কিছু পরামর্শ দিয়ে পয়গম্বর তাদের সিরিয়ার পথে পাঠান।

মুসলমান বাহিনী সিরিয়ার মা'ন শহরে পৌঁছে শিবির স্থাপন করে। বসরার গভর্নর ইতিমধ্যেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস ১,০০,০০০ সৈন্য নিয়ে নিকটবর্তী মা'বে পৌঁছে গিয়েছেন, এই খবরে তিনি আরও উৎসাহিত হন। স্থানীয় খ্রিস্টান উপজাতি, লাখম, জুজাম, কায়েন, বাহরা এবং বাল্লিও তাদের বাইজান্টাইন সহধর্মীদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে ছিল এবং বানু বাল্লির সর্দার মালিক ইবন জাফিলার নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে তৈরি ছিল। সিরিয়ার সীমান্তে তখন ১,০০,০০০ এরও বেশি সৈন্য নিয়ে রোমান বাহিনী মাত্র ৩০০০ সৈন্যে সম্বলিত একটি মুসলমান বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার জন্য একত্রিত হয়েছিল।

জায়েদ ইবন হারিস যুদ্ধে নিহত হন এবং পরবর্তী দুই নেতা জাফর ইবন আবি তালিব এবং 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা' ও তাঁর পরে শহীদ হন। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তখন সাবিত ইবন আকরাম নামে একজন সৈনিক এগিয়ে এসে ধ্বজা তুলে নেন এবং তাঁর সহকর্মী মুসলমানদের উদ্দেশে চিৎকার করে বললেন: "এক নেতা, একমত!" "আমরা আপনার সঙ্গে একমত হয়েছি", অন্যরা চিৎকার করে জবাব দিলেন। সাবিত অবশ্য নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং পরিবর্তে খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদকে এটি অর্পণ করার জন্য অনুরোধ করেন। মুসলমানরা চিৎকার করে তাদের সমর্থন জানালে খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ এগিয়ে আসেন, ধ্বজা উঁচু করে ধরেন এবং রোমানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বাইজান্টাইন বাহিনী তখন পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

এই যুদ্ধের ফলাফল অবশ্য অমীমাংসিত ছিল, এবং সবসময়ই সম্ভাবনা ছিল যে পেত্রায়ার আরবরা রোমানদের সাহায্য নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হবে এবং ইসলামের নবজাত শক্তিকে নষ্ট করার চেষ্টা করবে। এই হুমকিটি হিজরি সাল ৫-এর প্রথম দিকে অনুভূত হয়েছিল, যখন 'উমর ইবন আল-খাত্তাব'কে অন্য একজন সহযোগী জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি কোনো খবর শুনেছেন কিনা। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "কী? ঘাসাসিনা কি এসে পড়েছে?"

পয়গম্বর এই বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন এবং তিনি তাঁর শেষ সময়ে নিশ্চিত করেছিলেন যেন রোমান সেনাবাহিনীর পেত্রায়া শাখার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য একটি বাহিনী গঠনের পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া হয়। যে বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাতে আবু বকর এবং 'উমরের মতো নেতৃস্থানীয় সহযোগীরা ছিলেন, কিন্তু পয়গম্বর তাঁদের নেতৃত্বে রাখেননি। পরিবর্তে তিনি উসামা ইবন জায়েদকে নিযুক্ত করেছিলেন। উসামা নিজে একজন সাহসী তরুণ যোদ্ধা; তার পাশাপাশি, তাঁর পিতা জায়েদ ইবন হারিস মুতার যুদ্ধে রোমানদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। এই বাহিনী অবশ্য হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর জীবদ্দশায় অগ্রসর হতে পারেনি। হিজরি ১০ সালে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, আবু বকর প্রথম খলিফা হিসাবে নিযুক্ত হন এবং তিনিই শেষ পর্যন্ত সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন।

পয়গম্বরের মৃত্যুর পর মদিনায় আরব উপজাতিদের মধ্যে ব্যাপক ধর্মত্যাগের খবর আসতে থাকে। আরবের অধিকাংশ উপজাতি যারা হিজরি ৮ সালে মক্কার বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কোনো গভীর বৌদ্ধিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বা হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর পূর্ববর্তী অনুসারীদের মতো কোনো দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করার পরিবর্তে ইসলামের রাজনৈতিক আধিপত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তারা একটি মুক্ত ও সহজ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল, এবং কিছু ইসলামি নির্দেশ বিশেষ করে জাকাত, সহ্য করার মতো ক্ষমতা তাদের ছিল না। পয়গম্বরের মৃত্যুর কয়েক মাস আগে, ইয়েমেন এবং নজদে কিছু জননেতার উদ্ভব হয়েছিল যারা এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের একটি নতুন সংস্করণ সামনে এনেছিল, যাতে জাকাত দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাদের কথাকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার জন্য, এই জননেতারা বিশেষ করে আসওয়াদ এবং মুসায়লামাহ পয়গম্বরত্বের দাবি করে,

কারণ কেবলমাত্র পয়গম্বরত্ব স্বীকৃত হলেই তারা জাকাত ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার ডাক দিতে পারত।

জাকাত ছিল হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর কাছে প্রকাশিত ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই মুহাম্মদ(স.)-এর সমান কর্তৃত্বের সঙ্গে কথা বলার জন্য তাদের নিজেদের পয়গম্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন ছিল। যারা জাকাতকে বোঝা হিসাবে দেখত তাদের 'পয়গম্বরত্ব' উপজাতিদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারা এই ভুয়ো পয়গম্বরদের সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হিজরি ১০ সালে পয়গম্বরের মৃত্যুতে তাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়, এবং ধর্মত্যাগ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, শুধুমাত্র মক্কা, মদিনা এবং তা'ইফ নিরাপদ ছিল। এই বিদ্রোহীরা মদিনায় আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও খবর পাওয়া যায়।

প্রথম খলিফা আবু বকর সেনাবাহিনীকে অগ্রসর করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ সহযোগীরাই এর বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, "এই আরব উপজাতিরা বিদ্রোহের মুখে রয়েছে। তারা যে-কোনো সময় মদিনা আক্রমণ করতে পারে। সেনাবাহিনীকে দূর দেশে পাঠানোর পরিবর্তে মদিনা রক্ষার জন্য থাকতে হবে।"

'উসামার নেতৃত্বের ব্যাপারেও তাদের একটা আপত্তি ছিল, কারণ তার বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর; তদুপরি সে একজন ক্রীতদাসের ছেলে। তারা ভেবেছিল, পয়গম্বরের মহান সহযোগীরা কীভাবে সেই সাধারণ যুবকের অধীনে কাজ করতে পারে? তাঁরা চাইছিলেন, সেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে উসামার চেয়ে বয়স্ক এবং যুদ্ধে অভিজ্ঞ একজন সেনাপতি নিযুক্ত করা হোক।

'উমর, যিনি উসামার সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন, আবু বকরের কাছে তাঁদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য মদিনায় ফিরে আসেন। খলিফা প্রথমে বিষয়টি সম্পর্কে তার যা বলার ছিল তা শুনলেন এবং উত্তর দিলেন; "যদি সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার পরে মদিনায় একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকি এবং সুরক্ষার অভাবে বন্য জন্তুরা আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খায়, তবুও আমি স্বয়ং পয়গম্বরের প্রেরিত সৈন্যদলটিকে ফিরিয়ে আনতে পারব না।" তিনি 'উসামার যৌবন এবং পদমর্যাদার বিষয়টিকে এই কথায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন: "কি, মুসলমানরা কি এখনও তেমনই অহংকারী ও দাম্ভিক, যেমন তারা অজ্ঞতার(জাহিলিয়াত)

যুগে ছিল?” এই কথা বলে তিনি ‘উসামার নেতৃত্বে সৈনাবাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিতে নিজে পায়ে হেঁটে এগিয়ে যান। ‘উসামা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন, আর মুসলমানদের খলিফা তাঁর সঙ্গে সামরিক অভিযান সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে বলতে তাঁর পাশে পাশে হাঁটছিলেন। তিনি উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে মুসলমানদের ভুল ধারণার অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং এটিই ছিল সবচেয়ে বাস্তব ও কার্যকর উপায়। খলিফাকে অশ্বারূঢ় উসামার পাশে হেঁটে যেতে দেখে মুসলমানদের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

‘উসামার সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতির খবর আরবের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে বিরোধীরা এতে মুসলমানদের আত্মবিশ্বাসের নিদর্শন দেখতে পেল। তারা বুঝে নিল যে, সেই সংকটের সময়ে মদিনা থেকে এতদূরে সৈন্য পাঠাতে পারার মতো যথেষ্ট শক্তি পয়গম্বরের অনুসারীদের অবশ্যই আছে। তাই তারা শহরটিকে আক্রমণ করার আগে সিরিয়ার অভিযানের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়; যদি মুসলমানরা হেরে যায়, তাহলে তাদের রাজধানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ ঠেকানোর মতো ক্ষমতা তাদের থাকবে না।

উসামা ইবন জায়েদের বাহিনী রোমানদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সফল হয়েছিল। চল্লিশ দিন ধরে চলা এই অভিযানে এটাও প্রমাণিত হয় যে ‘উসামা এই অভিযানের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতা মুতাতে রোমান সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়েছিলেন, তিনি প্রতিশোধ নিতেও আগ্রহী ছিলেন। বিপুল সংখ্যক বন্দি এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদ মুসলমানদের সঙ্গে মদিনায় ফিরে যায়। এটা দেখে বিদ্রোহীরা সাহস হারিয়ে ফেলে এবং এর ফলে তুলনামূলকভাবে সহজে তাদের বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়। সুতরাং কেবলমাত্র পয়গম্বরের কথামতো কাজ করে মুসলমানরা উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করেছিল।

এইভাবে তারা মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি মহান শিক্ষা রেখে গেল: মুসলমানদের শক্তি পরীক্ষা করার জায়গা বাইরের বিশ্ব, তাদের নিজেদের মধ্যে নয়। কিন্তু মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্ম এই শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং বর্তমান যুগে পরিস্থিতির এমন অবনতি হয়েছে যেখানে মুসলিম বিশ্ব প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের বাইরের কোনো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত নয়, তবে সবাই তাদের নিজেদের মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইচ্ছুক। নিঃসন্দেহে আজ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বহির্বিশ্বে ইসলামের প্রচার; কিন্তু যেহেতু তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে ব্যস্ত, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কোনো সময় বা শক্তি তাদের কাছে অবশিষ্ট থাকে না।

সৈন্য প্রেরণের ব্যাপারে পয়গম্বরের অনড় সিদ্ধান্তের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। আরব উপজাতিরা অনাদিকাল থেকে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আসছিল, এবং তাদের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য বাইরের কোনো শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা না হলে, তারা আবার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করবে। জীবনের শেষ দিকে, পয়গম্বর রোমান সেনাবাহিনীর শক্তির বিরুদ্ধে তাদের দাঁড় করিয়ে এই বিপদ এড়ালেন। আরবদের তখন তাদের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য একটি বিশিষ্টভাবে উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। ভ্রাতৃহত্যা এবং পরস্পরের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য তাদের আর সময় ছিল না; পরিবর্তে, তারা দূর দিগন্তের দিকে তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল, এবং মাত্র একশো বছরের মধ্যে তিনটি মহাদেশে তাদের আলোকিত জয়যাত্রা সম্পূর্ণ হয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্ব

৭. পয়গম্বরের বিপ্লব

এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, তাঁর ধর্ম বিশ্বে শ্রেষ্ঠরূপে বিরাজ করবে। তিনি এটাও চান, অন্যান্য চিন্তাধারার উপরে এর বৌদ্ধিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তা হওয়ার জন্য কিছু পূর্বশর্ত আছে। হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর আবির্ভাব ছিল বহু হাজার বছর বিস্তৃত এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ, এবং এই সময়কালে তাঁর কাজের জন্য একটি ক্ষেত্র পরিপূর্ণভাবে তৈরি হয়েছিল। তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণের পথ সহজ করতে কিছু অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এই অবস্থাগুলির প্রকৃতি অনুধাবন করে হজরত মুহাম্মদ(স.)-কে সেগুলির বুদ্ধিদীপ্ত সদ্ব্যবহার করতে হয়েছিল। তিনি সেটা করেছিলেন, যার ফলে পৃথিবীতে ইসলামের বৌদ্ধিক উত্তরণের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

এখন আবার একবার, গত এক হাজার বছর ধরে এমন একটি প্রক্রিয়া চলছে, যাতে ঈশ্বর ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য আবশ্যকীয় অবস্থাগুলির সৃষ্টি করেছেন। যদি সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়, তাহলে আবার অতীতের মতোই ইসলাম বিশ্বচিন্তনে প্রাধান্য লাভ করবে।

কিন্তু এই সুযোগগুলিকে যদি সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ করতে হয়, তাহলে এক নিবিড় সংগ্রামের প্রয়োজন। সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আছে, এমন মানুষদের পক্ষেই একমাত্র তা সম্ভব। এই কাজের জন্য তাঁরাই যোগ্য, যাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার উর্ধ্বে উঠে ইতিবাচক কর্মে মনোনিবেশ করেন; সেই মানুষরা, যাঁরা অন্য আর সমস্ত বিষয় ত্যাগ করতে পারেন এবং ইসলামের উত্থান, এই একটি বিষয়ে তাঁদের সমস্ত কিছু নিবেদন করতে পারেন; যাঁরা মানব চিন্তনের সমস্ত বিভ্রান্তি থেকে দূরে থাকেন এবং কর্মপ্রবাহে ঐশ্বরিক জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হন। সেই সমস্ত মহান মানুষরা ভবিষ্যতেও কোনো নির্দিষ্ট দেশভিত্তিক জাতীয় মহিমা বা বৈষয়িক বৈভব দ্বারা পরিচালিত হবেন

না; তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা। এই সমস্ত মানুষরাই অতীতে ইসলামকে তাঁর মহিমান্বিত স্থানে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এরাই ভবিষ্যতে আবার ইসলামকে বৌদ্ধিক শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থানে পৌঁছে দিতে পারেন। অপরদিকে, আমরা যদি অগভীর সব স্লোগান দ্বারা আকৃষ্ট হই এবং সমস্ত তুচ্ছ ঘটনা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে যাই, তাহলে ঈশ্বর আমাদের জন্য যে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, তা সমূলে ধ্বংস করব। তাহলে আমরা কোনোদিনই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পর্যবসিত করতে পারব না।

ক. একটি তুলনা

মাত্র ১০১৮টি জীবনের বিনিময় হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সময়ে ইসলামি বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। তেইশ বছরের সময়কালে ৮০টি সামরিক অভিযানের মাধ্যমে এই বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল। হজরত মুহাম্মদ(স.) নিজে অবশ্য এর মধ্যে ২৭টির মতো অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিছু গৌণ অভিযানে অবশ্য কোনো সামরিক সংঘাতও ঘটেনি। সমস্ত যুদ্ধ মিলিয়ে মোট ২৫৯ জন মুসলমান এবং ৭৫৯ জন অমুসলমান সমেত মোট ১০১৮টি মৃত্যু ঘটেছিল। ওই রকম মাপের একটি বিশাল বিপ্লব, যা মানব ইতিহাসের সম্পূর্ণ পতিপথ পাল্টে দিয়েছিল, সাধিত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুসংখ্যা হিসেবে এটি নিতান্তই নগণ্য। সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর ইসলামি বিপ্লব ছিল যথার্থই একটি রক্তপাতহীন বিপ্লব। সমকালীন মুসলমান লেখক এবং বক্তারা হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর বিপ্লবের সঙ্গে আধুনিক অ-ইসলামি বিপ্লবগুলির তুলনা করে প্রায়শই ভুলবশত হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর বিপ্লব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে থাকেন। তাঁরা গর্বের সঙ্গে এই তথ্য তুলে ধরেন যে, ইসলামি বিপ্লবে যেখানে মাত্র ১০০০ মতো লোক মারা গিয়েছিল, সেখানে ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবে ১৩ মিলিয়ন মানুষের প্রাণ যায়। ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক বিপ্লবেও হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল।

মুসলমানরা এই তুলনাটা পছন্দ করেন, এতে তাঁদের আত্মগৌরব তুষ্ট হয়। কিন্তু এখানে অন্য একটি তুলনা করা প্রয়োজন যা কখনও ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়নি। সম্ভবত তিরস্কার এড়ানোর জন্য তাঁরা এই দ্বিতীয় তুলনাটিকে কখনও ভাবনায় স্থান দেননি, কারণ, তিরস্কৃত হতে তো কেউ পছন্দ করে না।

প্রারম্ভিক ইসলামি কার্যধারায় মৃতের সংখ্যার সঙ্গে আধুনিক ইসলামি আন্দোলনে কতজনের প্রাণ গিয়েছে তার তুলনা করা উচিত; অন্যভাবে বলতে গেলে এটা দেখা প্রয়োজন যে, আদি ইসলামি বিপ্লবে কতজন মানুষ মারা গিয়েছিল এবং আধুনিক সময়ের মুসলিম বৈপ্লবিক প্রয়াসে কত প্রাণহানি ঘটেছে। বিশ শতকে বহু মহান ইসলামি বৈপ্লবিক আন্দোলন দেখা গিয়েছে, যেগুলিকে মুসলিম বিশ্বের 'মহান ধর্মযুদ্ধ' (হোলি ক্রুসেড) বলা যেতে পারে। মুসলমানরা যেমন পয়গম্বরের সময়ের ইসলামি বিপ্লবকে আধুনিক, অমুসলমান, ধর্মনিরপেক্ষ বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করেন তেমনই হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর বিপ্লবের আলোকে তাঁদের নিজেদের আন্দোলনগুলির দিকে তাকানো উচিত, এবং সেগুলি আদৌ তুলনীয় কিনা তা বিবেচনা করা উচিত।

মুসলমানরা যদি এই তুলনা করেন তাহলে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখবেন যে, হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর তুলনায় তাঁদের নিজেদের আন্দোলনগুলি অমুসলমান পৃথিবীর বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলির থেকে কিছু ভালো নয়। অমুসলমান বিপ্লবগুলি যেমন মানব জীবনের প্রেক্ষিত খুব মহার্ঘ হয়ে উঠেছে, তেমনই মুসলমানদের বৈপ্লবিক সংগ্রামগুলিতেও মৃত্যু হার অত্যন্ত বেশি। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে আড়াই মিলিয়ন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে পাঁচ লক্ষ মুসলমান, পাকিস্তান নামক মুসলমান রাষ্ট্রটির জন্মের সময় আরও দশ মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছেন। সিরিয়া, ইরাক, ইরান, মিশর, প্যালেস্টাইন এবং অন্যান্য দেশে আরও কয়েক মিলিয়ন মানুষ ইসলামের কারণে প্রাণ দিয়েছেন এবং এই সমস্ত বলিদানের কোনো ফল পাওয়া যায়নি। গোটা বিশ্ব জুড়ে হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর বিপ্লবের ফলাফল টের পাওয়া গিয়েছিল, তবুও তা মাত্র ১০০০ প্রাণের বিনিময়ে প্রাপ্ত হয়েছিল। অপরদিকে, আধুনিক সময়ের ইসলামি আন্দোলনগুলি লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে সংঘটিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও কেউ একটা ছোট জায়গাও দেখাতে পারবেন না, যেখানে এই ইসলামি বিপ্লব সফল এবং কার্যকরী হয়েছে। বিষয়টা এখানেই শেষ হয়ে যায় না। সফল হওয়া তো অনেক দূর, আমাদের সাম্প্রতিক সংগ্রামগুলি একটি সম্পূর্ণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। আধুনিক সময়ে আমাদের প্রচেষ্টা বিষয়ে বাইবেলের নিম্নোক্ত কথাগুলি একদম সত্যি।

'তোমরা বৃথাই তোমার বীজ বপন করবে, কারণ তোমাদের শত্রুরা

সেটা খেয়ে যাবে। যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তারা তোমাদের শাসন করবে। তোমাদের শক্তি বৃথা অপচয় হবে। কারণ তোমাদের জামি তার ফসল বৃদ্ধি করবে না, জমির বৃক্ষে ফল ফলবে না।'(-৪৪)

আধুনিক মুসলমান ইতিহাসও অনুরূপ। প্রবল উদ্যমে আমরা খিলাফত এবং প্যান-ইসলামি আন্দোলনগুলি পরিচালনা করেছি, এগুলির জন্য অজস্র আত্মত্যাগ করেছি, শুধু এটা দেখার জন্য, যে মুসলমান বিশ্ব অনেকগুলি দেশের জাতীয় সরকারে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। আমরা আমাদের দেশে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছি; কিন্তু যখন স্বাধীনতা এলো, তখন অন্য রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের রাশ ধরল। পাকিস্তানে ইসলামি রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর্বে আমরা বহু আত্মত্যাগ করেছি, কিন্তু যখন সেই রাষ্ট্র গঠিত হল, তখন ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা তার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিলেন। আমরা আমাদের সর্বস্ব দিয়ে মিশরে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করলাম; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় গোষ্ঠী নয়, সামরিক একনায়কতন্ত্রের হাতে ক্ষমতা গেল। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ইজরায়েল রাষ্ট্রটির সমাপ্তি চেয়ে আমরা ধর্মযুদ্ধ করেছি, মানবসম্পদ এবং অর্থ বিত্তের নিরিখে বহু ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছে, তা হল ইহুদি রাষ্ট্রের সংহতি এবং বিস্তার। আর এখন, ইরানের মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার সময়টা পেরিয়ে আমরা হয়তো শুনতে পাব যে অ-ইসলামি কোনো শক্তি ক্ষমতা লাভের সোপান হিসেবে সেখানকার ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে ব্যবহার করেছে।

এগুলিই আমাদের সময়ের কঠিন বাস্তব। এগুলো থেকে আমরা চোখ ফিরিয়ে থাকতেই পারি, কিন্তু ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদরাও যে তাই করবেন, আমরা তা আশা করতে পারি না। একথা সত্য যে, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, রুশ বিপ্লব বহু প্রাণহানি ঘটিয়েছিল, কিন্তু তার ফলে বিশ্বচিন্তনে বহু পরিবর্তনও এসেছিল। এর ফলেই রাজতন্ত্রের বা জারের শাসনের অবসান হয়ে একটি প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল; পুঁজিবাদের উপর সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলামি বৈপ্লবিক উদ্যোগগুলির কথা যদি বলি, তাহলে তাতে মানব সম্পদের আরও বেশি ক্ষয় হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বচিন্তনে তার কোনো প্রভাব পড়েনি। হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সময়কালের বিপ্লব আমাদের দেখায় যে, যদি মাত্র ১০০০ মানুষ ইসলামের লক্ষ্যে তাদের সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে ঈশ্বর তাদের উদ্যোগকে অপুরস্কৃত

রাখেন না। তিনি পৃথিবীতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক সময়ের লক্ষ লক্ষ মুসলমান আত্মত্যাগের আগ্রহ দেখিয়েছেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের বিষয়টি গ্রহণ করেননি। আমাদের যাবতীয় আত্মত্যাগ সত্ত্বেও, আমাদের উদ্যোগগুলি সার্থকতা পায়নি। এতে প্রমাণ হয় যে আমাদের উদ্যোগগুলি বিভ্রান্ত ছিল। ঈশ্বর আমাদের জন্য যে সোজা পথ নির্দেশ করেছেন আমরা যদি সেটা ধরে চলতাম, তিনি নিশ্চয় আমাদের সাফল্যের দিক নির্দেশ করতেন; যেমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে কুরআনের এই আয়াতে:

'আমি তোমাকে একটি স্পষ্ট বিজয় দিয়েছি, যাতে ঈশ্বর তোমাকে অতীত ও ভবিষ্যতের যাবতীয় পাপ (গুনাহ) মার্জনা করে দেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেন; তোমাকে সরল পথ দেখান এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহায্যগুলি তোমাকে দান করেন।'(-৪৫)

যে কৃষক তাঁর মাঠে গম লাগিয়েছেন, তিনি গমেরই ফসল পাবেন। সেই কৃষক অবশ্যই সত্যি কথা বলছেন না, যদি তিনি গম লাগাবার দাবী করেন এবং কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সেখানে কাঁটাগাছ ফলেছে। গমের বীজ থেকে কাঁটাফল জন্মায় না। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এইভাবে কিছু ঘটে না। বর্তমান সময়ের আমাদের প্রয়াস প্রচেষ্টা সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। আমরা যদি হজরত মুহাম্মদ(স.) এবং তাঁর সহযোগীদের পথের যথার্থ অনুসারী হতাম, আমরা যদি তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মত্যাগে ব্রতী হতাম, তাহলে আমাদের এই প্রবল উদ্যোগগুলি নিঃসন্দেহে সফল হতো।

নিজেকে এই মিথ্যা প্রবোধ দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে আমি ইসলামের পথে সংগ্রাম করছি, যদি না আমার উদ্যোগগুলি সেই সমস্ত ফলাফল দেয় যা একটি যথার্থ ইসলামি সংগ্রামের দেওয়া উচিত। কেউ এই পৃথিবীতে মূর্খের স্বর্গে বাস করতেই পারেন, কিন্তু এর পরের পৃথিবীতে স্বর্গ যথার্থই তাদের জন্য নির্দিষ্ট, যাদের জীবন অলীক কল্পনা নয়, বাস্তবের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

খ. ঐশী পরিত্রাণ

বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য করে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "হে বিশ্বাসীরা, তোমরা যদি ঈশ্বরকে সাহায্য করো, তাহলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন

এবং তোমাদের শক্তিশালী করবেন।”(-৪৬) এখানে ‘ঈশ্বরকে সাহায্য’ করার অর্থ হল নিজেকে তাঁর প্রকল্পসমূহের উপযুক্ত করে তোলা। এই পৃথিবীর কর্মকাণ্ডের জন্য ঈশ্বরের নিজস্ব একটা পরিকল্পনার ধারা আছে; তিনি অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, যার যথার্থ ব্যবহার হলে, ফলাফলও অনুকূল হবে। আমাদের নিজস্ব উদ্যোগগুলিকে আমরা এই পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারি। এইভাবে যাঁরা ঈশ্বরকে সাহায্য করেন, ঈশ্বরও তাঁদের শক্তিশালী করে তোলেন।

যখন কেউ তা করতে ব্যর্থ হয়, তখন কী হয়, তার একটা উদাহরণ দিই। একজন পুরোহিত তাঁর বাড়ির সামনে একটি ফলন্ত গাছ দেখার আশায় মনে ভেবেছিলেন, “আমি যদি একটা বীজ লাগাই, তাহলে পরিপূর্ণ বৃক্ষ হয়ে উঠতে তার অন্তত দশ বছর সময় লাগবে।” সাত-পাঁচ ভেবে তিনি একটি মস্ত গাছ সমূলে উপড়ে, বহু শ্রমিক নিযুক্ত করে নিজের বাড়ির সামনে নিয়ে এসে পুঁতলেন। “ভালোই হল”, তিনি মনে মনে ভাবলেন, “আমি দশ বছরের কাজ একদিনে সম্পন্ন করেছি।” পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন তিনি দেখলেন সেই গাছের অনেক পাতা ঝরে পড়েছে, তখন তিনি একেবারে মর্মাহত হয়ে গেলেন। সন্ধ্যার মধ্যে গাছের শাখাগুলি দুর্বল হয়ে এলো। কয়েক দিনের মধ্যে দেখা গেল গাছটির সমস্ত পাতা শুকিয়ে ঝরে গিয়েছে, এবং তাঁর বাড়ির সামনে যা অবশিষ্ট আছে, তা একখণ্ড শুকনো কাঠ মাত্র। কয়েকদিন পরে সেই পুরোহিতের বাড়িতে তাঁর এক বন্ধু এসে দেখলেন যে পুরোহিত অত্যন্ত অস্থিরভাবে বাগানে পায়চারি করছেন। ‘কী হয়েছে?” বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন। “আপনাকে এত বিচলিত দেখাচ্ছে কেন?” পুরোহিত উত্তর দিলেন, “আমি খুব তাড়ায় আছি, কিন্তু ঈশ্বরের তো কোনো তাড়া নেই।” তিনি বন্ধুকে গাছ সংক্রান্ত পুরো ঘটনাটা খুলে বললেন। এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, তাতে ঈশ্বরের একটা ভূমিকা থাকে, এবং মানুষের একটা অংশ থাকে। এটা কিছুটা যন্ত্রের মতো; দুটি চাকা একই নিয়মে ঘোরে, একটি চাকা মানুষের, অপরটি ঈশ্বরের। ঈশ্বরের নিয়মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারলেই একমাত্র মানুষের সাফল্য আসা সম্ভব। মানুষ যদি নিজের মতো চলবার চেষ্টা করে, সে অবধারিতভাবে ভেঙে পড়ে, কারণ ঈশ্বরের চাকা অবশ্যই তার থেকে শক্তিশালী।

বহু সহস্রাব্দের নিয়মে ঈশ্বর গাছপালার বৃদ্ধির জন্য বিধান তৈরি করেছেন। ভূপৃষ্ঠে এক স্তর উর্বর জমির উপর তার প্রয়োজনীয় সূর্যালোকের উত্তাপ দিয়েছেন, জলের ব্যবস্থা দিয়েছেন এবং ঋতু অনুসারে তাদের বৃদ্ধির বিধান দিয়েছেন। তারপর তিনি গাছের শিকড়ে নাইট্রোজেন জোগান দেওয়ার জন্য কয়েক কোটি ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি করেছেন। বলতে গেলে, এই ব্যবস্থাপনাগুলিকেই ‘ঈশ্বরের চাকা’ বলে বোঝানো হয়েছে। আমাদের নিজ নিজ চাকাগুলি ঈশ্বরের চাকাটির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে, কেবলমাত্র তাহলেই আমরা এই সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারব। এইভাবে আমাদের চাকাটি ঈশ্বরের চাকার সঙ্গে সংযুক্ত হলে, উপযুক্ত মাটিতে আমাদের একটি বীজ বপন করতে হবে। তখনই প্রকৃতির যন্ত্র কাজ করতে শুরু করবে এবং উৎপাদন নিশ্চিত হবে। অপরদিকে, আমরা যদি পাথরের গায়ে গাছ লাগানোর চেষ্টা করি, অথবা বীজের মতো দেখতে একটি প্লাস্টিক বীজ এনে মাটিতে লাগাই, অথবা মূর্খ পুরোহিতের মতো আস্ত একটি বড় গাছ উপড়ে এনে অন্য জায়গায় লাগানোর চেষ্টা করি তাহলে আমাদের চাকাটি ঈশ্বরের চাকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। তাহলে আমরা কোনোমতেই আমাদের বাগানে একটি সুস্থ, সতেজ সবুজ গাছ দেখবার আশা করতে পারি না।

ইসলামি বিপ্লবের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনুরূপ। ঈশ্বরের সৃষ্ট সুযোগসুবিধাগুলি চিনতে পারা এবং সেগুলির সদ্ব্যবহার করার মধ্য দিয়েই এটি আসে। এলোপাথাড়ি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যথার্থ ইসলামি বিপ্লব আসতে পারে না। ঈশ্বরের কয়েকজন নিবেদিত সেবক, যারা নিজেদের চাকাটি ঈশ্বরের চাকার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন, তাদের দ্বারা প্রাথমিক ইসলামি বিপ্লবটি সম্পন্ন হয়েছিল। অপরদিকে, বর্তমান সময়ে আমরা ঈশ্বরের প্রকল্প অনুসরণ করিনি বলে আমাদের সমস্ত ত্যাগগুলি বিফল হয়েছে। আমরা নিজেদের বাসনার পথে চলেছি। ঈশ্বরের দেওয়া সুযোগসুবিধাগুলির বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারের মাধ্যমে একমাত্র যা পাওয়া যেতে পারে, ব্যর্থ অপ্রাসঙ্গিক প্রতিবাদের মাধ্যমে আমরা তা অর্জন করতে চেয়েছি।

পৃথিবীর প্রথম মানব, আদম এবং তারপর কয়েক প্রজন্ম ধরে মানুষ এক ঈশ্বরের উপাসনা করত। কুরআন বলে, সমগ্র মানব জাতি যেন ‘একটি অখণ্ড সম্প্রদায়’ ছিল।(-৪৭) কয়েক শতাব্দী ধরে এই অবস্থা চলতে থাকে,

কিন্তু তারপর জাগতিক ঘটনাসমূহের উপাসনা বা বহু-দেবতাবাদ প্রচলিত হয়ে ওঠে। মানুষের পক্ষে অদৃশ্য ঈশ্বরের উপর অখণ্ড মনঃসংযোগ কঠিন হয়ে পড়ে, তাদের দৃষ্টি অন্যত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে দৃশ্যমান বিষয়সমূহের উপর গিয়ে পড়ে। এর ফলে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ক্রমে নিম্নতর অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর আস্থায় পরিণত হয়। এই সময় চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা সবই উপাস্য হয়ে ওঠে, পাহাড় এবং সমুদ্রকে সরাসরি দেবতারূপেই কল্পনা করা হয়। মানুষদের মধ্যে অধিকতর সফল লোকেরাও দেবত্বের দাবীদার হয়ে ওঠেন। পৃথিবীতে এক হাজার বছরের পর, একেশ্বরবাদের ধারণাগত শ্রেষ্ঠত্ব শেষ হয়ে এলো এবং মানুষের মনে বহুশ্বরবাদের মেঘ তার ঘন ছায়া ফেলল।-৪৮

অন্যান্য প্রাথমিক একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর অবক্ষয়ের পর ঈশ্বর পৃথিবীতে পয়গম্বর পাঠাতে শুরু করলেন, যদিও এই পয়গম্বররা বহু-দেবতাবাদ নিশ্চিহ্ন করে কখনও একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করবার মতো যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেননি। পৃথিবীর জনপূর্ণ সমস্ত স্থানেই পয়গম্বররা এসেছিলেন। একটি হাদিস অনুসারে তাঁদের সংখ্যা ছিল ১,২৪,০০০; কিন্তু এই পয়গম্বরেরা সকলেই হাসিঠাট্টা ও বিদ্রূপের পাত্র হয়েছিলেন।

যখন কোনো ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেন, তার পিছনে একটি কারণ থাকে। তাঁরা এটি করেন কারণ, তাঁদের জীবনে এমন কোনো জিনিস একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে যে, তাঁরা সত্যের খাতিরেও সেটিকে ত্যাগ করতে পারেন না। এই সম্পৃক্ততা, যা ব্যক্তিকে পয়গম্বরদের প্রচারিত সত্যবার্তা থেকে বিচ্যুত করে, বিচ্ছিন্ন করে, তার স্বরূপ সম্পর্কে কুরআন আমাদের জানায়:

'যখন ঈশ্বরের দূতেরা তাদের কাছে পরিষ্কার নিদর্শন বহন করে এনেছিল, তারা তাদের কাছে যা জ্ঞান আছে তাতেই পরম উল্লাস প্রকাশ করেছিল; কিন্তু অচিরেই, তারা যে বিষয়গুলিকে উপহাস করেছিল, সেগুলি তাদের ঘিরে ফেলে।'-৪৯

এখানে 'জ্ঞান' বলতে বোঝানো হয়েছে ধর্মের বিকৃত রূপ, যা মানুষ এত বেশিদিন ধরে আঁকড়ে ছিল যে, সেটিই তাদের চোখে পবিত্র বলে মনে হয়েছিল। এইভাবে যে ধর্ম এক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়, তা মানুষের মনে

গেঁথে যায়। তারা যখন এর কথা ভাবে, তারা এর সঙ্গে যুক্ত সাধুসন্তদের কথা ভাবে। এটি মানুষের জাতীয় পরিকাঠামোর ভিত্তি হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশ হয়ে যায়। বিস্তারিত ঐতিহ্যের মোড়কে এটি সমাজের প্রধান অবস্থান লাভ করে।

যখন পয়গম্বরেরা এমন কোনো মানুষদের কাছে আসেন, যারা বহুকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত বহু-দেবতাবাদী ধর্মের সঙ্গে যুক্ত, তখন সেই পরিবেশে তাদের একেশ্বরবাদ প্রচার নিঃসঙ্গ একটি কণ্ঠ হিসেবে প্রতিভাত হয়। তাঁরা তাঁদের শিক্ষার সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তাঁদের যে দাবী, তা তখনও ইতিহাসের অনুমোদন পায় না। তাঁরা কেবলমাত্র যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারেন, তাদেরকে আলোর দিকে ডাকতে পারেন। চারপাশে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের ঘণ্টানিনাদের মধ্যে এমন শান্ত ধীর যুক্তিবাদ কারও কানেই পৌঁছোয় না। তাদের নিজেদের পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস ঘিরে যে জাঁকজমক, যে আড়ম্বর, তার পাশে পয়গম্বরদের বক্তব্যের তাৎপর্য ক্ষীণভাবে ধ্বনিত হতে থাকে। যিশু খ্রিস্টের উদাহরণই দেখুন — তিনি গৃহহীন, গাছতলায় শুয়ে থাকেন, অপরদিকে ইহুদিদের প্রধান পুরোহিত থাকেন হায়কলের প্রাসাদে। বিলাসবাসনপূর্ণ জীবন কাটান। হায়কলের(-৫০) বিশাল প্রাসাদে যিনি জীবন কাটান, তাঁর পাশে লোকে কী করে একজন গৃহহীন গাছতলায় জীবন কাটানো মানুষকে সত্যবার্তার বাহক বলে মনে করবে? এই কারণেই প্রথম দিকের মানুষরা পয়গম্বরদের প্রতি তাদের অবজ্ঞা ঢেলে দিয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা তো সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেনই, তাহলে তাঁদের বাদ দিয়ে অপ্রাসঙ্গিক, মর্যাদাহীন ব্যক্তিদের গুরুত্ব দিতে হবে কেন? একথা সত্য যে, অতীতের পয়গম্বররাও তাদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, কিন্তু তাঁদের অনুরাগীদের কাছে সেই সমস্ত পয়গম্বররা সত্য-প্রচারক অপেক্ষা জাতীয় বীর হিসেবে বেশি মর্যাদা পেতেন।

একটি বার্তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা একটি বিষয়, একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিষয়। কোনো বার্তাকে অনুসরণ করে কোনো কাজ করা বা পরিষেবা দেওয়া যতটা কঠিন, কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে কাজ করা বা পরিষেবা দেওয়া ততটাই সহজ। নিজের সমর্থনে একটি বার্তা কেবলমাত্র একটি ধারণাগত ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। অপরদিকে চলতে থাকা প্রতিষ্ঠানের সমর্থনের পিছনে আছে সমস্ত ধরণের বস্তুগত

আড়ম্বর। যাঁরা একটি বার্তার প্রতি এমন সময়ে সমর্থন জানান যখন ঐ বার্তার সপক্ষে সরল সত্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তাঁরাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবেন। যখন এই বার্তা প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করে, তখন সমর্থন জানাল, তা আর ঈশ্বরের কাছে কোনো কৃতিত্বের দাবী রাখে না। বার্তা হিসেবে ইসলামের প্রতি আনুগত্য ঈশ্বরের জন্য করা একটি কাজ। প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামের প্রতি আনুগত্য জানানোর পেছনে জাগতিক সুযোগসুবিধা লাভের উদ্দেশ্য জড়িত থাকে।

গ. ঈশ্বরের বাণীর মহিমায়ন

ঠিক যেমন যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক লাইট লাগানো হয়, তেমনই ঈশ্বর পয়গম্বরদের পাঠিয়েছেন যাতে তাঁরা জীবনের পথযাত্রীদের স্বর্গের রাস্তা দেখাতে পারেন এবং নরকের রাস্তা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন। কুরআনে বলা হয়েছে:

‘এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী (ভারসাম্যপূর্ণ) সম্প্রদায় বানিয়েছি, যাতে তোমরা জাতিসমূহের উপর সাক্ষ্যদাতা হও এবং পয়গম্বর তোমাদের উপর সাক্ষ্যদাতা হন।’-৫১

মানবজাতির প্রধান ধর্ম হিসেবে যখন একেশ্বরবাদকে সরিয়ে বহু-দেবতাবাদ এলো, তখন পয়গম্বররা পৃথিবীতে এলেন। ঈশ্বর তাঁদের সত্য জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে মানুষকে সঠিকপথে পরিচালনা করা এবং সমস্ত মন্দ বিষয় সম্পর্কে দূরে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য প্রেরণ করেন। সব পয়গম্বররাই দায়িত্ব সহকারে তাঁদের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁদের এই সত্য শিক্ষা যুক্তিযুক্ত এবং সহজবোধ্য ছিল। সত্য প্রচারে তাঁরা কোনো কাজ বাকি রাখেননি; যাঁরা তাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা স্বর্গের উপযুক্ত হয়ে উঠলেন, আর যে মানুষেরা তাঁদের শিক্ষা বর্জন করলেন, তাঁরা নরকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তবে ঈশ্বর পৃথিবীতে কেবল সত্যের প্রচারই চান নি ; তিনি পুনরায় এটাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সত্য প্রচারের জন্য আমাদের সামনে সত্যের পূর্ণ উন্মোচন প্রয়োজন। যেমনভাবে কুরআন সত্য

প্রচারকদের নির্দেশনা দিয়েছে, তেমনভাবে সমস্ত শ্রোতার কাছে সত্য সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা, এবং 'বুদ্ধিদীপ্ত এবং মৃদু উপদেশ' দ্বারা তাদের আলোকিত করা দরকার।(-৫২) এটা করা হলে, মানুষের কাছে সত্য গ্রহণ না করার জন্য আর কোনো অজুহাত থাকে না। তারা আর বলতে পারে না যে, তারা অজ্ঞতায় ডুবে ছিল। তারপরেও যারা সত্য-অনুবর্তী হতে পারে না, তারা নিজেদের সপক্ষে কেবল সচেতনতা অভাবের অজুহাত খাড়া করতে পারে।

ঈশ্বরের বাণীর মহিমায়ন এর থেকে আরও বড় বিষয়। এর অর্থ হচ্ছে অন্য সমস্ত চিন্তন ধারার উপরে ধর্মীয় চিন্তনের প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বরের বাণী কোনো আইনি বা রাজনৈতিক কর্মসূচি দ্বারা প্রতিষ্ঠা পায় না; বৌদ্ধিক স্তরের টানাপোড়েনের মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠা পায়। মানুষের মনে যখন সত্য দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়, তখনই ঈশ্বরের বার্তা মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র আইনের বইয়ে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে তা হয় না। আজকের যুগে, আজকের দিনে আধুনিক জ্ঞান প্রাচীনকালের জ্ঞানের ধারাগুলি থেকে সমস্ত আলো ছিনিয়ে নিয়েছে; উপমিতিমূলক দর্শন (analogical philosophy)-এর উপর গবেষণামূলক বিজ্ঞান (empirical science) নিজেকে মূলধারার চিন্তন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে; পুঁজিবাদ অপেক্ষা সমাজতন্ত্র অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক শক্তি হয়ে উঠেছে; রাজতন্ত্র অপেক্ষা গণতন্ত্র অনেক বেশি জোরালো রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সবগুলিই ভাবনাগত উত্তরণের উদাহরণ, একটি নির্দিষ্ট ধারার চিন্তনের উপর অন্য ধারার চিন্তনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বরের বাণীকে মহিমান্বিত করতে হলে অসত্যের উপর সত্যের ধারণাগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ঈশ্বর সব করতে পারেন। তাঁর পক্ষে অন্য সব কিছুর উপর সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা সহজ ছিল, যেমন তিনি সূর্যকে অন্য সব আলোর উৎসের উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে যেহেতু প্রতিনিয়ত আমাদের পরীক্ষা দিতে হয়, তাই কারণ এবং ফলাফলের সীমানার মধ্যেই ঈশ্বর সব কার্যপরিধি বেঁধে দিয়েছেন। যদি কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটে, তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে তাতে ঈশ্বরের হাত ছাড়া আর কিছু নেই; সেখানে পরীক্ষার কোনো অবকাশ নেই। কারণ ফলাফলের পরিধির দ্বারাই ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য তিনি প্রয়োজনীয়

প্রেক্ষিত সৃষ্টি করলেন, এবং তাকে ফলপ্রসূ করার জন্য একজন পয়গম্বরকে পৃথিবীতে পাঠালেন। তার ফলে পয়গম্বরের কাজ শুধুমাত্র ঈশ্বরের অভীষ্ট সত্য প্রচার ছিল না, তাঁর অন্যতম কাজ ছিল সত্যকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা। যার ফলে মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পূর্ণরূপ লাভ করে এবং আমরা সেই ঐশী পরিত্রাণ লাভ করতে পারি:

'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে ঈশ্বরের জ্যোতি নিভিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু অবিশ্বাসীরা যতই অপছন্দ করুক, ঈশ্বর তাঁর জ্যোতি পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন। তিনি পথনির্দেশ এবং সত্যের প্রতি অটল বিশ্বাস দিয়ে তাঁর দূতকে প্রেরণ করলেন, যাতে তিনি অন্য সমস্ত ধর্মের উপর তাঁর মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, পৌত্তলিকরা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।' –৫৩

ঘ. একটি নতুন জাতির জন্ম

হজরত মহম্মদ(স.) একবার বলেছিলেন, "আমিই আবরাহামের প্রার্থনা।" তিনি যে প্রার্থনার কথা বলছিলেন, সেটি আবরাহাম মক্কায় পবিত্র কা'বাহ নির্মাণের সময় নিবেদন করেছিলেন:

'প্রভু, তাঁদের মধ্যে থেকেই একজন দূতকে তাঁদের (ইসমায়িলের সন্ততিদের) কাছে পাঠান, যিনি আপনার বাণীগুলি ঘোষণা করবেন এবং তাদেরকে গ্রন্থ এবং প্রজ্ঞার শিক্ষা দেবেন, এবং পরিশুদ্ধ করবেন। আপনি মহান প্রজ্ঞাবান।'–৫৪

আবরাহামের প্রার্থনা এবং হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর জন্মের মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার বছরের ব্যবধান ছিল। হজরত জাকারিয়া এক পয়গম্বর-পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন,(–৫৫) এবং তার এক বছরের মধ্যেই তাঁর স্ত্রীর ইয়াহিয়া (জন দ্য ব্যাপটিস্ট)-এর জন্ম দেন। তাহলে আবরাহামের প্রায় অনুরূপ প্রার্থনা পূর্ণ হতে এত সময় লাগল কেন?

এর কারণ এই যে, জন দ্য ব্যাপটিস্টের সামনে একটি তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল। ইহুদিদের হাতে শহীদ হওয়ার মূল্যে ইহুদিদের ভণ্ডামি প্রকট করা ছিল তাঁর লক্ষ্য, যাতে ইহুদিরা আর ঐশী গ্রন্থসমূহের ধারক হওয়ার যোগ্য না থাকে; তাদের পরিবর্তে অন্য একটি জাতিকে উঠে আসতে হয়। অপরদিকে, হজরত

মুহাম্মদ(স.)-কে বহু-দেবতাবাদের উপর একেশ্বরবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হতো। পূর্ববর্তী কিছু ঘটনা ছাড়া সেটা সম্ভব ছিল না। তার জন্য পৃথিবীতে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন ছিল। এমন একটি ন্যায়নিষ্ঠ জাতি সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল, যা পয়গম্বরকে তাঁর কাজে সহায়তা করবে। ঈশ্বরের নিয়ম অনুযায়ী কার্যকারণ পরিধির মধ্যে এই সব কিছু করতেই আড়াই হাজার বছর সময় লেগেছিল।

এই প্রকল্পের সঙ্গে তাল মিলিয়েই আবরাহামকে ইরাকের সভ্য, সুশীল এলাকা ছেড়ে স্ত্রী হাজেরা বা হেগার এবং পুত্র ইসমাইলকে নিয়ে আরবে শুষ্ক, উষর মরু অঞ্চলে চলে যেতে হল।(-৫৬) এই অঞ্চলে কোনো কৃষিকাজ সম্ভব ছিল না। এই অঞ্চল ছিল বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। সভ্যতার ঘেরাটোপের বাইরে প্রকৃতির কোলে, এখানে একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল, যার মধ্যে সমস্ত সহজাত সম্ভাবনা সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকে। আবরাহাম এমন একটি জাতির আত্মপ্রকাশের প্রার্থনা করেছিলেন, যারা ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত, এবং এইরকম একটি জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য এই ভূমি সবথেকে অনুকূল ছিল:

'ঈশ্বর, আমাদের তোমার অনুগত করো; আমাদের উত্তরসূরীদের মধ্যে এমন এক জাতি গঠন করো, যারা তোমার অনুগত হবে।'(-৫৭)

পৃথিবীতে সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অভূতপূর্ব গতিশীলতাসম্পন্ন জাতির প্রয়োজন ছিল। পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলি, যারা মানব সভ্যতার কৃত্রিম পরিবেশে গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে এই কাজ করার জন্য গতিশীলতা এবং জীবনীশক্তির অভাব ছিল। এই কারণেই পূর্ববর্তী পয়গম্বরেরা কোনো ইতিবাচক সাড়া পাননি। একটি নতুন জাতির গড়ে ওঠা প্রয়োজন ছিল, যারা অনুকূল পরিস্থিতিতে এই সমস্ত গুণাবলী গড়ে তুলতে পারবে। এর জন্য বহু প্রজন্ম ধরে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল। এই কারণেই আবরাহামের প্রার্থনা এবং তার রূপায়ণের মধ্যে আড়াই হাজার বছরের ব্যবধান ছিল। যখন প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ তৈরি হল, তখনই মক্কার বানু হাশিম গোষ্ঠীর ওয়াহাব ইবন 'আবদ মানাফ-এর কন্যা আমিনার পুত্র রূপে হজরত মুহাম্মদ(স.) ভূমিষ্ঠ হলেন।

স্ত্রী এবং শিশুপুত্রকে নিয়ে আবরাহাম যখন মক্কায় উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন সেখানে তাঁর জন্য উষর এক ভূখণ্ড এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি অপেক্ষা

করে ছিল। তাঁদের মেশকের জল শেষ হয়ে এসেছিল এবং শিশু ইসমায়িল প্রবল তৃষায় হাত-পা ছুঁড়ছিলেন। এই সময়ই জমজমের ঝরনার উৎপত্তি ঘটল। এই ঘটনা সাক্ষ্য বহন করে যে, ঈশ্বর তাঁদের একটি কঠিন পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। ঈশ্বর তাঁদের এই সমস্ত প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে একা ছেড়ে দেননি; তাঁরা ঈশ্বরের কাজেই নিযুক্ত ছিলেন এবং চরম সংকট মুহূর্তে তাঁদের ত্রাণ করার জন্য ঈশ্বর অবশ্যই উপস্থিত ছিলেন। যখন ইসমায়িল আর একটু বড় হয়ে উঠলেন, আবরাহাম একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি নিজ হাতে তাঁর পুত্রকে উৎসর্গ করছেন। তিনি এই স্বপ্নকে ঈশ্বরের আদেশ হিসেবে গ্রহণ করে পুত্রকে উৎসর্গ করার জন্য তৈরি হলেন। যখন তাঁর ছুরি ইসমায়িলের গলা ছুঁয়েছে, এক ঐশীবাণী তাঁকে নিরস্ত হতে বলে এবং পরিবর্তে তিনি একটি ভেড়া কুরবাণি দেন। এই প্রতীকী ঘটনা নির্দেশ করে যে, ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করার জন্য এবং তার আদেশ পালন করতে আবরাহামকে অনেক বড় বড় আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বাস্তবে তাঁকে এই ধরণের কোনো আত্মত্যাগ করতে হয়নি, কিন্তু এই ধরণের আত্মত্যাগের মানসিকতা গড়ে তোলা এবং যে-কোনো সময় এই ধরণের আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন ছিল। তিনি যখন প্রমাণ করলেন যে, তিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন, তখন তাঁকে বাস্তবে সেই কাজটি আর করতে হয়নি। ঈশ্বর আবরাহাম এবং তাঁর পরিবারকে একটি বৃহৎ প্রকল্পের রূপায়ণে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা অর্থহীনভাবে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেবেন, তা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল না; সংকট মুহূর্তে ঈশ্বরই তাঁদের রক্ষা করলেন।

কালক্রমে ইসমায়িল জুরহাম গোষ্ঠীর একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। জমজমের জলধারার আত্মপ্রকাশের পর এই জুরহাম গোষ্ঠী মক্কায় বসবাস শুরু করে। আবরাহাম সেই সময় সিরিয়ায় ছিলেন। একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে ফেরত এলেন, তখন ইসমায়িল বাড়িতে ছিলেন না; বাড়িতে শুধু তাঁর স্ত্রী ছিলেন। ইসমায়িলের স্ত্রী তাঁর শ্বশুরকে চিনতেন না। “ইসমায়িল কোথায়”, আবরাহাম এই প্রশ্ন করলে, তাঁর স্ত্রী জানালেন তিনি শিকারে গিয়েছেন। আবরাহাম তখন তাঁর পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের জীবন কেমন চলছে। এর উত্তরে ইসমায়িলের স্ত্রী তাঁদের বর্তমান অসচ্ছল অবস্থা, দারিদ্র ও দুঃখ-দুর্দশার কথা সবিস্তারে আবরাহামকে বললেন। ফিরে যাওয়ার সময়

আবরাহাম তাকে বললেন সে যেন ইসমায়িলকে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে দেয়; এবং আরও বললেন যে, সে যেন ইসমায়িলকে অবশ্যই বলে তাঁর 'চৌকাঠ সারিয়ে নিতে'। ইসমায়িল ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে পুরো ঘটনাটা বললেন। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর অবর্তমানে সবটুকু বোঝার জন্য তাঁর পিতা এসেছিলেন। তিনি 'চৌকাঠ সারিয়ে নেওয়া'-র সাংকেতিক তাৎপর্যও বুঝলেন। তাঁকে আর একটি বিবাহ করতে হবে; কারণ এই নারী ঈশ্বরের অভিপ্রেত সন্তান ধারণের উপযুক্ত নয়। সেইমতো সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করে তিনি আর একটি বিবাহ করলেন। আবার কিছুকাল পরে তাঁর অবর্তমানে আবরাহাম অশ্বপৃষ্ঠে হাজির হলেন। আবরাহাম এই পুত্রবধূকেও একই প্রশ্ন করেন। ইসমায়িলের এই স্ত্রী তাঁর স্বামীর ভূয়সী প্রশংসা করেন; তিনি জানান যে, তাঁদের জীবনে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে এবং জীবনে কৃতজ্ঞ হওয়ার মতো তাঁদের অনেক কিছুই আছে। ইসমায়িলকে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে দিতে বলে আবরাহাম ফেরত যান। যাওয়ার আগে বলেন এই 'চৌকাঠ বহাল রাখতে', অর্থাৎ আশু কাজের জন্য এই স্ত্রী উপযুক্ত এবং ইসমায়িল যেন তার সাথে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখেন।(-৫৮)

এইভাবে আরব মরুভূমির জনবিরলতার মধ্যে 'ইসমায়িলের সন্তান'-রূপে যাঁদের উত্তরসূরীরা পরিচিত হবে, তাঁদের প্রতিষ্ঠা হল। এইভাবে সেই মানুষদের প্রাথমিক প্রস্তুতি নিষ্পন্ন হল, আড়াই হাজার বছর পরে যাঁরা শেষতম পয়গম্বরের নেতৃত্বে ইতিহাসের কঠিনতম কাজটি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন।

মক্কার চারপাশে উষর মরুভূমিতে যে জাতিটি ক্রমে গড়ে উঠেছিল, একটি শব্দতেই তাদের গুণবর্ণনা সম্ভব; তা হচ্ছে আল-মুরু'য়াহ (পৌরুষ)। কোনো ব্যক্তির গুণাবলীর শ্রেষ্ঠতম শ্রদ্ধাসূচক শব্দ হিসেবে এটি আরবদের মধ্যে ব্যবহৃত হতো। যেমন এক আরব কবি লিখেছিলেন, কোনো ব্যক্তি যদি তারুণ্যে পৌরুষ (আল-মুরু'য়াহ) অর্জনে ব্যর্থ হয়, তাহলে বৃদ্ধ হলেও সে কখনও তা অর্জন করতে পারবে না। প্রখ্যাত আরব ইতিহাসবিদ ফিলিপ কে হিট্টিও এইভাবে আরব মরুভূমির চারপাশে বহু শতাব্দী ধরে বসবাসকারী মানুষজনদের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরলেন:

সাহসিকতা, বিপদের সময় সংযম (সবর), সৎ প্রতিবেশীর দায়িত্ব পালন

(জিওয়ার), পৌরুষ (মুরু'য়াহ), উদারতা এবং আতিথেয়তা, মহিলাদের প্রতি সম্ভ্রম এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষা।-৫৯

৬. শ্রেষ্ঠ জাতি

আড়াই হাজার বছরের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় যে জাতিটির জন্ম হয়েছিল, সেটি ছিল ইতিহাসে মানবিক গুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ একটি জাতি:

'তোমরাই মানবজাতির মধ্য থেকে গড়ে ওঠা শ্রেষ্ঠ জাতি।'-৬০

এই আয়াতটি ব্যাখ্যা করে 'আবদুল্লাহ ইবন আল-আব্বাস বলেন যে, যাঁরা হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সঙ্গে মক্কা থেকে মদিনায় চলে গিয়েছিলেন, এখানে তাঁদের কথা বলা হচ্ছে। আসলে মুহাজিরদের এই ছোট্ট গোষ্ঠীটি, সেই সমস্ত আরব মানুষদের, যাঁরা 'পয়গম্বরের অনুগামী সহচর গোষ্ঠী' বলে পরিচিত, তাঁদের প্রতিনিধি ছিলেন।

সমস্ত কালেই পয়গম্বরদের একটি প্রধান বাধার মোকাবিলা করতে হয়েছে: সেই সময় পর্যন্ত প্রচলিত বংশানুক্রমিক ধর্মের প্রতি মানুষের যে অতুলনীয় আনুগত্য এবং তার যে প্রতিষ্ঠিত বৈভব, তার বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই করতে হয়েছে। অপরদিকে, তাঁরা নিজেরা সত্য ও যুক্তির বিমূর্ত জমিতে দাঁড়িয়েছিলেন। আরব মরুভূমিতে যে জাতিটি গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে, বাইরের জাঁকজমক যুক্ত হওয়ার আগেই বিমূর্ত স্তরে সত্যকে চিহ্নিত করার অনন্য ক্ষমতা ছিল। তারা বিশাল মরুভূমির জনবিরলতায় খোলা আকাশের নীচে বড় হতো, এবং তাদের মধ্যে সহজ, সরল, সত্যকে চিনে নেওয়ার এক বিরল ক্ষমতা ছিল। একক শক্তিরূপেও সত্যের জন্য তারা সমস্ত রকম ত্যাগে প্রস্তুত ছিল, পরিবর্তে তাদের কিছু পাওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল না। 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ হজরত মুহম্মদ(স.)-এর সহযোগীদের গুণাবলী বর্ণনা করেছিলেন;

'তাঁরা মুসলমান সমাজের সেরা অংশ, হৃদয়ের উষ্ণতায় এবং জ্ঞানদীপ্ত মেধায় তাঁরা ছিলেন সেরা। ঈশ্বর তাঁর পয়গম্বরের সহযোগী হিসেবে এবং তাঁর ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের নির্বাচন করেছিলেন।'

বহু-দেবতাবাদ মানুষকে বিমূর্ত স্তরে সত্য দর্শন থেকে বিরত রেখেছিল। তারা কোনো জিনিস বিশ্বাস করার আগে তাকে চাক্ষুষ এবং বস্তুগতভাবে তাকে

স্পর্শ করতে চাইত। ঈশ্বরের প্রেরিত দূতেরা যে সত্যের কথা বলছিলেন, সেটি ছিল একটি বিমূর্ত শক্তি। তাঁদের সমসাময়িক মানুষেরা প্রথমে এটা বুঝতে পারেনি; সেই কারণেই প্রতি যুগে পয়গম্বরদের বিভিন্ন রকমের তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপের শিকার হতে হয়েছে।

বহু-দেবতাবাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। তারা তাঁকে বিভিন্ন ধরণের চেতনাশূন্য বস্তুর আকারে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। যে ঈশ্বরকে চোখে দেখা যায় না, তাঁকে বুঝতে তাদের কষ্ট হয়েছে; ফলে তারা ঈশ্বরকে বিভিন্ন বস্তু বা মানবীয় আকারে কল্পনা করে নিয়েছে এবং এই দৃশ্যমান বস্তুগুলিকে তাদের মনোযোগের কেন্দ্র করে তুলেছে। তারা যেসমস্ত বস্তুর উপাসনা শুরু করল, সেগুলি অবশ্যই তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বোধ হয়েছিল। সেই কারণে যখন পয়গম্বরদের আবির্ভাব হল, তাঁদের পক্ষে জনসমর্থন অর্জন কঠিন হয়েছিল, কারণ তাঁরা সাধারণ মানুষের বেশেই এসেছিলেন। পৃথিবীতে তাঁদের আবির্ভাবের সঙ্গে কোনো ঐতিহাসিক মহত্ত্বের বিষয় যুক্ত ছিল না। অনেক পরে তাঁদের জাতীয় নায়কের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

আবরাহাম যখন মক্কায় কা'বাহ-র নির্মাণ শুরু করলেন, তখন তাঁর প্রার্থনার অংশ বিশেষ ছিল এইরকম:

"ঈশ্বর এই নগরীকে শান্তির নগরীরূপে প্রতিষ্ঠা করুন। আমাকে এবং আমার উত্তরসূরীদের মূর্তিপূজন থেকে রক্ষা করুন। ঈশ্বর, এরা বহু মানুষকে বিপথে চালিত করেছে। যে আমার অনুগামী হবে, সে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে থাকবে, কিন্তু যদি কেউ আমার বিরোধিতা করে, ঈশ্বর, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, দয়াময়। ঈশ্বর, আমি আমার সন্ততিদের মধ্যে কয়েকজনকে আপনার পবিত্র গৃহের কাছে এক ঊষর উপত্যকায় প্রতিষ্ঠা করেছি, যাতে তারা প্রার্থনা বজায় রাখতে পারে...-৬১

আবরাহামের সময়ে বহু-দেবতাবাদ উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। যেদিকে তাকানো যেত, মুর্তিপূজাকে মহিমান্বিত করে বহু বিশাল সৌধ দেখা যেত।মানববুদ্ধির পক্ষে নিজেকে বহু-দেবতাবাদী চিন্তনের শিকল থেকে মুক্ত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। এই সময়েই একটি নতুন পারিবারিক ধারা প্রতিষ্ঠা

করার লক্ষ্যে আবরাহামকে মক্কায় বসবাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি অঞ্চলে সেই জাতি গড়ে তোলা যাদের উপর বহু-দেবতাবাদী কোনো প্রভাব থাকবে না; যে জাতি বাইরের প্রভাব অস্বীকার করার মতো উচ্চমানসিকতা সম্পন্ন হবে এবং যাদের চিন্তন গভীর বাস্তববোধ থেকে গড়ে উঠবে। কুরআনে মানব জাতির এই চূড়ান্ত পর্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে:

'ঈশ্বর বিশ্বাস স্থাপনকে তোমাদের কাছে পছন্দনীয় করেছেন, এবং তা তোমাদের হৃদয়কে অলংকৃত করেছে; অবিশ্বাস, অনাচার এবং অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে অপ্রিয় করেছেন। এরাই সঠিক পথে আছে।'(-৬২)

এই আয়াতটি আমরা তখনই বুঝতে পারব, যদি আমরা সেই দেড় হাজার বছর আগের অবস্থা মনে রাখি, যখন সহযোগীরা ইসলামের বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছিল। এমন এক সময়ে তারা এক অদৃশ্য ঈশ্বরকে নিজেদের বলে গ্রহণ করল, যে সময়ে তারা দৃশ্যমান দেবতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তাদের চারপাশের অজস্র মহান ব্যক্তির মধ্যে তারা একজন পয়গম্বরকে, যাঁর কোনো জাগতিক পরিচিতি ছিল না, চিনতে পারল এবং বিশ্বাস করল। সেই সময়ের বিশ্ব ইসলামের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। কিন্তু এই বিজাতীয় ধর্মটিকেই সহযোগীরা এতখানি গ্রহণ করেছিলেন, যে তাঁরা তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। ছোটো করে বললে, তাঁরা সত্যকে দেখতে পেয়েছিলেন, যখনও পর্যন্ত তা এক বিমূর্ত শক্তি মাত্র। তখনও ইতিহাস তাকে স্বীকৃতি দেয়নি, তখনও ইসলাম ধর্ম জাতীয় গৌরবের সূচক হয়ে ওঠেনি। এর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হতো, বিনিময়ে কোনো প্রাপ্তির আশা ছিল না।

এই সময়ে বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্বার্থশূন্যতার উদাহরণ হিসেবে বায়া'ত 'আকবাহ সানিয়াহ্ (আনুগত্যের দ্বিতীয় শপথ)-এর কথা বলা যেতে পারে, যেটি হজরত মুহাম্মদ(স.) মদিনা যাওয়ার আগে গ্রহণ করা হয়েছিল। যখন মক্কায় মুসলমানদের প্রতি নিপীড়ন এক অসহনীয় মাত্রায় পৌঁছেছিল, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ মদিনায় ইসলামের বাণী প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ক্রমে তা মদিনার সমস্ত গৃহে পৌঁছোয়। সেই সময় মদিনার কিছু মানুষ মক্কায় যেতে মনস্থ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর প্রতি তাঁদের আনুগত্যের শপথ নেওয়া এবং তাঁকে মদিনায় আসতে অনুরোধ

করা। পরবর্তীকালে জাবির আল-আনসারি স্মৃতিচারণ করে বলেছেন যে, মদিনার প্রতিটি গৃহে ইসলাম পৌঁছে যাওয়ার পরে তাঁরা আলোচনা করছিলেন এবং একে অপরকে বলছিলেন: "আমরা কতদিন পয়গম্বরকে এইভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে দিতে পারি?" যারা কেবলমাত্র বাহ্যিক চেহারা দেখে মানুষকে বিচার করে, হজরত মুহাম্মদ(স.)-কে ভ্রান্ত প্রমাণ করার পক্ষে তাদের অকাট্য যুক্তি ছিল যে, হজরত মুহাম্মদ(স.) তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে নিতান্ত অনাড়ম্বরভাবে ঘুরে বেড়ান। তাহলে তিনি কীভাবে ঈশ্বরের দূত হতে পারেন? কিন্তু মদিনার মানুষেরা বিষয়টি আরও গভীরভাবে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা মুহাম্মদ(স.)-এর পয়গম্বরত্বের যাথার্থতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং বুঝেছিলেন মুহাম্মদ(স.)-কে সাহায্য করলে তাঁরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করবেন।

মদিনার মানুষদের মধ্য থেকে সত্তর জন আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন, কা'ব ইবন মালিকের বিবরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি তাঁরা কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে এই শপথ গ্রহণ করেছিলেন। এই মানুষেরা তাঁদের নিজেদের গোষ্ঠীর তীর্থযাত্রীদের একটা দলে যোগ দিয়েছিলেন; তাঁরা ভান করছিলেন যেন তাঁরাও তীর্থে যাচ্ছেন। মক্কার কাছে যখন অন্যরা তাঁবু ফেললেন, মুসলমানরাও ঘুমিয়ে পড়ার অভিনয় করলেন। রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ কেটে যাওয়ার পরে তাঁরা সন্তর্পণে শয্যা থেকে উঠলেন এবং পয়গম্বরের সঙ্গে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে দেখা করার জন্য রওনা হলেন যেন তাঁরা "ঝোপেঝাড়ে চুপিসারে চলতে থাকা পাখি।(-৬৩)

সে এক কী অসামান্য সময়ই না ছিল, যখন পয়গম্বরকে সারা বিশ্ব প্রত্যাখ্যান করেছে, সেইসময় তাঁর সহযোগী হওয়ার জন্য কিছু মানুষ ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল। সেই সময় পয়গম্বরের নিজের শহরে তাঁর কোনো স্থান ছিল না — পাথর ছুঁড়ে, গালি দিয়ে তাঁকে তা'ইফ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কোনো গোষ্ঠী তাঁকে সুরক্ষা দিতে রাজি ছিল না। তবুও সেই বিপত্তিকালে, সেই প্রতিকূল সময়েও মদিনার মানুষেরা তাঁর পয়গম্বরত্বের সত্যতা বুঝতে পেরে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল। যখন আনসাররা(-৬৪) এগিয়ে এসে আনুগত্যের শপথ নিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনারা সকলে কি এই আনুগত্যের শপথের ফলে কী হবে বুঝতে পারছেন? এর

ফলে আপনাদের সম্পত্তি ও ঘরবাড়ি সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে।” তাঁরা উত্তর দিয়েছিলেন, “হ্যাঁ, আমরা জানি। আমাদের সমস্ত সম্পত্তি ও ঘরবাড়ি সব কিছু নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে জেনেও আমরা এই শপথ গ্রহণ করছি।” তখন তাঁরা হজরত মুহাম্মদ(স.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, “শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকলে আমরা কী পুরস্কার পাব?” হজরত মুহাম্মদ(স.) উত্তর দেন, “স্বর্গ”। তখন তাঁরা পয়গম্বরকে বলেন, “আপনার হাতটা দিন, যাতে আমরা আপনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে পারি।”

আনসাররা সকলে এমন একটি সত্যের জন্য তাঁদের জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন যা তখনও পর্যন্ত বিতর্কিত, মানবজগতে যা তখনও সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাঁদের এই কাজ ছিল অনন্য; তাঁদের আগে অথবা পরে, আর কখনও কোনো সম্প্রদায় এমন দৃষ্টান্ত রাখতে পারেননি।

চ. বাইরের বিষয় এড়িয়ে চলা

আধুনিক পরিভাষায় আমরা সেই সমস্ত বিষয়কে ‘জাতীয়তাবাদী’ বলি, যা মানুষের কল্পনাকে উজ্জীবিত করে এবং যার ফলে জন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। হজরত মুহাম্মদ(স.)-ও এই ধরনের বিষয়গুলোর মুখোমুখি হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সন্তর্পণে সেগুলি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তার মিশনের সাফল্য নির্ভর করছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে চলার উপর, যা গত আড়াই হাজার বছর ধরে বিকাশ লাভ করছিল। তিনি যদি অপ্রাসঙ্গিক পারিপার্শ্বিক বিষয়ে জড়িয়ে যেতেন, তাহলে তাঁর জন্য যে সমস্ত সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেগুলি ধ্বংস হয়ে যেতে পারত।

আরবের সীমানায় অবস্থিত ইয়েমেন ৫২৫ খ্রিস্টাব্দের ইথিওপিয়ার শাসনের অধীনে এসেছিল এবং আব্রাহাহ সেখানে প্রাদেশিক শাসক নিযুক্ত হন। এই উদ্ধত ব্যক্তি পবিত্র কা’বাহ আক্রমণ করেন। তীর্থযাত্রার কেন্দ্র হিসেবে কা’বাহ যে মর্যাদা ভোগ করত, সেটা শেষ করার জন্যই তিনি কা’বাহ ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। তিনি একটি হস্তিবাহিনী নিয়ে যেবছর কা’বাহ আক্রমণ করেন, সেই বছরেই (৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর জন্ম হয়। ওই একই বছরে সাসানীয়রা ইয়েমেন আক্রমণ করে তাকে পারস্য সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত করে। বাজান নতুন প্রাদেশিক শাসক নিযুক্ত হন। হজরত মুহাম্মদ(স.) যখন তাঁর কর্মকাণ্ড শুরু করেন, পারস্যের সম্রাট তাঁর বিষয়ে শোনেন এবং বাজানকে নির্দেশ দেন, যেন তিনি নবীন পয়গম্বরকে তাঁর দাবীসমূহ থেকে বিরত থাকতে বলেন। “অন্যথায় আমার কাছে তাঁর মাথাটি (কেটে) নিয়ে এসো”, সম্রাট বলেছিলেন।(-৬৫)

এতে বোঝা যায় হজরত মুহাম্মদ(স.) যখন তাঁর কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন, তখন আরবের প্রান্তে থাকা বৈদেশিক শক্তিগুলি কী ধরণের সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। হজরত মুহাম্মদ(স.) তাঁর লোকেদের এই বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তাদের আরব এলাকার বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সেটা করলে ঈশ্বরের প্রকল্পের বিরুদ্ধাচরণ করা হতো। ঈশ্বরের এটিই ইচ্ছা ছিল যে, পয়গম্বর সামান্য কোনো বিষয় নিয়ে ঝামেলায় জড়াবেন না; তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের কেন্দ্রীয় বিষয়ে অবিচল থাকবেন; যেটি হল ঈশ্বরের বাণী প্রচার। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এর ফলশ্রুতিতে বাজান এবং ইয়েমেনে বসবাসকারী অধিকাংশ খ্রিস্টানই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর জায়গায় অন্য কোনো নেতা থাকলে তিনি হয়তো নীতিজ্ঞান বর্জিত কোনো উপায়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপের দ্বারা জাতীয় বিষয়গুলি সমাধান করতে চাইতেন; হজরত মুহাম্মদ(স.) ইসলামের ধারণা প্রচার করে সেই একই কাজ সফলভাবে নিস্পন্ন করলেন।

আবু তালিবের মৃত্যুর পর আবু লাহাব বানু হাশিম গোষ্ঠীর নেতা হয়ে ওঠেন। নতুন গোষ্ঠীপ্রধান যেহেতু তাঁকে সুরক্ষা দিতে অস্বীকৃত হলেন, হজরত মুহাম্মদ(স.) অন্য গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা খুঁজতে বাধ্য হলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অনেকগুলি গোষ্ঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তার মধ্যে ছিল সীমান্তবর্তী বানু শায়বান ইবন সা’লাবাহ। এই গোষ্ঠীর প্রধান, মুসান্না ইবন হারিস পয়গম্বরকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, তাঁরা পারস্য সীমান্তের কাছে বসবাস করেন এবং সাসানীয় সম্রাট একটিই শর্তে তাঁদের এই এলাকাটি অধিকার করতে দিয়েছেন, যে তাঁরা কোনো নতুন ধারণা প্রচার করবেন না, বা নতুন কোনো মতবাদ প্রচার করেন এমন কাউকে আশ্রয় দেবেন না। গোষ্ঠী প্রধান আরও বললেন, “সাসানীয় শাসকেরা সম্ভবত আপনার এই মতবাদের প্রচার অনুমোদন করবেন না।”(-৬৬)

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি আরব সীমান্তে বিদেশি শাসন আরব সার্বভৌমত্বের উপর রাজনৈতিক এবং অঞ্চলগত আগ্রাসনের থেকেও বড় একটি বিষয় ছিল; এটি পয়গম্বরের প্রচার লক্ষ্যেও বাধা সৃষ্টি করছিল। এই প্রেক্ষিতে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাইরের বাধাগুলি বিনষ্ট করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রচার কাজ করা সম্ভব নয়, এই কথা বলে পয়গম্বর বৈদেশিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অবরোধ গড়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু তাঁর প্রচারকর্মের প্রাথমিক পর্বে এইরকম একটা কথা বললে তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পিত পথ থেকে বিচ্যুত হতেন। কারণ, ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল, রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্য দুটি পরস্পরের সঙ্গে কুড়ি বছর ধরে যুদ্ধ করে দুর্বল হয়ে পড়ুক। যখন তাদের অধিকৃত হওয়ার সময় হয়ে এলো, তখন ঘটনাচক্রে বৈরিতা সূচনা করার দায়ও তাদের ঘাড়ে এসে পড়লো। উপরন্তু, তাদের পরাজিত করা মুসলমানদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। পয়গম্বর পরবর্তী যুগে যে অভূতপূর্ব বিজয়ধারার সৃষ্টি হয়েছিল, এটা ছিল সেই অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ। সময়ের অপরিণত পর্বে যদি মুসলমানরা রোম এবং পারস্যের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়তেন, যখন এই সাম্রাজ্য দুটি শক্তিশালী ছিল এবং তাঁরা দুর্বল ছিলেন, তাহলে অবশ্যই সম্পূর্ণ বিপরীত ফলাফল হতো।

ছ. ঈশ্বরের প্রকল্পের উপযুক্ত হয়ে ওঠা

যদি কোনো কৃষককে ফসল ফলাতে হয়, তাহলে উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত তার নিজের যন্ত্রের চাকাটি ঈশ্বরের চাকার সঙ্গে মিলিয়ে চলতে হবে। ঐশী অনুগ্রহে পৃথিবীতে কৃষিকাজের অনন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তা ঠিকভাবে সম্পাদন করার জন্য, একজন কৃষককে কিছু কাজ করতে হয়। যেমন, ভূপৃষ্ঠে উর্বর জমির একটি স্তর আছে, যা সমগ্র মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেই একটি অনন্য বিষয় বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এর অন্তর্লীন উর্বরতা সত্ত্বেও এই জমি সিক্ত না হলে তাতে ফসল ফলবে না; ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ অঞ্চল এই সিক্ততার অভাবেই অনুর্বর রয়ে গিয়েছে। মহাবিশ্বের কোনো কিছুই এই জলসেচের বিষয়টি কৃষকদের ব্যাখ্যা করে বলবে না; প্রকৃতির নীরব ইঙ্গিত পাঠ করে কৃষকদেরই তা খুঁজে বের করতে হবে, এবং প্রয়োজনীয় প্রতিকার করতে হবে। তাহলে একজন বুদ্ধিমান কৃষক বীজ বপনের আগে

বৃষ্টির জলে তার জমির মাটি ভিজে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। যদি বৃষ্টি না হয়, তিনি বিকল্প সেচের ব্যবস্থা করবেন। সত্য প্রচারকদের জনাও একই কথা প্রযোজ্য। মানবহৃদয়ে সত্যের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়ের জন্য তিনি অপেক্ষা করবেন, বা উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করবেন। হজরত মুহাম্মদ(স.)-ও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি যে আরবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই আরবের আধ্যাত্মিক ভূমি তখন উর্বর এবং সিক্ত ছিল, বিপুল ফলদায়ী হওয়ার উপযুক্ত ছিল। তবুও, তাঁর কর্মধারাকে অগ্রগামী করার জন্য পয়গম্বরকে সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হয়েছিল, সাফল্য লাভের জন্য তাঁকে ঈশ্বরের প্রকল্পের সঙ্গে নিজেকে মানানসই করে তুলতে হয়েছিল। তাঁর সামনে যে সমস্ত সুযোগ সম্ভাবনা এসেছিল, তাতে এ ছাড়া তাঁর আর উপায় ছিল না।

পয়গম্বরের শিক্ষাকল্পের প্রাথমিক নীতিতে শুধু চিরন্তন বিরহগুলোর উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কোনো অবস্থাতেই তাঁর শিক্ষা পার্থিব বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মানুষের সামনে তার অনন্ত অদৃষ্ট হচ্ছে মূল বিষয়। অন্য সমস্ত বিষয়ই আপেক্ষিকভাবে গুরুত্বহীন। জাগতিক সাফল্য এবং বার্থতার কোনো অর্থ নেই, কারণ এক পর্যায়ে এই দুটিই শেষ হয়ে যায়। পরজগতের সাফল্য এবং ব্যর্থতা চিরস্থায়ী, তার প্রতি মানুষের মনোযোগী হওয়া উচিত।

হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর লক্ষ্য ছিল ন্যায়নিষ্ঠ মানুষদের একটি সমাজ তৈরি করা। প্রতিটি ব্যক্তি যদি উন্নত নৈতিকমানের হয়, তবেই এমন একটি সমাজ গড়া সম্ভব। পরলোকের উপর অবিচল বিশ্বাস থাকলে তবেই সত্য এবং নিশ্চল নৈতিকতা তৈরি হতে পারে। পরলোকের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ, আমরা যেমন খুশি আচরণ করতে পারি না; কারণ আমাদের প্রতিটি কাজের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে উত্তর দিতে দায়বদ্ধ থাকব। এই ধারণার ফলে মানুষ বিপথগামিতা থেকে দূরে থাকে এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। যদি কেউ খোলা মনে কুরআন এবং হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর জীবনের কথাগুলি পড়েন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, সেখানে মৃত্যু পরবর্তী বিষয়গুলিকেই সবথেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত বিষয়ই আনুষঙ্গিকভাবে ঘটনাচক্রে উল্লিখিত হয়েছে। পরলোকের প্রতি মানুষের

মনোযোগ নিবিষ্ট করাই ছিল হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর কর্মকাণ্ডের মৌলিক উদ্দেশ্য।

প্রচারক এবং শিক্ষকরূপে হজরত মুহাম্মদ(স.) যাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তাদের সঙ্গে কোনোরকম বস্তুগত বিরোধ এবং বিরোধের সূত্র সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া ছিল হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর দ্বিতীয় নীতি। হজরত মুহাম্মদ(স.) যে কোনো মূল্যে তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে জাগতিক বিরোধের সম্ভাবনা এড়িয়ে যেতেন। হুদায়বিয়ার চুক্তি এই নীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কুরাইশরা ক্রমাগত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মুসলমান এবং অ-মুসলমানদের মধ্যে চিরশত্রু, চিরবিরুদ্ধ দুটি ধারার সৃষ্টি করলেন। দুইপক্ষই যুদ্ধের প্রস্তুতিতে তাদের সমস্ত সময় এবং শক্তি ব্যয় করত। হুদায়বিয়ার চুক্তি অনুসারে, দশ বছর কালের শান্তির শর্তে হজরত মুহাম্মদ(স) কুরাইশদের সব দাবী মেনে নেন। চুক্তির শর্তগুলি এতটাই একতরফা ছিল যে, অনেক মুসলমানের কাছেই তা ছিল অপমানের শামিল, কিন্তু বাস্তবে এই চুক্তি, কুরআন যাকে বলেছে ‘স্পষ্ট বিজয়’,(-৬৭) তারই পথ প্রশস্ত করেছিল। এই চুক্তির ফলে মুসলমান এবং অ-মুসলমানদের মধ্যে সর্বক্ষণ চলতে থাকা সংঘাতের পরিবেশ শেষ হয়। মুসলমানরা তখন বাধাহীনভাবে অ-মুসলমানদের কাছে তাদের বিশ্বাসের কথা প্রচার করতে পেরেছিল, অ-মুসলমানরাও তা গ্রহণ করার বিষয়ে স্বাধীন ছিল। তাদের বিশ্বাস প্রচারের পথে কোনো পার্থিব দ্বন্দ্ব বা কুসংস্কার আর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারল না। এই চুক্তির পরে, অ-মুসলমানদের উপরে এই চুক্তির যে সমঝোতামূলকপ্রভাব পড়েছিল, তাতে সমগ্র আরব জুড়ে ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। মাত্র দু’বছরের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা দশ গুণ বৃদ্ধি পেল। বাহুবলে মক্কা অধিকার করার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু মাত্র দু’বছর সময়কালে ইসলামি শিক্ষার সামনে তা সম্পূর্ণ নতিস্বীকার করে।

হজরত মুহাম্মদ(স.) যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, তার একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল শত্রুদের (এমনকি যখন তারা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ পরাভূত, তখনও) সঙ্গে তাঁর সদ্ব্যবহার। তার কারণ এই যে, তিনি কাউকে শত্রু মনে করতেন না। তিনি সকল নারীপুরুষকেই ইসলামের শিক্ষার সম্ভাব্য গ্রহণকারী বলে মনে করতেন এবং তিনি সকলকেই এই বিশ্বাস গ্রহণ করার সমস্ত উপযুক্ত সুযোগ দিতে চাইতেন। হজরত মুহাম্মদ(স.) সারাজীবন তাই করেছেন। মক্কা বিজয়ের

পরে কুরাইশদের প্রতি তাঁর ব্যবহারে তাঁর এই মহানুভবতার একটি উদাহরণ পাই। এর আগে কুড়ি বছর ধরে যে লোকেরা হজরত মুহাম্মদ(স.) এবং তাঁর সহযোগীদের এমন যন্ত্রণা দিয়েছেন, এমন তীব্র নিপীড়ন করেছেন, এবার মক্কার পতনের পরে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে মুহাম্মদ(স.)-এর অনুগ্রহ নির্ভর হয়ে পড়লেন, কিন্তু হজরত মুহাম্মদ(স.) তাঁদের অতীত অপরাধের জন্য তাঁদের শাস্তিদানের পরিবর্তে তাঁদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। যখন কুরাইশদের বন্দি করে তাঁর সামনে আনা হল, তখন অতীত অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি না দিয়ে তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কী করবে ঠিক করে নাও, তোমরা সকলেই স্বাধীন মানুষ।" যাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছিল, তারাও ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধি পাঠিয়ে করুণা প্রার্থনা করলে তিনি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সর্বমোট সতেরোজন মানুষের প্রাণদণ্ড হয়েছিল, তাদের মধ্যে মাত্র পাঁচজন, যারা কোনো আবেদন করেনি, তাদের ক্ষেত্রেই এই দণ্ড কার্যকর হয়। উহুদের যুদ্ধে ওয়াহশি ইবন হারব হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর কাকা হামজাকে হত্যা করেছিলেন। তারপরে হিন্দ বিনত 'উতবা হামজার মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এই ঘটনার কথা শোনার পরে সাময়িক উত্তেজনার মুহূর্তে হজরত মুহাম্মদ(স.) বলেন, "ঈশ্বর যদি আমাকে (তাদের উপর) জয়ী করেন, তাহলে আমি তাদের তিনজনের অঙ্গচ্ছেদ করব।(-৬৮)

হজরত মুহাম্মদ(স.) প্রথমে যে সতেরোজন অভিযুক্তের প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে ওয়াহশি ইবন হারব এবং হিন্দা দুজনেই ছিল, কিন্তু তারা যখন তার কাছে কৃপা প্রার্থনা করল, তিনি দুজনকেই ক্ষমা করে দিলেন। ঈশ্বরের এটাই ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর পয়গম্বর শত্রুদের প্রতি উদার এবং ক্ষমাশীল হবেন, কারণ এই নীতি ইসলামি উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরের প্রকল্পের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল।

এই নীতিটি মানব সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। মানবসমাজ হল জীবন্ত ও সংবেদনশীল ব্যক্তিদের একটি সম্মিলিত সত্তা, যাদের মধ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার তাগিদ জেগে ওঠে যখন তাদের মধ্যে একজনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষ পাথর নয়, যে একটি পাথর ভেঙে গেলে অন্যগুলো কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না! একজন বাক্তিকে দমন করার অর্থ তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষদের কাছ থেকে বিদ্রোহের আমন্ত্রণ জানানো; যার অর্থ হল,

যে সময়টি লাভজনকভাবে সমাজ গঠনে ব্যয় করা যেতে পারতো, অসন্তোষ ধারণ করে সেই সময়টি নষ্ট করে ফেলা। মক্কা বিজয়ের পর তাঁর অতীতের সমস্ত শত্রুদের ক্ষমা করে দিয়ে, পয়গম্বর নিশ্চিত করেছিলেন যে ভবিষ্যতে কোনো বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি যাঁদের ক্ষমা করেছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলামের জন্য শক্তির উৎস হয়ে উঠেছিলেন। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলেন আবু জাহলের পুত্র 'ইকরিমাহ্, যিনি প্রথমে পয়গম্বর এবং তাঁর অনুসারীদের এক অদম্য প্রতিপক্ষ ছিলেন।

একবার পয়গম্বরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে, কিছু সামাজিক সংস্কার গ্রহণ করতে হতো। পয়গম্বর এই ধরণের সংস্কার প্রবর্তনে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সতর্ক ছিলেন; যখন মানুষ সেগুলি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না, তখন তিনি কখনোই সেই ব্যবস্থা আরোপ করতে তাড়াহুড়ো করেননি।

মক্কার লোকেরা আবরাহামের ধর্মের উত্তরাধিকারী ছিল, কিন্তু তারা আবরাহামের প্রকৃত ধর্মকে বিকৃত করেছিল এবং বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবনী প্রথা গ্রহণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, আবরাহামের সময়ে, জ্বিলহজ্জ্ব চান্দ্রমাসে হজ্জ্ব(তীর্থযাত্রা) পালন করা হতো। যেহেতু একটি চান্দ্র-বছর, একটি সৌর বছরের তুলনায় এগারো দিন ছোট, তাই এর মাসগুলি ঋতুগুলির সঙ্গে ঘোরে না। তখন হজ্জ্ব কখনো এক ঋতুতে আবার কখনো অন্য ঋতুতে পড়ে। এটা কুরেইশদের বাণিজ্যিক স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। তারা চেয়েছিল যে, হজ্জ্ব প্রতি বছর গ্রীষ্মে পড়ুক, এবং এই উদ্দেশ্যে তারা নাসি' নামে পরিচিত একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে। এতে প্রতি বছর চান্দ্র ক্যালেন্ডারে এগারো দিন যোগ করা হয়। এই আন্তঃসংযোগের পরে তারা চান্দ্র মাসের নামগুলি বজায় রেখেছিল, কিন্তু বাস্তবে তাদের ক্যালেন্ডারটি ছিল সৌর মাসের। এর অর্থ হল যে, তেত্রিশ বছর ধরে চান্দ্র ক্যালেন্ডারের সমস্ত তারিখগুলি তাদের আসল স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল; প্রতি তেত্রিশ বছর পর, যখন ক্যালেন্ডারে এগারো দিনের বার্ষিক সংযোজন পূর্ণ এক বছরে চলত, তখন চন্দ্রপঞ্জি অনুসারে তার সঠিক তারিখে হজ্জ্ব করা হতো। পয়গম্বরের উপর অর্পিত কাজগুলির মধ্যে একটি ছিল কুরাইশদের সমস্ত উদ্ভাবনের অবসান ঘটানো এবং আবরাহামের আদি পদ্ধতি অনুসারে হজ্জ্ব করা। মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটে হিজরি সাল ৮-এর

রমজান মাসে। পয়গম্বর তখন সমগ্র আরবের শাসক ছিলেন। তিনি অবিলম্বে কুরাইশদের সকল উদ্ভাবনের অবসান ঘটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি সময় নিতে চাইলেন। নাসির পুরো তেত্রিশ বছরের পর্ব শেষ হতে আর মাত্র দুই বছর বাকি ছিল। পয়গম্বর এই দুই বছর অপেক্ষা করেছিলেন, যদিও তিনি মক্কা জয় করেছিলেন, তবুও তিনি সেই সময়ে হজ্জ্ব করেননি। মক্কা বিজয়ের পর তৃতীয় বছরে (হিজরী. ১০) তিনি হজ্জ্বে অংশগ্রহণ করেন। সেই বছরই আবরাহাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা অনুসারে জু'ল হিজ্জাহ-র সঠিক তারিখে হজ্জ্ব করা হয়েছিল। এটি ছিল পয়গম্বরের বিদায়ী হজ্জ্ব, এবং এই সময় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ভবিষ্যতেও সেই বছরের মতোই হজ্জ্ব পরিচালনা করা হবে। এইভাবে তিনি সর্বকালের জন্য চান্দ্র ক্যালেন্ডারের হেরফের বন্ধ করেছিলেন। "সময় তার গতি পূর্ণ করেছে", তিনি ঘোষণা করেছিলেন। "এটি এখন সেই অবস্থানে রয়েছে যেমনটি ছিল যখন ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বারো মাসে এক বছর।"(-৬৯)

এই সংশোধনী প্রবর্তনে পয়গম্বরের বিলম্বের একটি গভীর কারণ ছিল। মানুষ যখন বহু বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় রীতি মেনে চলে, তখন তারা এটিকে পবিত্র বলে মনে করে এবং তাদের চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করতে চরম অসুবিধা হয়। দুই বছরের মধ্যে, পয়গম্বরের ইচ্ছার দিনেই হজ্জ্ব পালিত হবে, তাই তিনি কোনো অকাল উদ্যোগ গ্রহণ করা এড়িয়ে গেছেন, যা বিষয়টিকে বিতর্কিত করে তুলতো। যখন স্বাভাবিকভাবে হজ্জ্বের সঠিক দিনে পড়ার সময় এল, তখন তিনি ঘোষণা করলেন যে, এটি হজ্জ্বের জন্য বছরের সঠিক দিন এবং ভবিষ্যতেও একই দিনে হজ্জ্ব করা অব্যাহত থাকবে।

এই উদাহরণগুলি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পয়গম্বর তাঁর সমগ্র নীতি কীভাবে গভীর প্রজ্ঞা দ্বারা চালিত করেছিলেন, যে প্রজ্ঞা তাঁকে ঈশ্বর দান করেছিলেন। আমরা বলতে পারি যে, তিনি ঈশ্বরের চাকার সঙ্গে তাঁর নিজের চাকা মিলিয়ে নিয়েছিলেন; তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কারণেই তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।

৮. ঘটনার ঊর্ধ্বে ওঠা

পয়গম্বর মহম্মদ(স.)-এর আগমনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে, আরব উপদ্বীপ প্রচুর রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তখনকার দুই প্রবল শক্তি: রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য আরব উপদ্বীপের পশ্চিম ও পূর্বে অবস্থান করেছিল এবং উভয়ই আরবদের ভূমিকে তাদের রাজনৈতিক ক্রীড়াঙ্গনে পরিণত করেছিল। উপদ্বীপের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলগুলি এই দুটি শক্তির একটি বা অন্যটির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইরাক পারস্য দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল, অনাদিকে সিরিয়া, জর্ডান, প্যালেস্টাইন এবং লেবানন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমে লোহিত সাগর এবং পূর্বে পারস্য উপসাগরের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষামূলক সীমানা থাকা সত্ত্বেও, এই সমুদ্রের সীমানা ঘেঁষে থাকা ভূমিগুলি তাদের শক্তিশালী প্রতিবেশীদের অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত ছিল না। ওমান উপসাগর অতিক্রম করে আরব ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে পারস্যের যুদ্ধজাহাজের কোনো অসুবিধা হয়নি। লোহিত সাগরও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে থাকা মিশর এবং ইথিওপিয়া কর্তৃক আরব বিষয়ে হস্তক্ষেপে কোনো বাধা হয়নি।

আরব উপদ্বীপের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে উপজাতি সর্দাররা রাজ্য স্থাপন করেছিল, কিন্তু তারাও প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করেনি। রোম ও পারস্যের সামগ্রিক আধিপত্যের কারণে এই উপজাতীয় সর্দাররা এই সাম্রাজ্যিক শক্তিগুলির অধীনে সামন্তরূপেই কিছু স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে পারত। সিরিয়ার সীমান্তে রোমান সাম্রাজ্যের অধীন ঘসাসিনা আরবীয় রাজ্যটি হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর কর্মকাণ্ডের সময় হারিস ইবন আবি শিমর ঘাসানি দ্বারা শাসিত ছিল। তারপরে সেখানে ছিল বসরা যা রোমানদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে থাকার পাশাপাশি রোমান সংস্কৃতি দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল; এর অনেক বাসিন্দা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

ইরাক সীমান্তে হিরাহ 'আরাবি'য়াহ্ রাজ্য ছিল ইরানের অধীনে। পারস্য উপসাগরের সীমান্তবর্তী বেশ কয়েকটি রাজ্যও ছিল, যেখানে তাদের পারস্য প্রতিবেশীর প্রভাব দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়েছিল। তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিল মুনজির ইবন সাওয়া কর্তৃক শাসিত বাহরাইন, যেখানে অনেক বাসিন্দা জরাথুস্ট্রীয় ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এইভাবে পারস্যের প্রভাবে আসা অন্য দুটি রাজ্য হল জলন্দির দুই পুত্র জাইফার ও 'আব্দ দ্বারা শাসিত 'আম্মান, এবং হাওজা ইবন 'আলি আল-হানাফি দ্বারা শাসিত ইয়ামামা। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এবং আরবে তাদের নিজ নিজ সামন্তরা তাদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, ঘসাসিনা রোমানদের পক্ষে এবং হিরাহ পারস্যদের পক্ষে ছিল। অতএব, বৃহৎ শক্তিগুলির আগ্রাসী লক্ষ্যপূরণে নিশ্চিতভাবে আরব রক্তই প্রবাহিত হতো।

সেই সময়ে ইয়েমেন আজকের তুলনায় অনেক বড় ছিল। এখানে বেশ কয়েকটি ছোট উপজাতীয় সরকার ছিল, যার মধ্যে বৃহত্তমটির রাজধানী ছিল সানা'আ'। নাজরান সেখানেই অবস্থিত ছিল। ৩৪৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইয়েমেনে বিদেশী শাসন শুরু হয়েছিল, যখন রোমানরা এই অঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারিদের পাঠায়। ওই মিশনারিরা নাজরানে ব্যাপক সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছিল এবং দেশের অধিকাংশ অধিবাসী খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

যদিও এটি একটি ধর্মীয় ঘটনা ছিল, পারস্যে রোমানদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এটিকে রাজনৈতিক বিপদ হিসেবে মনে করেছিল। তাদের মনে হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্য আরবের দক্ষিণাঞ্চলে পা রাখতে চাইছে। পারস্য তখন ইহুদি উপজাতিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিল, যে ইহুদিরা ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমানদের দ্বারা সিরিয়া থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ইয়েমেনে বসতি স্থাপন করে। ইউসুফ জু নুওয়াস জন্মসূত্রে আরবীয় হলেও ইহুদিদের ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পারস্যের সাহায্যে তিনি সাসানীয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় সানা'আ'য় একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি নাজরানের খ্রিস্টানদের নির্মূল করতে শুরু করেন, যাদের মধ্যে অনেককে ৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

রোমানরা তখন ওই অঞ্চলে তাদের দখল রক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রকাশ্যে ইয়েমেনের খ্রিস্টানদের রক্ষা করার জন্য এইরকম করা হচ্ছে

বলা হলেও, তারা ইথিওপিয়ান রাজা নাজাশিকে বেছে নিয়েছিল। নাজাশি ছিলেন একজন খ্রিস্টান এবং রোমানদের প্রতি অনুগত: তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রোমানরা তাকে ইউসুফ জু নুওয়াসের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল। এরপর নাজাশি ইথিওপীয় সর্দার আরিয়াতের অধীনে ইয়েমেনে সেনাবাহিনী পাঠান। একটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ ঘটে, যার পরিসমাপ্তিতে ইথিওপীয় বাহিনী সানা'আ' দখল করে এবং জু নুওয়াস সমুদ্রে ডুবে আত্মহত্যা করেন। এর কিছু পরেই আরিয়াতের সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক আবরাহাহ তাঁর সেনাপতিকে হত্যা করেন এবং নাজাশির সম্মতিক্রমে সানাআয় নিজের সরকার গঠন করেন। তিনিই ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে মক্কার পবিত্র কা'বাহ ঘরে আক্রমণ করার জন্য রওনা হয়েছিলেন। তাঁর দুই পুত্র, প্রথমে ইয়াকসুম এবং তারপর মাসরুক, তাঁর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

ইয়েমেনের প্রাক্তন রাজপরিবারের একজন সদস্য, যাঁর নাম সাইফ ইবন জী-ইয়াজান, সেইসময় তাঁর দেশ থেকে বিদেশিদের বিতাড়িত করার এবং তাঁর পূর্বপুরুষের রাজবংশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কথা ভেবেছিলেন। তিনি একটি স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্থানীয় সমর্থন অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হলে, তিনি সামরিক সহায়তার সন্ধানে ইরানের রাজা নওশেরওয়ানের কাছে যান। নওশেরওয়ান দ্রুত এই সুবর্ণ সুযোগটি কাজে লাগান: যখন দাহরাজের অধীনে একটি ইরানি সৈন্যবাহিনী ইয়েমেনে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, সেই সময় সাইফ ইবন জী-ইয়াজান মারা যান, তখন তাঁর পুত্র মাদি কারব ইরানি বাহিনীকে তাঁর দেশে আনার ব্যবস্থা করেন। ওমান উপসাগর পেরিয়ে, তাঁরা হাজরামাওতে অবতরণ করেন এবং সেখান থেকে সানা'আ'র দিকে এগিয়ে যান। মা'দি কারব এবং দাহরাজের জোট ইয়েমেন থেকে ইথিওপিয়ানদের বিতাড়িত করতে সফল হয়। মাদি কারব সানা'আ'র রাজা হন, কিন্তু ইরানের সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখা হয়, যার ফলে ইয়েমেন একটি আন্তঃসামুদ্রিক ইরানি প্রদেশে পরিণত হয়। ইসলামের আবির্ভাবের সময় সেখানে একজন ইরানি গভর্নর ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বাজান এবং প্রাথমিক কিছু বিরোধিতার পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই সব ঘটনা প্রমাণ করে যে, পয়গম্বর মুহাম্মদ(স.)-এর কার্যকালে আরব ভূখণ্ড কতদূর পর্যন্ত রোম ও পারস্যের সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনার

শিকারে পরিণত হয়েছিল। এমতাবস্থায় পয়গম্বরের মতো একজন সংস্কারকের জন্য দুটি পথ খোলা ছিল। তিনি নিজেকে বর্তমান ক্রিয়াকর্মের জোয়ারের স্রোতে বয়ে যেতে দিতে পারতেন বা তাঁর দেশের জন্য ভীতিপ্রদ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করতে পারতেন। অথবা তিনি তাঁর জনগণের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে এমন মাত্রায় গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করতে পারতেন যে, তাদের পক্ষ থেকে সামান্য প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী কাঠামো ভেঙে পড়তে পারে।

পয়গম্বর প্রথম বিকল্পের পরিবর্তে দ্বিতীয়টিই বেছে নিয়েছিলেন। পবিত্র কা'বাহ্ ঘরে আবরাহাহ-র আক্রমণের কথা 'আল-ফিল' এবং 'কুরাইশ' শিরোনামে কুরআনের দুটি অধ্যায়ে (১০৫ এবং ১০৬) উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন স্পষ্টভাবে বলে যে 'ইবাদত বা প্রার্থনা'র দ্বারা এই ধরণের হুমকির মোকাবিলা করা উচিত। এটাই ইসলামের পথ। যখন কোনো রাজনৈতিক হুমকি অনুভূত হয়, তখন তার সমাধান কোনো রাজনৈতিক স্তরে নয়, বরং আধ্যাত্মিক স্তরে, ইবাদত বা প্রার্থনার স্তরে খুঁজতে হবে।

৯. পয়গম্বরীয় পদ্ধতি

ক. নিজেকে অন্তর থেকে শক্তিশালী করা

ইসলামের ইতিহাস শুরু হয়েছিল খ্রিস্টীয় ৬১০ সালে, যখন পয়গম্বর মুহাম্মদ(স.) তাঁর প্রথম ঐশীবাণী পেয়েছিলেন। তখন সমগ্র পৃথিবীতে তিনিই ছিলেন একমাত্র মুসলমান, একমাত্র বিশ্বাসী। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে পয়গম্বর মক্কা থেকে মদিনায় আসেন। সেখানে তিনি একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু এর সীমানা ছিল অত্যন্ত সীমিত। এটি মদিনার ছোট শহরের কয়েকটি অংশে সীমাবদ্ধ ছিল, এবং বৃহত্তর অংশটি ইহুদি উপজাতি এবং আরবদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। তার এগারো বছর পর পয়গম্বরের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সময় ইসলামের সীমানা সমগ্র আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা দক্ষিণ প্যালেস্টাইনেও পৌঁছেছিল। এক মিলিয়ন বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত একটি ইসলামি সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম উত্তর আফ্রিকার মধ্য দিয়ে পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত এবং স্পেন থেকে পূর্বে চিনের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। বুডাপেস্টের মতো দূরবর্তী স্থানে এখনও ইসলামি প্রভাবের চিহ্ন রয়েছে, যেখানে এখনও দানিউব নদীর তীরে ‘গুল বাবা’ নামক একটি মুসলিম মাজার দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সে অবস্থিত অনেক গির্জার বুরুজ আরবিতে খোদাই করা পাথর দিয়ে তৈরি, এগুলি হিজরি অষ্টম শতাব্দীর অবশিষ্ট চিহ্নসমূহ, যখন দক্ষিণ ফ্রান্স দামাস্কাসের খলিফার একটি ইউরোপীয় প্রদেশ ছিল। এর দুশো বছর আগেও আরবের সাধারণ লোকেরা উট চালাত, আর এখন তারাই বিশ্ব পরিচালনা করছিল। বাগদাদ সভ্য জগতের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, সেলুসিয়া, পার্সেপোলিস, ব্যাবিলন এবং রোমের কাছ থেকে বাগদাদ শিক্ষার প্রধান আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসাবে সমস্ত আলো কেড়ে নিয়েছিল। এই অসামান্য বিজয়গুলি একটি অভূতপূর্ব সাধারণ কর্মসূচির ফলাফল ছিল, যা কুরআন এই শব্দগুলিতে ব্যাখ্যা করেছে:

“হে বস্ত্রাবৃত, জেগে ওঠো এবং সতর্ক করো। তোমার ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করো, তোমার পোশাক পরিচ্ছন্ন করো এবং যাবতীয় অশুদ্ধতা থেকে দূরে থাকো। পাওয়ার আশায় কোনো উপকার করবে না। তোমার ঈশ্বরের জন্য ধৈর্য ধরো।”–৭০

সংক্ষেপে, এই কর্মসূচীকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে:

১. ব্যক্তিগত সংস্কার, যাতে একজন ব্যক্তি একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করে, তার নিজের নৈতিক মান সংশোধন করে এবং সব ধরণের পাপ ও অন্যায় এড়িয়ে চলে।

২. অন্যদের কাছে তাদের অস্তিত্বের এবং চূড়ান্ত ভাগ্যের বাস্তবতা কথা পৌঁছে দেওয়া, যে তারা ঈশ্বরের সেবক এবং মৃত্যুর পরে তারা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।

৩. প্রতিকূলতার মুখেও অবিচল থাকা, যা নিজের এবং সমাজ উভয়ের সংস্কারের প্রচেষ্টায় একজনকে মুখোমুখি হতে হয়।

খ. অন্তরের শক্তি

ইসলামি সংগ্রাম মূলত একটি ব্যক্তিগত সংগ্রাম, যা পরবর্তী জগতে পরিত্রাণের জন্য একটি অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত — একটি আকাঙ্ক্ষা যে আমরা যখন ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হব, তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন। যখন ইসলাম আমাদের চেতনার গভীরে প্রবেশ করে, তখন আমরা কেবলমাত্র একটি বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি: কীভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং ক্ষমা অর্জন করা যায়। আমরা অবিলম্বে আমাদের বিশ্বাস, ধারণা, চরিত্র, ক্রিয়াকলাপ সমস্ত কিছু নতুন ছাঁচে ঢালি এবং আমরা যা কিছু করি তা যাতে ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট না করে, সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকি। আমাদের সমস্ত মনোযোগ পরপারের দিকেই থাকে। আমরা অন্যদের ইসলামের দিকে আহ্বান করি, আমরা প্রথমে নিশ্চিত করি যে আমরা নিজেরা ভালো মুসলমান;

“বল: আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি সবার আগে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করি।”–৭১

অনুপ্রেরণার দিক থেকে, “ঈশ্বরের কাছে সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণ করা”

সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু পরিণতিতে এই কাজটি সমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। একটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রথমে একটি পাহাড়ের ভিতরে শুরু হয়, যা মানবজাতির চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু যখন অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, তখন এটি তার আভায় পুরো আশেপাশের এলাকাকে আলোকিত করে। যারা প্রথমে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের ক্ষেত্রেও বিষয়টা এক। তাদের মধ্যে যে রূপান্তর ঘটে তা তাদের সমগ্র পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও একই ধারা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত সংস্কার বিষয়ে কুরআনের প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। পরবর্তীতে অধ্যায়গুলো এসেছে বৃহত্তর সমাজের উন্নতি বিষয়কে কেন্দ্র করে। ইসলামের পয়গম্বর কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতির সঙ্গে এই ক্রমটির তুলনা করে, মুহাম্মদ মারমাডিউক পিকথাল, তাঁর করা কুরআনের অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন:

“পয়গম্বরের অনুপ্রেরণা অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে বাহ্যিক বিষয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছিল।”-৭২

সাধারণত লোকেরা বাইরের জগতের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে জীবনের সবচেয়ে সার্থক কাজ বলে মনে করে। কিন্তু পয়গম্বরের জীবনের শিক্ষা হল, নিজেকে অন্তর থেকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করতে হবে। যে ব্যক্তিরা ভিতর থেকে নিজেদের শক্তিশালী করেছে, তারা যখন শক্তিপরীক্ষায় বাইরে আসে, তখন তারা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। কীভাবে একজন ব্যক্তি অন্তর থেকে শক্তিশালী হয়? কুরআন আমাদের এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোনো জাদুকরি ব্যবস্থাপত্র দেয় না। এটি কেবলমাত্র বিশ্বাস, সৎকর্ম এবং অবিচল অধ্যবসায় দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে। প্রথমত, ঐশ্বরিক সত্য আমাদের হৃদয় ও মনের গভীরে গেঁথে থাকা উচিত। পরপারের জীবন, চিরন্তন বাস্তবতার জগৎ সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনা ঠিক করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত। আমাদের এই মনোভাব গড়ে তোলা উচিত যে, আমাদের জীবনে কোনো অধিকার নেই, কেবল দায়িত্ব আছে। আমরা ঐশ্বরিক পথ অনুসরণ করলে অসুবিধা দেখা দিতে বাধ্য। সেই কারণে অন্যদের উপর দোষ না চাপিয়ে, আমাদের শান্ত এবং নম্রভাবে গ্রহণ করার মনোভাব থেকে সেই অসুবিধাগুলি সহ্য করা উচিত। এই গুণাবলী মানুষের ভিতরের শক্তিকে সংগঠিত করে। পয়গম্বর মুহাম্মদ(স) আমাদের এই গুণাবলী কীভাবে গড়ে

তুলতে হয় তার একটি নিখুঁত উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি এই গুণাবলি এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে কেউই তাঁর চারিত্রিক শক্তির সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি। পয়গম্বর যখন বাইরের জগতে প্রকাশিত হলেন, তখন প্রায় সমস্ত পরিচিত বিশ্ব তাঁর সামনে আত্মসমর্পণ করেছিল। মানুষ তাঁর মহৎ চরিত্রের সামনে আত্মসমর্পণ করেছিল, কারণ তাঁর ব্যক্তিত্বের শক্তি তার ভেতর থেকে এসেছিল।

প্রখ্যাত হিন্দি লেখক, সর্দার পূরণ সিং (১৮৮২-১৯৩২) তাঁর 'সাহসী' শিরোনামের নিবন্ধে পয়গম্বর মুহাম্মদ(স.)-কে ইতিহাসের সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছেন। আরব উপদ্বীপে এত বড় বিপ্লব ঘটাতে তাঁকে সাহসী হতে হয়েছিল। যিনিই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তিনিই তাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়েছিল, — এখান থেকে তাঁর মহত্ত্ব অনুমান করা যায়। এটা কোন ধরণের সাহসিকতা যা একজনকে এত শক্তিশালী করে তোলে? পুরণ সিংয়ের ভাষায়:

'প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতি ঘণ্টায়, নিজেকে মহত্তর করার জন্য প্রচেষ্টাকে সাহস বলে। কাপুরুষরাই বলে, "এগিয়ে যাও" আর সাহসীরা বলে, "এক পা পিছনে এসো।" কাপুরুষরা বলে, "তলোয়ার তুলুন," আর সাহসীরা বলে "আপনার মাথাটি এগিয়ে আনুন!" সাহসীদের নীতি হল সব দিক থেকে শক্তি সংগ্রহ করা এবং শক্তি বৃদ্ধি করা। সাহসীরা তাদের ভিতরে শক্তি তৈরি করে এবং নিজেদের অন্তরের শক্তি থেকেই এগিয়ে যায়। মানুষের হৃদয় আন্দোলিত করে তারা সারা পৃথিবীকে আন্দোলিত করতে পারে। সাহসিকতা মানে আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়া এবং তারপর টিনের টুকরোর মতো ঠান্ডা হয়ে যাওয়া নয়, যা অল্প সময়ে উত্তপ্ত হয়ে আবার দ্রুত শীতল হয়ে যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী আগুন জ্বলতে পারে, তবুও তা সাহসীদের উত্তপ্ত করে না, যেমন শতাব্দী প্রাচীন বরফ সাহসীদের একচুলও ঠান্ডা করার জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। লোকে বলে, "কাজ, কাজ, কাজ, কাজ" কিন্তু এই সমস্ত কথাবার্তা নিরর্থক বলে মনে হয়। প্রথমে কাজের জন্য শক্তি তৈরি এবং সংগ্রহ করতে হবে। প্রথমে কাজের জন্য শক্তি তৈরি এবং সংগ্রহ না করে, "কাজ করুন, কাজ করুন", এই চিৎকার করা বৃথা! একটা গাছের মতো নিজের ভেতরে গভীরভাবে শিকড় গাড়তে হবে এবং বেড়ে উঠতে হবে। পৃথিবী একটি আবর্জনার স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে

নেই যেখানে যে কেউ নিছক মোরগের মতো ডেকে খ্যাতি এবং প্রশংসা অর্জন করতে পারবে। ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক সত্যের চিরন্তন নীতির উপর পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে। যখন কেউ এই সত্যগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হয়, তখন সে বিজয়ী হয়।–৭৩

এই সাহসিকতার রহস্য জাদুকরি বিধান বা নির্জনতায় গৃহীত আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মধ্যে নেই। জাদুবিদ্যার অনুশীলন জাগতিক পৃথিবীতে মায়াপ্রপঞ্চের অবতারণা করতে পারে, কিন্তু দৈনন্দিন সমস্যাগুলির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়া লোকেদের জন্য তা কোনো কাজে আসে না। আসল শক্তি হল সেটাই যা আমাদের জীবনের সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

মানুষ তখনই প্রকৃত অন্তরের শক্তির বিকাশ ঘটায় যখন সে সমস্ত স্বার্থপর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়; যখন সে চিন্তার এমন একটি স্তরে পৌঁছায় যেখানে সমস্ত ভাসাভাসা বিবেচনাকে একপাশে রেখে দেওয়া হয় এবং যেমনটি পয়গম্বর বলেছেন, "তারা সমস্ত জিনিসকে তাদের স্বরূপে দেখতে পায়।" তাদের চিন্তাভাবনা এবং কাজগুলি তখন কুসংস্কার, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা, ক্ষমতার লালসা, অহংকার, স্বার্থ বা এই জাতীয় কোনো প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয় না। এটিই চরিত্রের শক্তি তৈরি করে। এটি জীবনের একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি, যা একজন ব্যক্তিকে প্রতিটি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে সক্ষম করে। অন্তরের শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের উদ্যোগ অনিবার্যভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করে। তারা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্ত পরিস্থিতির বিচার করে। লোকেরা যত বেশি তাদের বিরোধিতা করে, তারা তাদের সত্য ও ন্যায়ের অবস্থানকে তত বেশি মেনে চলে।

হজরত মুহাম্মদ(স.)–এর অন্তরের শক্তি যেভাবে তাঁর সামনে আসা সমস্ত সমস্যার সমাধান দিয়েছিল তার একটি উদাহরণ মক্কা বিজয়ের পরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে পাওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরের শক্তি বিভিন্ন উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করেছিল; কখনো তা ক্ষমার রূপে, কখনো পরম সাহসে, কখনো বা ঈশ্বরের ওপর পরিপূর্ণ আস্থায়, আবার কখনো দূরদর্শিতায়। মাঝে মাঝে তিনি দেখিয়েছিলেন কীভাবে আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে অজেয় শক্তিতে পরিণত হতে হয়; যে সব কিছু ত্যাগ করে, সে সবচেয়ে লাভবান হয়।

হিজরি সাল ৮-এ হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর মক্কা বিজয়ের পর, কিছু কুরাইশ ব্যক্তি হাওয়াজিন এবং সাকিফ গোষ্ঠীতে পালিয়ে যায় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধ শুরু করার জন্য তাদের প্ররোচিত করে। উপজাতিরা তাদের সমস্ত জনশক্তিকে একত্রিত করে সাড়া দিয়েছিল, এবং ২০,০০০ লোকের একটি বাহিনী সংগ্রহ করেছিল। হুনাইনের ময়দানে তারা মুসলমানদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়। হাওয়াজিনের তীরন্দাজরা একটি উপত্যকায় লুকিয়ে ছিল। যখন তারা মুসলমানদের উপর তাদের তীর বর্ষণ করতে শুরু করে, তখন মুসলমানদের ১২,০০০ শক্তিশালী সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রায় ১১,০০০ জন উল্টোদিকে ঘুরে পালিয়ে যায়। এই প্রাথমিক ধাক্কা সত্ত্বেও, মুসলমানরা অবশেষে একটি অসাধারণ বিজয় লাভ করে। তাদের জয়ের কারণ ছিল তাদের নেতা, হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর অন্তরের শক্তি, যিনি এই জটিল সন্ধিক্ষণে, আতঙ্কের কোনো লক্ষণ দেখাননি; তিনি 'ট্র্যাঙ্কুইলিটি'র (প্রশান্তির)(-৭৪) আদর্শস্বরূপ ছিলেন এবং ঈশ্বরের উপর ভরসা রেখেছিলেন। একবার তাঁর অন্তরের শক্তি প্রকাশ্যে এলে, তিনি অবিলম্বে যুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তন করেন। শত্রুর একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে, তিনি তাঁর আতঙ্কিত অনুসারীদের ডাকলেন;

"আমি পয়গম্বর, এবং আমি মিথ্যা বলি না। আমি 'আব্দুল মুত্তালিবের নাতি।"

পয়গম্বর ডাকলেন, "আমার কাছে এসো, ঈশ্বরের বান্দারা।" তাঁর খুড়তুতো ভাই ইবন আব্বাসকে পলায়নরত সৈন্যদের কাছে উচ্চৈঃস্বরে এই আবেদন করতে বলেছিলেন: "তোমরা যারা রিদওয়ান গাছের ছায়ায় পয়গম্বরের কাছে আনুগত্যের শপথ করেছিলে তোমরা শপথ করেছিলে যে, তোমরা বিশ্বাসের জন্য নিজেদের জীবন দেবে! তাহলে তোমরা এখন কোথায়?" মুসলমানরা যখন দেখল যে তাদের নেতা শত্রুর সামনেও দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সাহায্য আছে। তাদের ঝিমিয়ে পড়া অন্তর পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল এবং তারা নতুন সংকল্প নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ফিরেছিল। তাদের নতুন পাওয়া উদ্দীপনা এতটাই সীমাহীন ছিল যে তারা তাদের পলায়নরত উটগুলির ঘুরে দাঁড়ানোর জন্যও অপেক্ষা করেনি; তারা উটের উঁচু পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পায়ে যুদ্ধের

ময়দানে হেঁটে ফিরে যায়। হঠাৎ যুদ্ধের গতিপথ পাল্টে গেল। তারপর শত্রুদের সমূলে উৎখাত হওয়ার পালা। সেদিন প্রায় ২৪,০০০ উট, ৪০,০০০ ছাগল এবং ৪০,০০০ আউন্স রূপা মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। তারা প্রায় ৬,০০০ জনকে বন্দিও করেছিল।

এই জয় সত্ত্বেও পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। সাকিফ ছিল সমগ্র আরবের দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী। উপদ্বীপের একমাত্র সুরক্ষিত শহরের মালিকানাও তাদের ছিল। তারা তখন তা'ইফে অবরুদ্ধ ছিল। তারা হুনাইনে যতটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, তিন সপ্তাহের অবরোধের সময় তারা মুসলমানদের তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করেছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতা এতটাই গভীর ছিল যে, যখন তাদের একজন, 'উরওয়াহ ইবন মাসউদ সাকাফি, যে তার মানুষের কাছে 'মিষ্টি মেয়েদের চেয়েও প্রিয়' বলে অভিহিত হয়েছিল, সে যখন পয়গম্বরের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তখন তারা তার প্রতি আগের স্নেহ ভুলে গিয়েছিল, এবং নিষ্ঠুরভাবে তাকে তীর দিয়ে আঘাত করেছিল।

আবারও পয়গম্বরের অন্তরের শক্তি তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিল। অবরোধ কঠোর করা হলে, 'উমর পয়গম্বরকে তা'ইফবাসীদের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করতে বললেন; কিন্তু পয়গম্বর তাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাদের প্রতি এই আচরণে তিনি তাদের প্রতি কোনো রাগ বা পক্ষপাত দেখাননি। তিন সপ্তাহ তা'ইফ শহর অবরোধ করার পর তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে পিছু হঠতে নির্দেশ দেন। তা'ইফ থেকে ফেরার সময় পয়গম্বর জি'রানাতে পৌঁছান, যেখানে হুনাইনের যুদ্ধের লুণ্ঠিত জিনিস জমা করা হয়েছিল।

এখানে পয়গম্বর সাকিফ গোষ্ঠীর সহযোগী, হাওয়াজিনদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করেছিলেন; তাদের ছয় হাজার বন্দীর মুক্তির জন্য সেই উপজাতির একটি প্রতিনিধি দলের আবেদন গ্রহণ করেছিলেন। তাদের প্রতি তাঁর উদার আচরণের একটি নমুনা হল, তিনি তাদের শুধু মুক্তই করেননি, তাদের যাত্রার জন্য পোশাক এবং যাত্রার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন, যা তাদের উপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য ছিল। হাওয়াজিন গোষ্ঠীর সকলেই এই সীমাহীন উদারতার সামনে পরাভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

এই ঘটনার প্রভাব তা'ইফেও অনুভূত হয়েছিল। হাওয়াজিন এবং সাকিফ একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর দুটি শাখা। সাকিফরা তাদের শহর অবরোধের চেয়ে হাওয়াজিনদের ইসলাম গ্রহণের কারণে অনেক বেশি বিপন্নতা অনুভব করেছিল। তাদের জোট থেকে হাওয়াজিনদের বিচ্ছিন্ন হওয়া একটি মারাত্মক ক্ষতি ছিল; সাকিফরা জানত যে এর ফলে তারা আর মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না।

সাকিফরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল। তারা দেখতে পেল যে তারা এখন তাদের আশেপাশের অন্যান্য সব আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না, যারা পয়গম্বরের আনুগত্য স্বীকার করেছিল এবং তাঁর বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল।(-৭৫)

হিজরি সাল ৯ (৬৩০ খ্রিস্টাব্দ)-এ তা'ইফ থেকে একটি প্রতিনিধি দল মদিনায় আসে। তারা কিছু অস্বাভাবিক শর্তে ইসলাম গ্রহণে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। যেমন, তারা তাদের ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের সেনাবাহিনীকে যাতায়াত করার অধিকার দিতে অস্বীকার করেছিল, তারা ভূমিকর দিতেও অস্বীকার করেছিল; তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল; তারা আরও বলেছিল যে তারা প্রার্থনা (সালাত আদায়) করবে না বা তাদের গোষ্ঠীর নয় এমন কোনো শাসককে স্বীকৃতি দেবে না। পয়গম্বর তাদের সকল শর্ত মেনে নিলেন, সেইসঙ্গে তিনি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সেই ধর্মের মধ্যে তেমন কোনো কল্যাণ নেই, যা ঈশ্বরের কাছে নত হতে শেখায় না। সহযোগীরা বিস্মিত হয়েছিলেন যে, পয়গম্বর তাদের যাবতীয় পূর্বশর্তসহ তাদের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামকে মেনে নিলেন, কিন্তু পয়গম্বর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং এই কথাগুলি দিয়ে তাদের মন শান্ত করলেন:

"একবার তারা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করলে, কিছুকাল পর থেকে তারা নিজেরাই দান করবে এবং ঈশ্বরের পথে চলবে।"(-৭৬)

আনাস ইবন মালিকের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ বলেছেন ইসলাম গ্রহণের আগে কোনো ব্যক্তি যে অনুরোধই করতেন পয়গম্বরের তা মেনে নিতেন। তাঁর কাছে আসা এক ব্যক্তিকে হজরত মুহাম্মদ(স.) একবার এত বিশাল এক পাল ছাগল দিয়েছিলেন যে, সেই ছাগলের সারি এক পাহাড় থেকে আর এক

পাহাড় পর্যন্ত লম্বা ছিল। সেই ব্যক্তি ফিরে গিয়ে তাঁর লোকেদের ইসলাম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, "মুহাম্মদ এত কিছু দেন যে আর কিছু চাইবার প্রয়োজন হয় না।" কিন্তু ইবন কাসিরের বর্ণনায় দেখা যায়, কোনো ব্যক্তি যদি পয়গম্বরের কাছে এসে পৃথিবীটাও চাইতেন, এক দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই সেই ব্যক্তির মধ্যে একটি বিশাল পরিবর্তন আসত, গোটা পৃথিবীর তুলনায় পয়গম্বরের প্রচারিত বিশ্বাসের কথা তার কাছে প্রিয়তর মনে হতো।

একবার সাকিফ এবং হাওয়াজিনের ব্যাপারটি মিটমাট হয়ে যাওয়ার পরে, আর একটি গুরুতর অসুবিধা মাথাচাড়া দেয়। হাওয়াজিনের উপর জয়ের পরে মুসলমানরা বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠনের সামগ্রী মজুত করেছিল। মহান উদারতার সঙ্গে, পয়গম্বর নব ধর্মান্তরিত মক্কাবাসীদের মধ্যে সেই সামগ্রীগুলো বিতরণ করেন। আনসারদের কয়েকজন, যারা পয়গম্বরকে তাদের শহরে আসার সময় সাহায্য করেছিল, তাদের পক্ষে এটা সহ্য করা কঠিন ছিল। তাদের মনে হয়েছিল যে, পয়গম্বর যখন আবার তাঁর নিজের শহরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি অতি দেশপ্রেমভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের লোকেদের সন্তুষ্ট করার জন্য ধন-সম্পদ বিতরণ করছেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে পয়গম্বর এই ধরণের সাধারণ ভাবনার উর্ধ্বে ছিলেন, কিন্তু আনসাররা বাদ পড়ায় তারা যে বিরক্তি অনুভব করেছিল তা যথেষ্ট বাস্তব ছিল এবং মুসলিম ঐক্যের জন্য গুরুতর সমস্যা তৈরি করেছিল। পয়গম্বর অবশ্য যেভাবে তাদের সন্দেহ দূর করেছিলেন, তাতে তাঁর উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পয়গম্বর সমস্ত আনসারদের একটি উঠানে একত্রিত করলেন এবং তাদের সম্বোধন করলেন এইভাবে: "এটা আমি তোমাদের সম্পর্কে কী শুনছি? এটা কি সত্য নয় যে তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে, এবং ঈশ্বর আমার মাধ্যমে তোমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন? তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন ছিল, তিনি আমার মাধ্যমে তা প্রচুর পরিমাণে তোমাদের দিয়েছেন। তোমরা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলে এবং ঈশ্বর তোমাদের আমার চারপাশে একত্রিত করেছেন?" সবাই চেঁচিয়ে তাদের সম্মতি জানাল। পয়গম্বর বলে চললেন; "তোমাদের বলার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, আমরা মুহাজিররা তোমাদের কাছে উদ্বাস্তু হিসাবে এসেছি, আমাদের নিজস্ব ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছি এবং তোমরা

আমাদের আশ্রয় দিয়েছ। আমরা অভাবী ছিলাম এবং তোমরা আমাদের দেখাশোনা করেছ, আমরা আতঙ্কিত ছিলাম এবং তোমরা আমাদের নিরাপদ করেছ, বন্ধুহীন ছিলাম এবং তোমরা আমাদের সঙ্গ দিয়েছ। আমাকে বলো, সাহায্যকারীরা, তোমরা কি শুধুমাত্র এই কারণে অসন্তুষ্ট যে আমি কিছু নব্য ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে তাদের মন ভালো করার জন্য একটি সামান্য উপহার দিয়েছি, এবং তাদের বিশ্বাস সুরক্ষিত করেছি, যেখানে তোমাদের ঈশ্বরের দেওয়া মহান উপহার দিয়েছি– যেটা হল ইসলাম? সাহায্যকারীর দল, তোমরা কি এটা দেখে খুশি হও না যে, অন্য লোকেরা যখন তাদের সঙ্গে উট ও ছাগল দিয়ে যাচ্ছে, তখন তোমরা ঈশ্বরের বার্তাবাহকের সঙ্গে বাড়ি ফিরছ।”(-৭৭)

তাঁর এই ভাষণ শুনে সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ল। “আমরা ঈশ্বরের বার্তাবাহকের সঙ্গে খুশি।” তারা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল। এভাবেই পয়গম্বরের অন্তরের শক্তি সব বাধা ভেঙে ফেলল, সব দরজা খুলে দিল, সব বিপত্তি কাটিয়ে উঠল। এটাই জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় তাঁর সফলতার চাবিকাঠি ছিল।

গ. বাহ্যিক লক্ষ্য: প্রচার বিষয়ক কার্যকলাপ

যখন পয়গম্বর মুহাম্মদ(স.) তাঁর সক্রিয় সংগ্রাম শুরু করেন, তখন যারা তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে তাদের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো তাগিদ তিনি অনুভব করেননি। সাধারণত, জনপ্রিয় আন্দোলনগুলি কোনো না কোনো প্রতিশোধের প্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়, তবে পয়গম্বরের সংগ্রাম ছিল নিজস্ব ইতিবাচক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো ঘটনার প্রতি, বা অন্যরা তাঁর সঙ্গে যেভাবে আচরণ করেছিল তার প্রতি, এটি কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ছিল না। নিশ্চিতভাবে, যে সমস্ত পরিস্থিতি, যা সাধারণত রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যা জনগণকে আন্দোলন শুরু করার দিকে পরিচালিত করে, পয়গম্বরকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় সে সবই যেন পূর্ণ শক্তিতে উপস্থিত ছিল। কিন্তু পয়গম্বর তাঁর বিশ্বাসের প্রচারকালে এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেননি। এই অধ্যায়ের শুরুতে উল্লিখিত কর্মসূচী অনুসারে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর লক্ষ্যগুলি অনুসরণ করেছিলেন, তবে

তিনি কারও সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিষয়ে সংঘর্ষ ছাড়াই তা করেছিলেন।

পয়গম্বর যখন তাঁর প্রচারকার্য শুরু করেছিলেন, তখন আরব-ভূমি তখনকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল, যারা দেশের তুলনামূলকভাবে উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিকে অধিকার করার বিষয়ে বিশেষভাবে তৎপর ছিল। উপদ্বীপের উত্তরে সমগ্র সিরিয়া, রোমান শাসনের অধীনে ছিল; এটি আরব সর্দারদের দ্বারা শাসিত ছিল, যারা সিজারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল। পয়গম্বরের সময় থেকেই ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলে, যেখানে পারস্য আধিপত্য ছিল, সেখানে বাজান নামে এক প্রাদেশিক শাসকের রাজত্ব ছিল। একমাত্র হিজাজ, তাহামাহ এবং নজদ অঞ্চলগুলি তাদের স্বাধীনতা ধরে রেখেছিল। এগুলি ছাড়া ছিল কেবল পাথুরে মরুভূমি, এবং তার মাঝে মাঝে ছিল বিরল মরূদ্যান। সীজার ও খসরুরা আরবকে তাদের নিজেদের সম্পত্তি মনে করত; এই কারণেই যখন পয়গম্বর পারস্যের সম্রাটকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন, তখন সেই অহংকারী সম্রাট তাঁর চিঠি ছিড়ে ফেলেন এবং বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন:

“সে আমার দাস হয়ে আমাকে চিঠি লেখে!”

পয়গম্বরের জন্মের বছর (৫৭০ খ্রীস্টাব্দ) কা’বাহ্ ঘরে আবরাহাহ-র আক্রমণ ছিল আরব ভূখণ্ডে বিদেশি শক্তির আগ্রাসনের অংশ। ইসলামের আবির্ভাবের আগে, কা’বাহ পুরো আরবের জন্য মূর্তি-পূজার কেন্দ্র ছিল: প্রতিটি উপজাতি সেখানে তাদের নিজস্ব মূর্তি স্থাপন করেছিল এবং এর আশেপাশের স্থানগুলিকে তারা পবিত্র বলে মনে করত। সারা বছর ধরে পবিত্র কা’বাহ-র প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং সেখানে যে মূর্তিগুলি স্থাপন করা হয়েছিল তাদের নৈবেদ্য দেওয়ার জন্য দূরদূরান্ত থেকে মানুষ মক্কায় আসত। তীর্থযাত্রীদের এই ক্রমাগত আগমনের ফলে মক্কার অর্থনীতি ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছিল এবং আবরাহাহ তার নিজের দেশ ইয়েমেনের দিকে, যা মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ছিল, এই বিশাল সম্পদের উৎসকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি ইয়েমেনের পূর্ববর্তী গভর্নরকে হত্যা করে সেই দেশ দখল করেন এবং আবিসিনিয়ার রাজাকে তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করেন। খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসীর আবরাহাহ্ সানা’আ’ শহরে বিশাল গির্জা স্থাপন

করেছিলেন, তারপরে সেখানে তীর্থযাত্রায় যাওয়ার জন্য জনগণকে প্ররোচিত করে তিনি একটি নিবিড় প্রচার শুরু করেছিলেন। এভাবেই তিনি মক্কা থেকে লাভজনক তীর্থ বাণিজ্যটি সানা'আ' শহরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। আরবের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে, যখন তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, তখন তিনি কা'বাহকে ধ্বংস করার জন্য রওনা হন; যাতে সানা'আ'তে তিনি যে গির্জাটি তৈরি করেছিলেন তা ছাড়া মানুষের তীর্থযাত্রা করার জন্য কোথাও কোনো তীর্থস্থান অবশিষ্ট না থাকে। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি হস্তীবাহিনী নিয়েছিলেন, যার ফলে তিনি 'হাতিদের অধিপতি' নামে পরিচিত হন। এমনকি তাঁর গির্জা নির্মাণকারীদের কয়েকজনের নামও জানা যায়। তিনি যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে আরবরা 'হাতির রাস্তা' নাম দিয়েছিল। যে ঝরনা থেকে তারা জল পান করেছিল, যে দরজা দিয়ে তারা মক্কায় প্রবেশ করেছিল এবং যে বছর তারা আক্রমণ করেছিল— সবকিছুর নামকরণ ঘটনা অনুসারে করা হয়েছিল।

এই ধরণের প্রতিকুল পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ নেতাই বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রাজনৈতিক বিপদের বিরুদ্ধে একটি জনপ্রিয় গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতেন। তাঁরা তাঁদের দেশকে বিদেশি আধিপত্যের কবল থেকে মুক্ত করে তাঁদের জনগণের জাতীয়তাবাদী প্রবৃত্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইতেন। কিন্তু ইসলামের পয়গম্বর এ ধরণের কোনো জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত ছিলেন। পয়গম্বর যখন পৃথিবীতে এসেছিলেন, তখন আরবে অর্থনৈতিক সংকট ছিল। আরব ছিল একটি প্রায় সম্পূর্ণ শুষ্ক ভূমি: একটি কৃষিপ্রধান যুগে, আরব এমন কোনো কৃষি ছিল না যার উপর ভিত্তি করে তার অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে। এটি এমন একটি সমস্যা যা দেশের প্রতিটি ব্যক্তিকে প্রভাবিত করেছিল এবং সহজেই এটি একটি জনপ্রিয় বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য উদ্দীপনা প্রদান করতে পারত। কিন্তু পয়গম্বর তাঁর দেশের মানুষদের অর্থনৈতিক সমস্যাকে কোনোভাবেই পুঁজি করেননি। একবার মক্কার ভদ্রলোকেরা সূর্যাস্তের পর কা'বাহ-র সামনে জড়ো হয়ে পয়গম্বরকে ডেকে পাঠালেন।সেখানে তিনি যখন তাঁদের ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা দিলেন, তখন তারা যেভাবে তাঁর বার্তায় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল তা হল,

“মুহাম্মদ, আপনি ভালো করেই জানেন যে, আমাদের থেকে দরিদ্র বা শুষ্ক কোনো দেশ আর নেই। আপনি জানেন যে আমাদের জীবিকা নির্বাহ করা কতটা কঠিন। তাই আমাদের পক্ষ থেকে আপনার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন এই শুকনো পাহাড়গুলো সরিয়ে দেন যেগুলো আমাদের জীবনকে এত কঠিন করে তুলেছে; তিনি যেন আমাদের ভূমিকে উর্বর করে দেন এবং সিরিয়া ও ইরাকের নদীগুলো মতো নদী এই উপত্যকায় প্রবাহিত করেন।(-৭৮)

কুরাইশ নেতারা পয়গম্বরের সঙ্গে এইভাবে কেন কথা বলেছিলেন, তা বোঝার জন্য আরবের ভৌগোলিক পরিস্থিতি বুঝতে হবে। হিজাজের উপকূলরেখা বরাবর নাজদ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি পর্বতমালা সমুদ্রের বাতাসকে ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দিত, যার ফলস্বরূপ ইরাক ও সিরিয়ার বিপরীতে আরব উপদ্বীপে বৃষ্টিপাত কম ছিল। আরবের অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে ছিল এই ভৌগোলিক অবস্থা। যে কোনো উদীয়মান নেতা এই সমস্যাগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। পয়গম্বর অবশ্য এই পথ বেছে নেননি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এই প্রাকৃতিক সমস্যাগুলির দিকে সরাসরি কোনো মনোযোগ দেননি এবং তাঁর প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের একত্ববাদ প্রচারের জন্য নিবেদিত করেছিলেন। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, উদ্দেশ্যগত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে পয়গম্বরের সংগ্রাম সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল, আরবদের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগের সূচনা করেছিল। কিন্তু এটা উপলব্ধি করা জরুরি যে এই সুবিধাগুলো ছিল পয়গম্বরের সংগ্রামের পরোক্ষ ফল: তিনি নিজে কোনোরকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লাভের জন্য কোনো চেষ্টা করেননি।

পয়গম্বরের সারা জীবন যে মূল বিষয়টি কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল সেটি হল, তিনি তাঁর বিশ্বাসের প্রচারকেই প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি যখন তাঁর সক্রিয় কার্যকলাপ শুরু করেন, তখন তিনি অন্য সব বিষয়কে একপাশে রেখে শুধুমাত্র ইসলামের বাণী প্রচারে মনোনিবেশ করেন। সর্বপ্রথম তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের জানাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, তাঁকে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে একটি নৈশভোজে ডেকেছিলেন। প্রায় চল্লিশজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যাঁদের মধ্যে কমপক্ষে ত্রিশজন উপস্থিত

ছিলেন। নৈশভোজের পরে, তিনি তাঁর অতিথিদের সম্বোধন করে তাঁর কথা উপস্থাপন করলেন, কিন্তু তাতে তিনি খুব একটা সাড়া পাননি। "বানু মুত্তালিব," তিনি বললেন, "আমাকে বিশেষভাবে আপনাদের কাছে, তারপর সমগ্র মানবজাতির জন্য পাঠানো হয়েছে। তাহলে কে আমার পক্ষ থেকে আমার ঋণ ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে? আমি দূরে থাকাকালীন আমার পরিবারের দেখাশোনা করবে কে? যে তা করবে, সে-ই স্বর্গে আমার সঙ্গী হবে।" পয়গম্বর তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু সেই সময়ে শুধুমাত্র 'আলি নামক এক অল্পবয়সী ছেলে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিল। "আমি করব, ঈশ্বরের পয়গম্বর," সে বলল। "তুমি, 'আলি, তুমি, আলি!" পয়গম্বরের উত্তর এলো।(-৭৯)

একদিন আবু জাহল পয়গম্বরের দিকে একটি পাথর ছুঁড়ে মারলে তাঁর মুখ থেকে রক্ত পড়তে থাকে। পয়গম্বরের কাকা আব্বাস এ কথা শুনেছিলেন। যদিও সেই সময় 'আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেননি, পারিবারিক অহংকার তাঁকে আবু জাহলের কাছে যেতে এবং বিনিময়ে তাকে আঘাত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তারপর তিনি পয়গম্বরের কাছে ফিরে আসেন। "ভাইপো," তিনি বিজয়ীর মতো বললেন, "আমি তোমার প্রতিশোধ নিয়েছি।" পয়গম্বর তাঁকে প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, "আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে সেটি আমাকে আরও খুশি করবে।"

একবার কুরাইশ নেতারা পয়গম্বরের আর এক কাকা আবু তালিবের কাছে এলেন। তারা বলল, "আবু তালিব, আপনার ভাইপো আমাদের এলাকায় এবং আমাদের সমাবেশে প্রবেশ করে এবং এমন কিছু বলে, যা আমাদের বিচলিত করে। দয়া করে, আপনি যদি পারেন, তাহলে তাকে নিরস্ত করুন।" আবু তালিব পয়গম্বরকে নিয়ে আসার জন্য তাঁর নিজের ছেলে আকিলকে পাঠালেন। যখন তিনি তাঁর ভাইপোকে কুরাইশদের কথা বললেন, তখন পয়গম্বর আকাশের দিকে চোখ তুললেন। "ঈশ্বরের শপথ", তিনি বললেন, "আপনাদের মধ্যে কেউ কি সূর্যের শিখা থেকে আগুন জ্বালাতে সক্ষম? স্বয়ং ঈশ্বর আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমিও তা ত্যাগ করতে সক্ষম নই।" একথা বলে পয়গম্বর কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

পয়গম্বর যে বানু হাশিম গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন, তাঁরা ছিলেন আরব সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশ। যেহেতু তাঁর গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই আরবে একটি প্রভাবশালী

অবস্থানে ছিল, কিছু লোক মনে করেছিল যে সম্ভবত পয়গম্বর নিজের কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করে রাজা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পয়গম্বরের কাজকর্ম প্রমাণ করে যে, তিনি শুধুমাত্র একটি বিষয়েই আগ্রহী ছিলেন, এবং তা হল মানুষকে পরজগতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার গুরুত্ব বোঝানো। তিনি এতটাই অবিচলভাবে এই বিষয়টির উপর জোর দিতেন যে কখনও কখনও কুরাইশ নেতারা তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রায় মরিয়া হয়ে তাঁর কাছে অনুরোধ করতেন। "মুহাম্মদ", আবু জাহল একবার তাঁকে বলেছিলেন, "আপনি কি আমাদের দেবতাদের অপমান করা বন্ধ করবেন? আপনি যদি শুধুমাত্র এটাই চান যে, আপনি আপনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন আমরা সেই সাক্ষ্য দিই, তাহলে ঠিক আছে: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই সেই বার্তা পৌঁছেছেন।"

পয়গম্বর অবশ্য অবিচলিত ছিলেন এবং তাঁর বাণী প্রচার করতে থাকেন। এটি কুরাইশদের আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং তারা পুরো বানু হাশিম পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা আন্তঃবিবাহ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই খবর পেয়ে বানু হাশিমরা শি'ব আবি তালিব নামে পরিচিত একটি স্থানে চলে যান। এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকাকালীন, তাঁদের মধ্যেই প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল যাঁরা এই নিষেধাজ্ঞার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং পয়গম্বর এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। এই বিধিনিষেধগুলি অবশ্য পবিত্র মাসগুলিতে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। পয়গম্বরের পরিবার এই অবকাশের সময় থেকে উপকৃত হতেন, এই সময় তাঁরা ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারতেন। তারপর কুরবাণির মাংস একত্র করে বছরের বাকি সময় ব্যবহারের জন্য শুকিয়ে নিতেন। কিন্তু পয়গম্বর এই সময়টিকে অন্যভাবে ব্যবহার করতেন। তিনি বিভিন্ন উপজাতির মানুষদের তাঁবুতে যেতেন এবং তাদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতেন।

ভাবুন, মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার সময় পয়গম্বরের অবস্থা কতটা বিপজ্জনক ছিল। তবুও এই যাত্রাকালে তিনি যাদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের কাছে ইসলাম প্রচারের একটি সুযোগও তিনি হাতছাড়া করেননি। উদাহরণস্বরূপ, তিনি যখন ঘামিমে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি বারিদাহ ইবন হাসিবের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেন; হাসিব তখন তাঁর পরিবারের আশি জন সদস্যের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রাকুবাহর গিরিপথে

পৌঁছে তিনি দুজন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যাদের তিনি ইসলামের কথা বলেছিলেন এবং তারা সেই বিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন। পয়গম্বর যখন তাদের নাম জিজ্ঞেস করলেন, তখন তারা বলল যে তারা আসলাম গোষ্ঠীর লোক এবং তারা পেশায় দস্যু। তারা আরও বলল, এই কারণে, তারা 'মুহানান' বা 'দুই ঘৃণ্য ব্যক্তি' বলে পরিচিত। 'না', পয়গম্বর তাদের বললেন, "তোমরা দুজন সম্মানিত ব্যক্তি।(-৮০)

পয়গম্বর মুহাম্মদ(স.) তাঁর সহযোগীদের মধ্যেও একই মনোভাব সঞ্চারিত করেছিলেন। এলাকা দখল করা বা যুদ্ধের লুটপাট জড়ো করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। বরং তাঁরা নিজেরাই অন্যদের জন্য সম্পদের উৎস হয়ে উঠলেন — সত্য বিশ্বাসের সম্পদ। পয়গম্বর যখন খায়বার ময়দানে তাঁর খুড়তুতো ভাই 'আলিকে মুসলমানদের পতাকার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, এবং মৃদুভাবে এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, তখন বলেছিলেন, "আপনি যখন তাদের ময়দানে পৌঁছাবেন, তখন তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবেন এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করবেন। ঈশ্বরের শপথ, যদি ঈশ্বর তাদের একজনকেও আপনার মাধ্যমে ইসলামের পথে পরিচালিত করেন, তবে তা আপনার জন্য এক পাল লাল উট অপেক্ষা উত্তম হবে।"

প্রচার সংক্রান্ত কার্যকলাপ ছিল পয়গম্বরের জীবনের এমন একটি বিশিষ্ট অংশ যে, কেউ যদি তাঁর সমগ্র সংগ্রামকে একটি শিরোনামে রাখতে চান, তাহলে এটি অবশ্যই উপযুক্ত শিরোনাম হবে। তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে মনোনিবেশ করেননি, যেমন নেতারা সাধারণত করেন, বরং তিনি তাঁর সমস্ত সময় এবং শক্তি ঈশ্বরের বাণী প্রচারে নিয়োজিত করেছিলেন। প্রথমে মনে হতে পারে যে তাঁর এই একমুখী মনোভাব অযৌক্তিক ছিল। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টার ফলাফল থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিকে পরবর্তী জগতের দিকে স্থির করি, যেভাবে পয়গম্বর করেছিলেন, তাহলে জাগতিক লক্ষ্যগুলি আপনা-আপনিই অর্জিত হয়।

ঘ. ধৈর্য এবং অবিচলতা

এই অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখিত 'পয়গম্বরের লক্ষ্য'-এর তৃতীয় পর্বটি ছিল ঐশ্বরিক পথে আসা অসুবিধা সমূহের মোকাবিলায় অবিচল সহনশীলতা।

ধৈর্যের আরবি শব্দ হল 'সবর'। একই ধাতু থেকে উদ্ভূত শব্দগুলির মধ্যে একটি হল 'সাব্বারাহ; যার অর্থ শক্ত, অনুর্বর ভূমি, যা কোনো বীজ গ্রহণ করে না। একইভাবে একজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি সংযম (সবর)-এ সমৃদ্ধ, তিনি ঘটনাগুলিকে তাঁর উপর প্রভাব ফেলতে দেন না, তিনি কখনও মনোবল হারান না, বরং অপ্রতিরোধ্য সংকল্পের সঙ্গে তাঁর লক্ষ্য অনুসরণ করেন। সাহসী লোকদের 'সা-বির' ও বলা হয়, কারণ তারা চাপের কাছে নত হন না; পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন, তারা দৃঢ় এবং আপসহীন থাকেন।

ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এমন যে কোনো মানুষের সবচেয়ে মহৎ গুণ হল ধৈর্য। ইসলাম যখন আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে যায়, তখন এটি আমাদের মধ্যে একটি অবিনশ্বর প্রাণশক্তি সঞ্চার করে; তা আমাদেরকে "ঈশ্বরের পথে যা ঘটে, তার জন্য কখনোই মনোবল না হারাতে শেখায়" — কখনোই শোচনীয়ভাবে দুর্বল বা নিরাশ হতে দেয় না।"(-৮১) ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা রাখা, এবং যিনি ঈশ্বরের উপর ভরসা করেন তিনি মহান শক্তির অধিকারী হন; এমন কিছু নেই যা তাঁর সংকল্পকে দুর্বল করতে পারে।

ধৈর্য ব্যতীত, ঈশ্বরের বাণী প্রচারকারীরা বেশিদিন তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন না। যখন তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু করেন, তখন তাঁরা দেখতে পান যে তাঁরা অপরিচিতদের ভিড়ে একা। তাঁরা ঈশ্বরের আদেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ, অথচ অন্যরা তাদের নিজেদের পছন্দ মতো কাজ করার জন্য স্বাধীন। তাঁরা যা কিছু করেন তা পরজগতে সফলতা ও পরিত্রাণের জন্য প্রস্তুতি হিসাবে, অথচ পার্থিব সাফল্যের সমস্ত পথ তাঁদের প্রতিপক্ষের সামনে উন্মুক্ত। তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত হয়, অপরদিকে অন্যদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দক্ষতা তাদের মানুষের দৃষ্টিতে শক্তিশালী করে। তাঁরা কঠোর নৈতিক মান বজায় রাখেন, অথচ অন্যদের ক্রিয়াকলাপ সমস্ত বিধিনিষেধমুক্ত। ঈশ্বরের বাণী প্রচারকারীরা সহজেই এই ধরণের বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হতে পারতেন। এমনকি তাঁরা উন্মত্ত জনতার অনুসরণ করতে প্রলুব্ধ হয়ে তাঁদের নিজেদের কাজ ছেড়ে দিতে পারতেন। ঈশ্বরের বাণী প্রচারকারীদের যদি মনে হয়, তাঁরা যা করছেন তা এতখানি অকার্যকরী, তাহলে

তাঁরা এতটা ঝামেলা নেবেন কেন? যখন তাঁদের কথা অন্যদের উপর কোনো প্রভাব ফেলছে বলে তাঁদের মনে হয় না; তখনই সংযম বা ধৈর্য (সবর) তাঁদের উদ্ধার করে, তাঁদের হাল ছেড়ে দেওয়া থেকে বিরত রাখে। "অতএব, ধৈর্য ধারণ করো। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে না তারা যেন তোমাকে বিচলিত না করে।"(-৮২)

কখনও কখনও সংযম (সবর) অন্য রূপ নেয়, এবং তা হল অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া নিপীড়নের সময় অটলতা এবং সহনশীলতা। এটাই ছিল ঈশ্বরের সমস্ত পয়গম্বরদের গৃহীত পদ্ধতি। তাঁরা তাঁদের প্রতিপক্ষকে বলতেন:

"....আমরা ধৈর্য ধরে তোমাদের অত্যাচার সহ্য করব। সমস্ত বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের উপরেই ভরসা রাখুক।"(-৮৩)

দুর্দশা, যা ঈশ্বরের বাণীর প্রচারকদের বেষ্টন করে থাকে, আসলে তাদের লক্ষ্য পূরণে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁরা যাদেরকে সম্বোধন করেন, তারা তাঁদের কথায় কিছু প্রতিক্রিয়া দেখাবেই, এবং কখনও কখনও এটি হিংসাত্মক এবং দুর্দম হয়ে যায়। যদি তাঁরা তাঁদের প্রতি অন্যদের আচরণের জন্য শোক প্রকাশ করা শুরু করেন, তবে তাদের সত্যিকারের বিশ্বাসে নিয়ে আসার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টার গুরুত্ব হ্রাস পায়। যাঁরা সত্যিই ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছেন, তাঁরা যা করছেন তা অন্যদের প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হবে না। ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই, তা সত্যিই আমাদের আন্তরিকতার পরীক্ষা। আমরা যদি আমাদের আন্তরিকতা প্রমাণ না করি, আমরা আশা করতে পারি না যে আমাদের কথা অন্যদের উপর প্রভাব ফেলবে।

শত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি হলে মানুষ সাধারণত তাদের নিজস্ব প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যখন তারা অন্যদের দ্বারা কোনো অপ্রীতিকর আচরণের মুখোমুখি হয়, মানুষ সাধারণত প্রতিশোধ নিতে অভ্যস্ত হয়। অন্যদিকে, 'সবর'-এর অর্থ শত্রুদের দ্বারা যা কিছু অনর্থ সৃষ্টি হয়, তা ধৈর্য সহকারে সহ্য করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি নির্দিষ্ট দেশের মুসলমানরা তাদের অমুসলমান দেশবাসীদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়, তাহলে 'সবর'-এর উপায় হল সমান অধিকার দাবি করার প্রক্রিয়া শুরু করা নয়,

বরং অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য নিজেকে অতিরিক্ত সচেষ্ট করা। পক্ষপাত তখনই বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে যখন সমান যোগ্যতার লোকেরা একটি কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করে। যদি প্রতিযোগীদের মধ্যে একজন স্পষ্টভাবে দক্ষতায় অন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে যায়, তাহলে কোনো পক্ষপাত তাকে তার প্রাপ্য স্থান থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

পয়গম্বরের সময় মক্কায় যখন মুসলমানরা অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিল; এইভাবে তাদের নিজেদের অবস্থান সুসংহত করেছিল। মক্কার লোকেরা পয়গম্বরের অনুসারীদের জন্য তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব করে তুলেছিল। মুসলমানরা যা করেছিল তা হল প্রতিবেশী দেশে চলে যাওয়া এবং সেখানে তাদের জীবিকা নির্বাহ করা। তারা তাদের লেনদেনে এতই পরিশ্রমী এবং সৎ ছিল যে আবিসিনিয়ার রাজা নাজাশি ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি কেউ কোনো মুসলমানকে বিরক্ত করে, তবে তাকে আট দিরহাম ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অন্যদের দ্বারা নিপীড়নের মুখে তাদের ধৈর্য্য বিবেচনা করে, ঈশ্বর মুসলমানদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিলেন।

ধৈর্য একটি নেতিবাচক গুণ বলে মনে হতে পারে; কিন্তু, এর ফলাফলের দিক থেকে বিচার করলে, এটি একটি অত্যন্ত ইতিবাচক ব্যাপার। একবার সবর-এর মূল্য বুঝতে পারলে, আমরা আমাদের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি না; বরং আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাই এবং এমন কিছু কার্যক্রম শুরু করি, যা আমাদের চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। যখন আমাদের সঙ্গে কোনো অন্যায় সংঘটিত হয়, তখন আমাদের আবেগ ও অনুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে। আমরা যদি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের কী করা উচিত তা আমরা যুক্তিযুক্তভাবে বিবেচনা করতে সক্ষম নাও হতে পারি; বরং, আমরা সেই সময়ে আমাদের আবেগের ভিত্তিতে কাজ করে ফেলি। অন্যদিকে, ধৈর্য আমাদের শান্তভাবে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে সমস্ত সম্ভাবনা বিচার করে দেখার সুযোগ দেয়, এবং আমরা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হই তার প্রকৃত রূপ অনুধাবন করতে সহায়তা করে। আমরা তখন একটি সঠিক এবং দৃঢ় নীতি অনুসরণ করার অবস্থানে থাকি। অন্য পক্ষকে শায়েস্তা করার লক্ষ্যে অধৈর্যতা তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে চাপ সৃষ্টি করে।

কিন্তু ধৈর্য আমাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করার আগে ঈশ্বরের প্রণীত প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মের জন্য অপেক্ষা করতে নির্দেশ করে।

আমরা যখন অধৈর্যতার সঙ্গে আমাদের শত্রুর মোকাবিলা করি, তখন আমরা অতিমাত্রায় তুচ্ছ উদ্দেশ্য এবং নিম্নমানের আবেগ দ্বারা প্ররোচিত হই। এর ফলে আমরা বিচারে ভুলত্রুটি করি, যা আমাদের অবস্থানকে দুর্বল করে তোলে। যখন কেউ ধৈর্যশীল হয়, তখন তার মধ্যে একটি ঐশ্বরিক শক্তি, বুদ্ধি জন্ম নেয়। শক্তির সবচেয়ে অসাধারণ উৎস আমাদের বুদ্ধি। সাময়িক বাধা এবং বিপদ অতিক্রম করে এটি সামনের দিকে তাকাতে এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে। বুদ্ধিমত্তা একজন মানুষকে নেতিবাচক আবেগ থেকে মুক্ত করে এবং পরিস্থিতির গভীরে প্রবেশ করে চিন্তা করতে সক্ষম করে। তখন আমরা গোপন কিছু আবিষ্কার করি, যা প্রতিদ্বন্দ্বীকে সব দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে আমাদের সক্ষম করে। তিনি শিকারির জালে ধরা বধ্যপ্রাণীর মতো হয়ে ওঠেন: নড়াচড়া তাঁকে কেবল আরও বেশি জালে আটক করে এবং তাঁর উপর শিকারির দখলকে সহজ করে।

মক্কা থেকে মদিনায় গমন পয়গম্বরের ধৈর্যের একটি উদাহরণ। কুরাইশরা যখন পয়গম্বরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন তাঁর সামনে দুটি পথ ছিল: হয় আত্মরক্ষার জন্য তাঁর তরবারি তুলে নেওয়া, অথবা নিরাপদ আবাসের জন্য মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়া। পয়গম্বর দ্বিতীয় কর্মপন্থা অবলম্বন করেন। তিনি শান্তভাবে পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেন এবং মদিনায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, যেখানে তিনি একই কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন, শুধুমাত্র অন্য জায়গায়। আয়েশা (রা.) বলেন, চলে যাওয়ার আগে পয়গম্বর প্রতিদিন তাঁদের বাড়িতে আসতেন। সেখানে তিনি আয়েশার পিতা আবু বকরের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। ছয় মাস ধরে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে প্রস্তুতি নেওয়া হতো।

সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চলল এবং অবশেষে পয়গম্বর তাঁর সঙ্গে একজন নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শককে নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আধুনিক যুগের একজন উদ্যোগী মুসলিম রাজনৈতিক নেতার দৃষ্টিকোণ থেকে, এই দেশত্যাগকে প্রায় পলায়নের সমতুলা দৃষ্টিতে দেখা হবে। এই পরিস্থিতিতে তিনি যা চাইবেন তা হল মৃত্যুর লড়াই; তিনি নিজেকে শহীদ করার চেয়ে আর কিছু চাইবেন না। কিন্তু কেউ যদি পয়গম্বরের দেশত্যাগের ফলাফলের দিকে

তাকায়, তাহলে দেখা যাবে যে এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সন্ধিক্ষণ।

ধৈর্য আমাদের হঠকারী পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে সক্ষম করে এবং ঘটনাবলীকে তাদের স্বাভাবিক গতিতে চলতে দেয়। মানব প্রকৃতি একটি অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা যা সর্বদা মানব জীবনের গতিপথে একটি গভীর প্রভাব ফেলে। যে ব্যক্তি নিঃশব্দে গালাগালি সহ্য করে, যে ব্যক্তি চরম প্ররোচনার মধ্যেও প্রতিক্রিয়া দিতে অস্বীকার করে, তার জন্য মানব মনের গভীরে সবসময়ই নরম জায়গা থাকে। মানুষের বিবেক স্বাভাবিকভাবেই অত্যাচারীর পরিবর্তে নিপীড়িতদের পক্ষ নেয়। প্রকৃতির জগতে তাদের জন্য সেই মহান সুযোগগুলি উন্মুক্ত হয় মানব জগতে যেগুলি তাদের অস্বীকার করা হয়। তারপর, যখন তারা নিপীড়নের মুখে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়, তারা নিজেদের সঠিক বলে প্রমাণ করে। পয়গম্বরীয় কর্মকাণ্ডের সপ্তম বছরে তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর যে বয়কট আরোপ করা হয়েছিল তা এমন একটি উদাহরণ মাত্র। এই বয়কটের ফলে আবু লাহাব ব্যতীত সমগ্র বানু হাশিম গোষ্ঠীকে শি'আবে আবি তালিব নামক পাহাড়ি গিরিপথে অবরুদ্ধ করা হয়। এই সমস্ত মানুষ যেভাবে নীরবে সমস্ত নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করেছিল তা অন্যদের বিবেকের উপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য এবং তাই হয়েছিল। তিন বছরের মধ্যে আবুল বাখতারি, হিশাম ইবন 'আমর, জুবায়ের ইবন উমাইয়া, জাম'আ ইবন আল- আসওয়াদ এবং মুত'আম ইবন 'আদির মতো লোকেরা যে চুক্তির দ্বারা বানু হাশিমের উপর এই বয়কট আরোপ করা হয়েছিল, সেই চুক্তির মান্যতাকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ করে শত্রুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। চুক্তি ভেঙে যায় এবং বানু হাশিম গোষ্ঠী তাদের ভয়ানক দুর্দশা থেকে উদ্ধার পায়।

ধৈর্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এটি মানুষকে ঐশ্বরিক সাহায্যের জন্য যোগ্য করে তোলে। কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে ধৈর্যশীল থাকার মানে হলো, বিশ্বজগতের পালনকর্তার হাতে নিজের বিষয়গুলিকে অর্পণ করা। এটা অকল্পনীয় যে, যারা সমস্ত ন্যায়সঙ্গত কারণের জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর ভরসা করে, ঈশ্বর কোনো সময় তাদের পরিত্যাগ করবেন।

এই ঐশ্বরিক সাহায্য বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। মানুষের মন সেগুলো বুঝতে বা অনুধাবন করতে পারে না। ঐশী সাহায্য এমন কিছু রূপ গ্রহণ

করে, যার উল্লেখ কুরআনে করা হয়েছে। মুসলমানরা যখন যুদ্ধের ময়দানে অমুসলিমদের মোকাবিলা করে, উদাহরণস্বরূপ, ঐশ্বরিক সাহায্য ঐশী অনুগ্রহরূপে তাদের স্বল্পতর সম্পদের পাশে দাঁড়ায়: বিশ্বাসীদের হৃদয়ে প্রশান্তি এবং আত্মবিশ্বাস প্রবেশ করে, আর তাদের প্রতিপক্ষের মনে ভীতির সঞ্চার করে।

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী এসেছিল। আমি তাদের বিরুদ্ধে একটি বায়ু এবং সৈন্যদের পাঠিয়েছিলাম, যা তোমরা দেখতে পাওনি। তোমরা যা করছ, সবই ঈশ্বর দেখছেন।"(-৮৪)

এই আয়াতটি খন্দকের যুদ্ধ (৬২৭ খ্রীস্টাব্দ) সম্পর্কে আলোকপাত করে। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের সমর্থনে দুটি জিনিস পাঠান — বায়ু এবং ফেরেশতাদের একটি বাহিনী। বাতাস সম্পর্কে অসাধারণ কিছুই নেই। এমন কোথাও নেই যে তা বয় না। কিন্তু একটি বিশেষ সময়ে, এবং একটি বিশেষ স্থানে, বিশ্বাসীদের সহায়তা কল্পে এই বাতাসকে দ্রুত বইবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এটাই দেখার যে ঈশ্বর যখন কাউকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেন, তিনি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনাকে এমন তীব্র আকার দেন, যা তার সাফল্যকে নিশ্চিত করে।

ফেরেশতাদের বাহিনী এসে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের তরবারি চালায়নি। তারা সামরিক সহায়তার পরিবর্তে মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা দান করেছিল। তারা যা করেছে, অন্যান্য বেশ কয়েকটি ঘটনার মতো তা ছিল "বিশ্বাসীদের সাহস দেওয়া এবং অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করা।"(-৮৫) তারা শত্রুদের একটি 'ছোট দল' হিসাবে তুলে ধরেছিল, যেখানে তাদের শত্রুদের চোখে মুসলমানদের একটি 'বড়ো সেনাবাহিনী' হিসাবে দেখানো হয়েছিল।(-৮৬)

দ্বিতীয় খলিফা, 'উমরের শাসনকালে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রীস্টাব্দ), সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী ইরানের দ্বারপ্রান্ত, কাদসিয়ায় অবতরণ করে। সেখানে তাদের প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় থাকতে হয়েছিল, এবং তাদের খাবারের ব্যবস্থা ফুরিয়ে যেতে খুব বেশি সময় লাগেনি। তখন সা'দ কিছু লোককে কিছু গবাদি পশুর সন্ধান করার জন্য পাঠালেন, যা তারা খেতে পারে। তারা একজন ইরানির সঙ্গে দেখা করল। তারা তাকে

জিজ্ঞাসা করল, চারপাশে কোনো ছাগল বা গরু আছে কিনা। যদিও ইরানি নিজে একজন রাখাল ছিলেন, তবে তিনি আশেপাশে কোনো প্রাণী থাকার বিষয়ে কিছু জানেন না, এই কথা বলেছিলেন। মুসলমান সৈন্যদের উপস্থিতির কথা শুনে কাছের একটি ঘন জঙ্গলে তিনি তাঁর নিজের পশুগুলি লুকিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু তখন একটি ষাঁড় ডেকে উঠল: "রাখাল মিথ্যা বলছে। আমরা এখানে, এই ঝোপের মধ্যে আছি।" আওয়াজ শুনে মুসলমানরা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে, কয়েকটি জন্তুকে ধরে সা'দের সামনে নিয়ে যায়। যখন সেনাবাহিনীর বাকি সদস্যরা গল্পটি শুনেছিল তখন তারা খুব খুশি হয়েছিল। তারা এটিকে ঈশ্বরের সাহায্যের একটি চিহ্ন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিল।

কিন্তু, ইতিহাসবিদ ইবন আল তাকতাকি লিখেছেন, কারো এই ধারণা করা উচিত নয় যে ষাঁড়টি আসলে আরবিতে "আমরা এখানে" বলে ডেকেছিল। সে ষাঁড়ের মতোই ডেকেছিল, এবং তার আওয়াজ থেকে মুসলমানরা বুঝতে পেরেছিল যে ঝোপের মধ্যে গবাদিপশু লুকানো আছে।

৬. ঈশ্বরের উপর ভরসা করা

কুরআন নিম্নোক্ত কথায় ইসলামি পদ্ধতির সারাংশ তুলে ধরেছে:

"যদি তারা শান্তির দিকে ঝোঁকে, তবে তুমিও সেই দিকে ঝুঁকবে এবং ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখবে। তিনি শ্রবণকারী, সকল বিষয়ে জ্ঞাত। তারা যদি তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়, তাহলে ঈশ্বরই তোমার জন্য যথেষ্ট।"(-৮৭)

এটি প্রমাণ করে যে, প্রকৃত ইসলামি পদ্ধতি হল শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের লক্ষ্যগুলি অনুসরণ করা। এমনকি যখন ভয় থাকে যে আমাদের বিরোধীরা আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে, তখনও মুসলমানদের উচিত ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখা এবং শান্তি স্থাপনের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

এর অর্থ হ'ল আমাদের সেই কর্মক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টাকে মনোনিবেশ করা উচিত যেখানে–অন্যদের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই আমাদের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির জন্য, যেখানে কোনো সুযোগ নেই সেখানে প্রকৃতির শক্তিগুলিকে কাজ করতে দেওয়া উচিত। আমরা যদি

সেইসব ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টাকে সংহত করি যেখানে আমরা কার্যকরভাবে কাজ করতে সক্ষম, তাহলে যেখানে আমরা কিছুই করতে পারি না, সেখানে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করবেন। আমরা যদি আমাদের জন্য নির্ধারিত কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অন্য কোথাও কাজ করার চেষ্টা করি যেখানে আমাদের কোনো সুযোগ নেই, তাহলে এটা জানবেন, আমরা আমাদের নিজস্ব ক্ষেত্র ছেড়ে, ঈশ্বরের ক্ষেত্র থেকে কাজ করার চেষ্টা করেছি। ঈশ্বরের কাজের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করার অর্থ হলো তাঁর অসন্তুষ্টি ডেকে আনা; এটা আমাদের তাঁর সাহায্য পেতে সহায়তা করতে পারে না।

১০. মক্কায় পয়গম্বর

হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর জীবনের দুটি প্রধান সময়কাল রয়েছে: একটি মক্কার এবং অপরটি মদিনার। আক্ষরিক অর্থের ঊর্ধ্বে স্থানের নামগুলি অনেক সময়েই ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে, মক্কা ও মদিনা তার ব্যতিক্রম নয়।তারা আদতে দুটি স্থান নাম হলেও, এই শহর দুটি ক্রমে ইসলামি মুদ্রার দুটি পিঠের প্রতীক হয়ে উঠেছে— যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে, তার দুটি দিক। একদিকে মক্কা হল 'দাওয়াহ্ বা মানুষকে বিশ্বাসের প্রতি আহ্বানের প্রতীক, অন্যদিকে মদিনা হল বিপ্লবের প্রতীক। অন্যদিক থেকে বলতে গেলে মক্কা ছিল সেই জায়গা, যেখানে ইসলামের 'দাওয়াহ্ শক্তি' প্রথম সক্রিয় হয়েছিল, এবং মদিনা নামক শহরে এই শক্তিটি যথার্থ আধিপত্য অর্জন করেছিল।

মক্কা এবং মদিনা-পর্বের ইসলাম সম্পর্কে কুরআনে আমরা এই আয়াতটি পাই:

"মুহাম্মদ ঈশ্বরের দূত। তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর, কিন্তু নিজেরা পরস্পরের প্রতি দয়াশীল। ঈশ্বরের কৃপা এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় তারা ঈশ্বরের সামনে আনত হয়, এবং তাঁকে সিজদা (প্রণতি জ্ঞাপন) করে। তাদের মুখমণ্ডলে আছে সিজদার চিহ্ন। তোরাহ(তৌরত) এবং গসপেল(ইনজীল)-এ তাদের সম্পর্কে এই বর্ণনা রয়েছে: (তারা) সেই বীজের মতো, যা তার অঙ্কুর বের করে এবং তাকে শক্তিশালী করে, যাতে সেটি তার দণ্ডের উপর দৃঢ় এবং সবল হয়ে ওঠে এবং বীজ বপদকারীদের আনন্দ দেয়। তাদের মাধ্যমে ঈশ্বর অবিশ্বাসীদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি করেন। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কাজ করে, ঈশ্বর তাদের জন্য মার্জনা ও মহা-পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?"(-৮৮)

এই আয়াতটিতে তোরাহ-র যে উল্লেখ আছে, তাতে পয়গম্বরের সাথীদের (সাহাবীদের) ব্যক্তিগত গুণাবলীর বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। বাইবেলের যে উল্লেখ আছে তাতে সাথীদের একত্রিত হয়ে একটি দল হিসেবে কাজ করার গুনাবলী সংক্রান্ত কথা বলা হয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত গুণাবলী মক্কায় বিকশিত হয়েছিল, আর তাদের সামষ্টিক চরিত্রটি ফুটে উঠেছিল মদিনায়।

পয়গম্বরের জীবনীগুলিতে সাধারণত তাঁকে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন তিনি মহান জাদুকরী ক্ষমতার অধিকারী; যিনি রহস্যময় কোনো উপায়ে সমগ্র আরবকে তাঁর ডানার তলায় নিয়ে এসেছিলেন। বইগুলি পড়ে রূপকথার গল্প মনে হয়; এমনকি যে ঘটনার মধ্যে কোনো অলৌকিক বিষয়বস্তু নেই, তাতেও একটি কাল্পনিক অলৌকিকতা যোগ করা হয়েছে। যেমন, সুহায়ব ইবন সানান-এর মক্কা থেকে মদিনা যাত্রার বিষয়টিই ধরুন। যখন কয়েকজন কুরাইশ যুবক তাঁর পথ আটকায়, সুহায়ব তাঁদের কাছে অনুনয় করতে থাকেন, "আমি যদি আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাদের দিয়ে দিই, তাহলে কি তোমরা আমাকে যেতে দেবে?" তারা সম্মাত হয়; সুহায়বের কাছে কয়েক আউন্স রুপো ছিল। তিনি তাদের হাতে সবটুকু তুলে দিয়ে মদিনার পথে যাত্রা করেন। বায়হাকির একটি বক্তব্য অনুসারে সুহায়ব বলেন যে, যখন পয়গম্বর তাঁকে মদিনায় দেখেছিলেন, তিনি সুহায়বকে বলেছিলেন কুরাইশদের হাতে তাঁর রুপোটুকু তুলে দেওয়া তাঁর পক্ষে খুবই লাভজনক হয়েছে।

এতে স্বভাবতই সুহায়ব বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান, কারণ তাঁর আগে অন্য কেউ মদিনায় এসে পৌঁছাননি, যিনি হজরত মুহাম্মদ(স.)-কে এই ঘটনার কথা বলে থাকতে পারেন। "আপনাকে নিশ্চয় গ্যাব্রিয়েল(জিবরায়িল) এই ঘটনার কথা বলেছেন।", সুহায়ব মুহাম্মদ(স)-কে বললেন।

এই একই ঘটনা ইবন মারদুইয়া এবং ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে, সুহায়ব কাহিনীটি এইভাবে বর্ণনা করেন:

আমি মদিনা পৌঁছানো পর্যন্ত চলতে থাকলাম। কুরাইশ যুবকদেরকে আমার সম্পত্তি দিয়ে দেওয়ার কথা যখন পয়গম্বর জানতে পারলেন, তিনি বললেন, "সুহায়ব লাভবান হয়েছে। সুহায়ব লাভবান হয়েছে।"-৮৯

হজরত মুহাম্মদ(স.) খুবই সাধারণ জীবনযাপন করতেন, তার ফলে

অন্যদের পক্ষে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাও সহজ ছিল। তিনি অন্যদের মতোই একজন মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবন অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। আল-বুখারি অনুসারে, তিনিও অন্যদের মতোই রাস্তায় হোঁচটও খেতেন। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ যে ঐশ্বরিক বাণীর গ্রহীতারূপে তাঁকে প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করতে চায়নি, তার মূল কারণ তিনি যে কোনো সাধারণ মানুষের মতোই জীবন যাপন করতেন:

"আপনি শহরে ব্যবসা করেন। আপনিও আমাদের মতো রুটিরুজির সন্ধান করেন।"–৯০

একথা সত্য যে, পয়গম্বরের জীবনের মাহাত্ম্য অনবদ্য অলৌকিক কর্মকাণ্ডের নায়ক হওয়ার মধ্যে নেই, বরং একটি মানবজীবনের ঘটনা হওয়ার মধ্যে রয়েছে। পয়গম্বর ছিলেন ঈশ্বরের অত্যন্ত নম্র এবং মানবিক সেবক। ঈশ্বর তাঁকে তাঁর বাণীপ্রচারের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন এবং প্রতিটি সংকটকালে ঈশ্বরই তাঁকে সাহায্য করতেন। সেই অর্থে তাঁর সাফল্য ছিল অলৌকিক, কিন্তু পয়গম্বর নিজে কোনোভাবেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। বরং, কুরআন পাঠ করলে তাঁর জীবনের মানবীয় দিকটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ক. পয়গম্বরের জনপ্রচারকার্যের সূচনা

চল্লিশ বছর বয়সে যখন হজরত মুহাম্মদ(স.) তাঁর প্রথম ঐশী বাণীটি লাভ করেছিলেন, তখন তাঁর প্রতিক্রিয়া অন্য যে কোনো সাধারণ মানুষের মতোই হয়েছিল। সে সময় তিনি হিরা' গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। বিস্ময়ে প্রস্তরীভূত প্রায় মুহাম্মদ(স.) কোনোমতে বাড়ি ফিরলেন, যেখানে তাঁর স্ত্রী খাদিজা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নিরপেক্ষ বিচারক হিসেবে তিনিই বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিস্থিতিটি বিবেচনা করার অবস্থায় ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, পয়গম্বরের অভিজ্ঞতা কোনো দুঃস্বপ্নজাত নয়, এটি যথার্থই ঈশ্বর দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার চিহ্ন বহন করে। "এটা হতে পারে না", তিনি বললেন, "ঈশ্বর অবশ্যই আপনাকে কখনো অপমান করবেন না। আপনি আপনার আত্মীয়দের প্রতি সদয়; আপনি সবসময় দুর্বলদের দিকে সাহায্যের

হাত বাড়িয়ে দেন; যারা কর্মহীন তাদের আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেন, আপনি অতিথিদের সম্মান করেন। মানুষ যখন সমস্যায় পড়ে, আপনি তাদের সহায়তা করেন।”–৯১

গভীর প্রথাগত বিশ্বাস ও রীতিনীতির সঙ্গে সংযুক্ত একটি সমাজে নতুন বার্তা প্রচার করার কাজটি করার জন্য পয়গম্বর অত্যন্ত যথাযথ পন্থা অবলম্বন করেন।তিনি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ক্রম অনুসরণ করে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হলেন। প্রথমে তাঁকে গোপনে কাজ করতে হয়েছে। ঐতিহাসিক ইবন কাসির পয়গম্বরের কর্মকাণ্ডের শুরুতে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন:

পয়গম্বর এবং খাদিজা যখন প্রার্থনা করাছিলেন, তখন আলি, আবু তালিবের ছেলে এবং পয়গম্বরের খুড়তুতো ভাই, তাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কী করছিলেন। পয়গম্বর তাঁকে বলেছিলেন যে এটি ঈশ্বরের ধর্ম, যে পথ ঈশ্বর নিজেই তৈরি করেছেন। মানুষকে এই পথে ডাকার জন্যই তিনি তাঁর পয়গম্বরদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। “এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করো”, পয়গম্বর বললেন, “তাঁর কোনো অংশীদার নেই। একমাত্র তাঁরই উপাসনা করো। লাত ও উজ্জা মূর্তি পরিত্যাগ করো।” “আমি আজকের আগে এই ধরণের কোনো কথা শুনিনি”, আলি উত্তর দিলেন। ‘আমি আমার পিতা, আবু তালিবের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা না বলা পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারব না।” কিন্তু পয়গম্বর চাননি যে তাঁর গোপনীয়তা তখনই প্রকাশ পাক। “আলি,” তিনি বললেন, “যাদি তুমি মুসলমান হতে প্রস্তুত না হও, তাহলে বিষয়টিকে নিজের কাছে রেখো। আলি এক রাতের জন্য অপেক্ষা করলেন, তারপর ঈশ্বর তাঁর হৃদয়কে ইসলামের প্রতি নমনীয় করে দিলেন। অতি প্রত্যুষে তিনি পয়গম্বরের কাছে ফিরে গেলেন। “গতকাল আপনি আমাকে কী বলছিলেন?” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। “সাক্ষ্য দিন যে, ঈশ্বর ব্যতীত উপাসনা পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। লাভ ও উজ্জাকে পরিত্যাগ করুন এবং যারা ঈশ্বরের সমকক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তাদের সকলকে অস্বীকার করুন।” আলি এই কথা বলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর আবু তালিবের ভয়ে তিনি গোপনে

পয়গম্বরকে দেখতে আসতেন। আলি তাঁর ইসলামকে গোপন রেখেছিলেন; তিনি এ বিষয়ে কাউকে জানাননি।–৯২

এমনকি পরবর্তীতে যখন আ'স ও খাজরাজ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রথম মুসলমানরা মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তাঁরাও এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক তাবরানির মতে, "তারা তাদের লোকদের কাছে ফিরে যায় এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য তাদেরকে গোপনে আমন্ত্রণ জানায়।"

পয়গম্বর তাঁর সমগ্র জন প্রচারকার্যকাল জুড়ে খুব সতর্ক ছিলেন। তিনি প্রয়োজনীয় সংগতির অধিকারী হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতেন না। পয়গম্বরের স্ত্রী এবং আবু বকরের কন্যা, আয়েশা বলেন কীভাবে, যখন পয়গম্বর তাঁর চারপাশে ৩৮ জন অনুগামীকে একত্রিত করেছিলেন, তখন আবু বকর তাঁকে প্রকাশ্যে তাঁর উপদেশ প্রচার করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আবু বকরের অভিমত ছিল যে, পয়গম্বর ও তাঁর সঙ্গীদের এবার সামনে গিয়ে খোলাখুলি ইসলাম প্রচার করা উচিত। কিন্তু পয়গম্বর তাঁকে বললেন: "না, আবু বকর, আমরা সংখ্যায় খুব কম।" একই ঘটনা ঘটেছিল পয়গম্বরের প্রচারকার্যের ষষ্ঠ বছরে, যখন 'উমর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পয়গম্বরের কাছে প্রতিবাদ করেছিলেন: "আমরা কেন আমাদের ইসলামকে গোপন রাখব, যখন আমরা সঠিক? এবং কেন অন্যদের তাদের বিশ্বাস প্রচার করতে দেওয়া হবে, যখন তারা ভুল?" পয়গম্বর 'উমরকে একই উত্তর দিয়েছিলেন, যা তিনি বেশ কয়েক বছর আগে আবু বকরকে দিয়েছিলেন: "আমরা সংখ্যায় খুব কম, 'উমর।" যতদিন পয়গম্বর মক্কায় ছিলেন ততদিন তিনি এই সতর্ক ভঙ্গি অব্যাহত রেখেছেন। মদিনায় যাওয়ার পরেও এবং মুসলমানরা সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যখন সশস্ত্র কুরাইশরা ইসলাম ও মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য মদিনার দিকে অগ্রসর হয়, তখন কুরেইশদের মোকাবিলা করার জন্য মুসলমানদের অনুমতি দেওয়া হয়। মুসলমান এবং তাদের বিরোধীদের মধ্যে প্রথম যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিল বদর যুদ্ধ। "যে এই সময়ে সফল হবে", যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পয়গম্বর বলেছিলেন, "আগামী সময়ে সে-ই সফল হবে।" পয়গম্বরের মন্তব্যের মর্মার্থ ছিল এই যে, মুসলমানদের ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়ার সময় একমাত্র তখনই, যখন তারা ইসলামের জন্য একটি নতুন ভবিষ্যৎ তৈরি করতে সক্ষম।

যদি তাদের ক্রিয়াকলাপগুলিতে এই জাতীয় ফলাফলের সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাদের জন্য ধৈর্য ধরাই শ্রেয়।

পয়গম্বরের জীবনী থেকে একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট। যখন জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের কাজটি তাঁর উপর বর্তায়, তখন তিনি এই কাজের মাহাত্ম্য সম্পর্কে খুব সচেতন হয়েছিলেন; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটির জন্য তাঁর সম্পূর্ণ এবং একাগ্র মনোযোগের প্রয়োজন হবে। তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর পরিবার তাঁকে আর্থিকভাবে দেখাশোনা করবে যাতে জীবিকাসন্ধানের সংগ্রাম থেকে মুক্ত হয়ে তিনি তাঁর প্রচারের কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারেন।

'আবদ আল-মুত্তালিবের পুরো পরিবারকে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে ডাকলেন। তখন সেই পরিবারের প্রায় ত্রিশজন সদস্য ছিল। পয়গম্বর তাঁদের বললেন এখন তাঁর জীবনে আসল উদ্দেশ্য কী? তিনি তাঁদের সমর্থন চেয়েছিলেন, যাতে তিনি নিশ্চিন্তে তাঁর পয়গম্বরীয় দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আয়েশা(রা.)-এর ভিত্তিতে ইমাম আহমদ ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

"বানু মুত্তালিব", পয়গম্বর বললেন, "আমি আপনাদের কাছে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির কাছে প্রেরিত হয়েছি। কে আমার কাছে আনুগত্যের শপথ করবে এবং আমার ভাই ও সঙ্গী হবে? কে আমার ঋণ এবং আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে? আমার পক্ষ থেকে কে আমার পারিবারিক বিষয় দেখাশোনা করবে? তিনি আমার সঙ্গে স্বর্গে থাকবেন।" কেউ একজন বলে উঠল: "মুহাম্মদ, আপনি একটি সমুদ্র স্বরূপ। কে এগিয়ে এসে এমন দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে?"-৯৩

পয়গম্বরের নিজের পরিবার তাঁর দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিল না। 'আব্বাস ইবন 'আব্দ আল-মুত্তালিব, পয়গম্বরের কাকা, আর্থিকভাবে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের দায়িত্ব নেওয়ার মতো অবস্থানে ছিলেন। তবুও তিনি নীরব ছিলেন, এই ভয়ে যে, এই দায়িত্ব তাঁর সম্পদ বিনষ্ট করবে। ঈশ্বর তাঁর পয়গম্বরকে সাহায্য করেছিলেন, প্রথমে পয়গম্বরের স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের মাধ্যমে এবং পরে আবু বকরের মাধ্যমে, যাঁর সম্পদ বছরের পর বছর ধরে মদিনায় হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর কাজে এসেছিল।

পয়গম্বর অন্যদের কাছে বিশ্বাসের কথা জানাতে তাঁর প্রচেষ্টায় বালকসুলভ উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন। ‘আবদুল্লাহ ইবন আল-’আব্বাসের সূত্রে ঐতিহাসিক ইবন জারির বলেছেন যে, কুরেইশদের অভিজাত ব্যক্তিরা একদিন কা’বাহ্-র চারপাশে জড়ো হয়েছিলেন। তাঁরা পয়গম্বরকে ডাকলেন। তাঁরা ইসলামের প্রতি কিছুটা ঝোঁক অনুভব করছেন, এই ভেবে মুহাম্মদ(স.) দ্রুত সেখানে এলেন। তিনি সবসময় তাঁর মানুষদের ইসলামের নির্দেশিকা গ্রহণের বিষয়ে আগ্রহী থাকতেন। তাঁদের পতনের চিন্তা তাঁকে কষ্ট দিত। তবে, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে ইসলাম গ্রহণ নয়, তাঁরা একটা বিবাদ শুরু করতে চান। পয়গম্বর তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন, অতঃপর নিরাশ হয়ে চলে গেলেন। ইবন হিশাম ঘটনাটি তুলে ধরেছেন:

পয়গম্বর দুঃখিত ও হতাশ হয়ে তাঁর বাড়িতে ফিরে আসেন, কারণ তাঁর লোকেরা যখন তাকে ডেকেছিল, তিনি তাদের প্রতি যে আশা রেখেছিলেন, তা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। তিনি দেখেছেন মানুষ তাঁর বার্তা গ্রহণ করা থেকে তখনও কত দূরে।-৯৪

পয়গম্বরের কাকা আবু তালিব যখন মৃত্যু শয্যায় , তখন লোকেরা তাঁর কাছে আসে এবং মৃত্যুর আগে তাঁর ভাইপো এবং তাদের মধ্যে বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করতে বলে। “আমাদের পক্ষ থেকে তার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নিন এবং তাকে আমাদের কাছে একটি শপথ করতে বলুন, যাতে তার সঙ্গে আমাদের এবং আমাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না থাকে”, তারা বলল। আবু তালিব তাঁর ভাইপোকে ডেকে বললেন, তিনি লোকদের কাছে কী চান? পয়গম্বর উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি শুধু চেয়েছিলেন তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন যে, ঈশ্বর ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কেউ নেই, এবং তাঁরা উপাসনার অন্যান্য সমস্ত বস্তু ত্যাগ করবেন। তাঁর গোষ্ঠীর লোকেরা এটা মানতে রাজি ছিল না। সবাই চলে গেলে আবু তালিব তাঁর ভাইপোকে বললেন: “তুমি জানো, আমি মনে করি না যে তুমি তাদের কাছে যা চেয়েছিলে সেটা খুব কঠিন কিছু ছিল।” কাকার কথা শুনে পয়গম্বরের আশা বেড়ে গেল, যে অন্তত তিনি হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবেন। “কাকা”, তিনি বললেন, “তাহলে আপনি কেন ঈশ্বরের একত্বতার সাক্ষ্য দিচ্ছেন না, যাতে আমি বিচারের দিন আপনার জন্য সুপারিশ করতে

পারি?"(-৯৫) পয়গম্বর খুবই হতাশ হয়েছিলেন যে তাঁর কাকা কখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি।

পয়গম্বর সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কাজের জন্য নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁর সমস্ত মানসিক এবং শারীরিক শক্তির প্রবাহ তাতেই নিয়োজিত ছিল। শুধু তাঁর সময়ই নয়, তাঁর সম্পদও চলে যায় ইসলামি উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁর প্রচারকার্য শুরুর আগে, বিত্তবান খাদিজার সঙ্গে বিবাহের কারণে পয়গম্বর বেশ ধনী হয়েছিলেন। মক্কা পর্বের শুরুতে কুরেইশরা 'উতবাহ্ ইবন রাবি'য়াহকে পয়গম্বরের সঙ্গে কথা বলার জন্য পাঠায়। ইবন কাসির যেমন ব্যাখ্যা করেন, তিনি শীঘ্রই পয়গম্বরের কথা মেনে নেন। (এই ঘটনাটি তার আত্মীয়রা পয়গম্বরের সম্পদের কারণে ঘটেছে বলে ব্যাখ্যা করেছিল):

এরপর থেকে 'উতবাহ বাড়িতেই থাকতেন এবং কারো সঙ্গে দেখা করতে বাইরে বের হতেন না। "কুরাইশ সাথীরা", আবু জাহল বললেন, "আমার মনে হচ্ছে 'উতবাহ্ মুহাম্মদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। মুহাম্মদ তাঁকে যে খাবার দিয়েছিলেন, তা তিনি অবশ্যই গ্রহণ করেছেন। এটি সেই কারণে হয়ে থাকতে পারে। চলুন, তাঁকে দেখতে যাই।" তাঁরা 'উতবাহ-র কাছে গেলেন। 'উতবাহ", আবু জাহল বললেন, "আমরা আপনাকে দেখতে এসেছি কারণ আমরা নিশ্চিত যে আপনি মুহাম্মদ এবং তাঁর ধর্মকে পছন্দ করেছেন। দেখুন, আপনি চাইলে আমরা যথেষ্ট অর্থ জমা করতে পারি যাতে আপনাকে খাবারের জন্য তাঁর কাছে যেতে না হয়।" 'উতবাহ্ রেগে গেলেন এবং শপথ করলেন যে তিনি আর কখনো মুহাম্মদ(স)-এর সঙ্গে কথা বলবেন না।-৯৬

অনুরূপভাবে, ওয়ালিদ ইবন মুগিরাহ একবার পয়গম্বরকে দেখতে আসেন। পয়গম্বর যখন তাঁকে কুরআনের কিছু আয়াত শোনালেন, ওয়ালিদ ঈশ্বরের গ্রন্থের নমুনা দেখে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। আবু জাহল যখন এই কথা শুনলেন, তিনি ওয়ালিদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন যে, লোকেরা তাঁর জন্য কিছু তহবিল সংগ্রহ করবে, কারণ তাঁর স্পষ্টতই কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল, এবং নিশ্চিতভাবে সেই জন্যই তিনি মুহাম্মদের কাছে গিয়েছিলেন। পয়গম্বর যখন তাঁর প্রচারকার্য শুরু করেন তখন তিনি আর্থিকভাবে খুবই সচ্ছল ছিলেন। কিন্তু তেরো বছর পরে যখন

তিনি মদিনায় চলে যান, তখনকার ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, এবং যাত্রার জন্য তাঁকে আবু বকরের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করতে হয়েছিল।

খ. পয়গম্বরের আহ্বান

যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, ইসলামি দাওয়াত আদতে কিছু নির্দিষ্ট এবং পুনরাবৃত্তিমূলক উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা, ঈশ্বরের একত্ববাদ, মৃত্যুর পরের জীবনের গুরুত্ব এবং অনিবার্যতা, ঈশ্বরের দাস হিসাবে মানুষের অবস্থান অনুধাবন করা এবং পয়গম্বরবাদের আদলে জীবনযাপন করার প্রয়োজনীয়তা — এই বিষয়গুলির উপর বারবার জোর দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়গুলি যখন ঈশ্বরের বাণী প্রচারকের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, তখন তাতে প্রচারকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বর্ণময় প্রভাব পড়ে। তাঁরা মূলত শাশ্বত বিষয়গুলির সঙ্গে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের একটি উপাদান যুক্ত করেন। এই সংযোজনের অর্থই হল ইসলামের বাণী, নির্দিষ্ট পাঠের পুনরাবৃত্তি নয়, অপ্রতিরোধ্য প্রাণশক্তি এবং স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থগতভাবে অবশ্যই এক, কিন্তু তা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। এটির বিষয়গুলি নির্দিষ্ট হলেও, তাদের একটি সম্পূর্ণ তালিকার সংকলন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঈশ্বরের বাণী প্রচারকের হৃদয় ঈশ্বরের ভয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর প্রবল ইচ্ছা তাঁর শ্রোতাদের সঠিক নির্দেশনার পথে নিয়ে আসা। তিনি জানেন যে, তিনি যদি ঈশ্বরের সেবকদের ঈশ্বরের কাছাকাছি আনতে পারেন, তাহলে ঈশ্বর তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। এই কারণগুলো তাঁকে তাঁর কাজে উৎসাহিত করে। এর ফলে তাঁর কথাগুলি, পুনরাবৃত্তিমূলক এবং একঘেয়ে তো হয়ই না, উপরন্তু একটি অনুপ্রেরণার হাওয়া তৈরি করে। বিষয়গতভাবে এক হওয়া সত্ত্বেও, তার বার্তা স্বরবৈচিত্রে বর্ণময় হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের বাণীর প্রচারক সর্বাগ্রে তাঁর অনুগামীদের কথাই চিন্তা করেন। যাই হোক না কেন, তিনি চান যে তারা সঠিক দিকনির্দেশনা পাক। এর মানে হল এই যে, তিনি প্রতিটি ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে নির্দেশনা দেন, এবং তাঁর কথাগুলিকে এমন ছাঁচে ফেলেন, যা তাদের কাছে সহজে বোধগম্য হয়।

ইসলামের পয়গম্বরের মতো এত নিখুঁতভাবে এই আদর্শ আর কেউ

অনুসরণ করেননি। রাত দিন তিনি ঈশ্বরের বাণী প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রচার করার পদ্ধতি একঘেঁয়ে পুনরাবৃত্তিমূলক নির্দিষ্ট প্রচার প্রক্রিয়া থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র ছিল। তিনি তাঁর বার্তা উপস্থাপনে তাঁর সভায় উপস্থিত অনুগামীদের প্রকৃতি বিবেচনা করতেন। একবার, মক্কায় প্রথম দিকে, পয়গম্বর আবু সুফিয়ান এবং তার স্ত্রী হিন্দকে ইসলামের আহ্বান জানান। তিনি তাঁদের বলেন:

আবু সুফিয়ান ইবন হারব, হিন্দ বিনতে 'উতবাহ। তোমরা মারা যাবে, তারপর তোমাদের ওঠানো হবে। তখন ভালোমানুষদের স্বর্গে প্রবেশ করানো হবে, আর দুষ্টরা নরকে প্রবেশ করবে। আমি তোমাদের সত্য বলছি।”–৯৭

ইতিহাসবিদ ইবন খুজাইমাহ, মক্কার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হুসায়েন ও পয়গম্বর মুহাম্মদ(স.)–এর মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছেন। “আমাকে বলো, হুসায়েন”, পয়গম্বর বললেন, “তুমি কয়টি দেবতার পূজা করো?” “পৃথিবীতে সাতটি এবং স্বর্গে একটি”, হুসায়েন জবাব দেন। “তুমি যখন বিপদে পড়ো, তখন কাকে ডাকো?” পয়গম্বর জিজ্ঞেস করলেন। “স্বর্গের সেই একজনকে,” হুসায়েন উত্তর দিল। “আর তুমি যখন সম্পদের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছ তখন কাকে ডেকেছ?” পয়গম্বর আবার জিজ্ঞেস করলেন। হুসায়েন উত্তর দিল, “স্বর্গের সেই দেবতাকেই। একমাত্র তিনিই আমার প্রার্থনার উত্তর দেন।” পয়গম্বর বললেন, “তাহলে কেন তুমি অন্যদের তাঁর সমকক্ষ হিসাবে স্থাপন করার চেষ্টা করো?”–৯৮

আবু উমামার ভিত্তিতে ইমাম আহমদের বর্ণনা করেন, একটি গোষ্ঠীর এক ব্যক্তি পয়গম্বরের কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে কী শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। “আত্মীয়তার সম্পর্কগুলিকে শক্তিশালী করা উচিত এবং অন্যায় হত্যা এড়ানো উচিত। রাস্তাগুলি খোলা রাখা উচিত। মূর্তি ভেঙে ফেলা উচিত। শুধুমাত্র একজন ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত। তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয়।” পয়গম্বরের উত্তর ছিল।

তিনি মদিনায় পৌঁছানোর পরে, যখন তিনি নাজরানের লোকদের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পাঠান, তখন তিনি তাঁর বার্তাটি অন্যভাবে উপস্থাপন করেছিলেন:

'আমি আপনাদের কাছে মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য এবং মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকার করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।'-৯৯

কুরআন নিজেই ছিল পয়গম্বরের প্রচার কাজের একটি স্থায়ী এবং গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। পয়গম্বর যখনই কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তিনি তাকে কুরআনের একটি আয়াত শোনাতেন। হাদীসসমুহে প্রায়শই এমন বর্ণনা পাওয়া যায় যে, "তিনি ইসলামের কথা উল্লেখ করেছেন, এবং তাদের কাছে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করেছেন", বা "তিনি তাদের সামনে ইসলামের বাণী উপস্থাপন করেছেন এবং তাদের কাছে কুরআনের একটি অনুচ্ছেদ পাঠ করেছেন"। কুরআন আরবদের জন্য অসাধারণ চুম্বকত্বের কাজ করেছে। এমনকি ইসলামের ভয়ংকর কিছু শত্রুরা রাতের বেলা চুপিসারে পয়গম্বরের বাড়ি পৌঁছাত, দেওয়ালে কান লাগিয়ে কুরআন পাঠ শুনত। কুরআনের মহৎ শৈলী পয়গম্বরের সম্প্রদায়ের উপর সবচেয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ওয়ালিদ ইবন মুগিরাহ-র কথাই ধরা যাক, যিনি একবার কুরাইশদের হয়ে পয়গম্বরের কাছে এসেছিলেন। যখন পয়গম্বর তাঁকে কুরআনের একটি অনুচ্ছেদ পড়ে শোনালেন, ওয়ালিদ এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁদের বলেছিলেন, কুরআন এমন একটি অতুলনীয় উৎকর্ষের সাহিত্যকর্ম যা অন্য সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। তখনকার দিনে কুরআন পাঠ ছিল ইসলাম প্রচারের একটি সাধারণ পদ্ধতি। মুস'আব ইবন জুবায়েরকে যখন প্রচারক হিসেবে মদিনায় পাঠানো হয়েছিল, তখন তিনি "মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন এবং তাদের কাছে কুরআনের একটি অনুচ্ছেদ পাঠ করে শোনাতেন।" এ কারণেই লোকেরা তাঁকে 'আল-মুকরিন' নামে চিনত, অর্থাৎ কুরআন আবৃত্তিকারী।

মক্কায় তাঁর সময়কালে পয়গম্বরের প্রচার সর্বদা একটি পরিমার্জিত বৌদ্ধিক স্তরে পরিচালিত হতো। এটি কুরআন দ্বারা নির্ধারিত উচ্চ সাহিত্যিক মানদণ্ডের অধীনে ছিল। অন্যদিকে পয়গম্বরের বিরোধীরা জবাবে শুধু গালি ও তিরস্কার করতে পারত। অচিরেই মক্কার বিবেকবান লোকেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে মুহাম্মদ(স.)-এর বিরোধীদের কাছে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে দেওয়ার মতো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য ছিল না। ইবন জারীরের মতে, কুরাইশদের

কয়েকজন অভিজাত ব্যক্তি একটি সভা ডেকে পয়গম্বরের সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল “যতদূর সম্ভব নিজেদের মুহাম্মদ(স.)-এর তিরস্কারের ঊর্ধ্বে রাখা” অর্থাৎ পয়গম্বরকে আশ্বস্ত করা যে তাঁর প্রবল শত্রুদের অনুসরণ করা নিকৃষ্ট কৌশলগুলির সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই।

গ. আরবদের যোগ্যতা

এখন আমরা সেই কারণগুলির দিকে আসি যা ইসলামি প্রচারে সাড়া দেওয়ার পেছনে ভূমিকা রাখে। প্রচারক যতই অক্লান্ত পরিশ্রম করুন, তিনি যতই সঠিকভাবে ইসলামের সত্য বাণী উপস্থাপন করুন, তাঁর শ্রোতাদের মানসিক প্রবণতা নির্ধারণ করে, তাঁর আহ্বান গৃহীত হবে কি না। আরবদের চরিত্রে ছিল একটি মূল্যবান উপাদান, যা তাদের ইসলাম গ্রহণে অবদান রেখেছিল। তারা ছিল সাধারণ মানুষ, যারা সরল প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল। তাদের বহিরঙ্গের অজ্ঞতা এবং একগুঁয়েমি সত্ত্বেও, তারা তাদের চরিত্রে পরিবেশের গুণাবলী ধরে রেখেছিল। ত্রিশ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত মরুভূমিময় যে তপ্ত, অনুর্বর, কঠিন দেশটিতে তারা বাস করত, তা ছিল সবচেয়ে উচ্চ মানবিক মূল্যবোধের জন্য একটি আদর্শ প্রজনন ক্ষেত্র। একজন সাধারণ আরবের আয়ের একটাই উৎস ছিল, তার উট। কিন্তু তার বাড়িতে অতিথি এলে, সে তাদের আপ্যায়নের জন্য এই অমূল্য প্রাণীটিকে জবাই করতে দ্বিধা করত না। নিপীড়নের শিকার হয়ে কোনো ব্যক্তি যদি একজন আরবের সঙ্গে তার তাঁবুতে আশ্রয় নিত, তবে সে নিশ্চিত জানত তার একজন বন্ধু আছে যে অন্যায়ের প্রতিরক্ষায় নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে। এমনকি লুণ্ঠনকারীরাও নীতি মেনে তাদের লুটতরাজ চালাত। যদি তারা কোনো উপজাতির নারীদের কাছ থেকে কাপড় ও গহনা ছিনিয়ে নিতে চাইত, তাহলে তারা নিজ হাতে নারীদের দেহ থেকে সেগুলি ছিনিয়ে নিত না: পরিবর্তে, তারা মহিলাদের তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র হস্তান্তর করতে বলত, এবং তারা নিজেরা উল্টো দিকে মুখ করে দাঁড়াত, যাতে তারা নারীদের কাপড় খুলতে দেখতে না পায়।

মরুভূমির আরবদের সম্পূর্ণ অজ্ঞ মনে করা ভুল হবে। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সতর্ক মানুষ, দ্রুত যে কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারতেন।

একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী থেকে সাতজন মুসলিম ধর্মান্তরিত ব্যক্তি পয়গম্বরের কাছে এসেছিল। তারা তাঁকে বলেছিল, তারা ইসলামের আগে অজ্ঞতার যুগে তারা পাঁচটি জিনিস শিখেছিল। তারা বলেছিল তারা এই নীতিগুলি মেনে চলবে, যদি না পয়গম্বর তাদের অন্য নির্দেশনা দেন। পয়গম্বর তখন তাদের জিজ্ঞেস করলেন অজ্ঞতার যুগ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই নীতিগুলি কী ছিল।

“স্বচ্ছলতার সময়ে কৃতজ্ঞতা”, তারা উত্তর দিয়েছিল, “এবং বিপদের সময়ে ধৈর্য, যুদ্ধের ময়দানে অটলতা এবং ভাগ্যের কাছে সমর্পণ। পঞ্চমত, আমরা অন্যের বিপত্তিতে আনন্দ করতে শিখিনি, এমনকি যদি সে নিজের শত্রুও হয়।” এই কথা শুনে পয়গম্বর বললেন, “এই লোকেরা বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত।” “তারা পয়গম্বরদের ছাঁচে ঢেলে গড়া। তাদের কথা কতই না চমৎকার।(-১০০)

দামাদ নামে বানু আজদাশানুয়াহ গোষ্ঠীর একজন পেশাদার ওঝা একবার মক্কায় এসেছিলেন। সেখানকার লোকেরা তাঁকে পয়গম্বরের কথা বললেন। “তাঁকে একটি অশুভ আত্মা ভর করেছে”, তাঁরা বলেন। দামাদ পয়গম্বরকে দেখতে গেলেন এই ভেবে যে তিনি হয়তো তাকে সুস্থ করতে পারবেন। কিন্তু পয়গম্বরের কথা শুনে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেল। “আমি জাদুকর এবং বাজিকরদের কথা শুনেছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমি কবিদের কাজ দেখেছি। কিন্তু আমি এই প্রকৃতির কিছু কখনও দেখিনি। আমাকে আপনার হাতটা দিন,” তিনি পয়গম্বরকে বললেন। “আমাকে আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করতে দিন।” তাঁর রীতি অনুযায়ী, পয়গম্বর এই উপলক্ষে দীর্ঘ বক্তৃতা দেননি। তিনি মাত্র এইটুকু বলেছিলেন:

‘সমস্ত প্রশংসা ঈশ্বরের। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাই। ঈশ্বর যাকে পথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং ঈশ্বর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঈশ্বর ছাড়া উপাসনার যোগ্য কেউ নেই। তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই।’(-১০১)

এই কয়েকটি শব্দে দামাদ অর্থের ভাণ্ডার খুঁজে পেলেন। “আবার বলুন,” তিনি পয়গম্বরকে অনুরোধ করলেন। “আপনার কথাগুলো সাগরের মতো গভীর।”(-১০২)

একজন আরবের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো অমিলের প্রশ্নই ছিল না। তিনি নিজেই তাঁর কথায় অনড় ছিলেন এবং অন্যদের থেকেও একই জিনিস আশা করেছিলেন। একটি বিষয়ের সত্যতা অনুধাবন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা গ্রহণ করতেন। পয়গম্বরের জীবনীকার ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন, বানু সা'দ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দামাম ইবন সা'লাবাকে পয়গম্বরের কাছে পাঠালে, তিনি মদিনায় এসে মসজিদের গেটের কাছে তাঁর উটটি বেঁধে রাখলেন। তারপর ভেতরে চলে গেলেন। সেখানে পয়গম্বর সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে বসে ছিলেন। দামাম একজন সাহসী ও বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তিনি সমাবেশের সামনে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: “তোমাদের মধ্যে 'আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র কে?” “আমি” পয়গম্বর উত্তর দিলেন। “মুহাম্মদ”, দামাম বললেন, “আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, এবং আমার প্রশ্নে আমি বেশ কঠোর হতে যাচ্ছি। আমি আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না।” “মোটেই না”, পয়গম্বর জবাব দিলেন। “আপনি অবশ্যই আপনার পছন্দমতো প্রশ্ন করতে পারেন।” “আপনি কি আমাকে আপনার ঈশ্বরের নামে এবং আপনার পূর্ববর্তীদের ঈশ্বরের নামে, এবং আপনার পরে যাঁরা আসবেন তাঁদের ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারেন যে, ঈশ্বর আপনাকে তাঁর বার্তাবাহক হিসাবে পাঠিয়েছেন?” “ঈশ্বরের শপথ, হ্যাঁ”, পয়গম্বর জবাব দিলেন। “আপনি কি আমার কাছে শপথ করে বলতে পারেন”, দামাম বলে গেলেন, “আপনার ঈশ্বরের নামে, এবং আপনার পূর্ববর্তীদের ঈশ্বরের এবং যাঁরা আপনার পরে আসবেন তাঁদের ঈশ্বরের নামে, যে ঈশ্বর আপনাকে বলেছেন আমাদের তাঁর উপাসনা করতে উৎসাহিত করতে? একা তাঁকে, এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করতে; যে তিনি আপনাকে এই শিক্ষাপ্রচারে আদেশ করেছেন যাতে আমরা মূর্তি পূজা থেকে বিরত থাকি এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যে সমস্ত জিনিসের পূজা করতেন তা পরিত্যাগ করি?” “ঈশ্বরের শপথ, হ্যাঁ”, পয়গম্বর জবাব দিলেন। “আমি আপনাকে আমার কাছে শপথ করে বলতে বলছি”, দামাম আবার বললেন, “আপনার ঈশ্বরের নামে এবং আপনার পূর্ববর্তীদের

ঈশ্বরের নামে এবং যাঁরা আপনার পরে আসবেন তাঁদের ঈশ্বরের নামে, যে ঈশ্বর আপনাকে আদেশ করেছেন যে আমরা যেন দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি।" দামাম তারপর জাকাত (বিধিবদ্ধ দান), রোজা, হজ্জ্ব (তীর্থযাত্রা) এবং ইসলামের অন্যান্য সমস্ত আদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রতিটি প্রশ্ন একই পদ্ধতিতে প্রণয়ন করলেন। যখন তিনি তাঁর প্রশ্ন শেষ করলেন, এবং পয়গম্বর তাঁকে প্রতিটি প্রশ্নের একই সহজ উত্তর দিলেন, তখন দামাম এই কথাগুলো বলেন:

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঈশ্বরকে উপাসনা করার মতো মূল্যবান আর কিছু নেই, এবং মুহাম্মদ(স.) সৃষ্টিকর্তার বার্তাবাহক। আমি এই বাধ্যবাধকতা পালন করব, এবং আপনি যে জিনিসগুলি নিষিদ্ধ করেছেন, আমি তা এড়িয়ে চলব। এর কোনো অনাথা হবে না।'–১০৩

অতঃপর তিনি উটে চড়ে চলে গেলেন। তিনি তাঁর লোকেদের কাছে পৌঁছে তাঁদেরকে ঘটনাটি বললেন। দিনটি পার হওয়ার আগে, যে সমস্ত নর-নারী তাঁর ঘরে ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল, তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করল।

এই মানুষগুলোর মধ্যে ভন্ডামির চিহ্ন ছিল না। তারা জানত শুধুমাত্র গ্রহণ বা অস্বীকার– এর মাঝে আর কিছুই নেই। তারা যে প্রতিশ্রুতি দিত, তারা তা পূরণ করত, সেটা যাই হোক। জীবন বা সম্পত্তির কোনো বিপদের সম্ভাবনার মুখেও তাদের কথা কাজে রূপান্তরিত হতে বাধা পায়নি। আরবের স্বভাবই এমন ছিল। ঐতিহাসিকগণ দ্বিতীয় আনুগত্যের শপথ উপলক্ষে মদিনার দুটি গোষ্ঠী, আওস এবং খাজরাজ, উভয়ের বক্তৃতা বর্ণনা করেছেন। তাদের সমস্ত জৌলুস রয়েছে, যা তাদের জাতিকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। 'আব্বাস ইবন উবায়দাহ প্রশ্ন করেছিলেন: "খাজরাজের লোকেরা, তোমরা কি জানো যে, এই লোকটির প্রতি আনুগত্যের শপথ করে তোমরা কিসের অঙ্গীকার করছ? তোমরা নিজেদের সকল বর্ণের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অঙ্গীকার করছ। এই বিষয়ে চিন্তা কর। যদি ভবিষ্যতে কখনও তোমাদের প্রাণের ও সম্পদের সংশয় হয়, এবং তোমরা তাঁকে তাঁর লোকেদের কাছে ফেরত পাঠাও, তাহলে এখনই তা করা ভালো। যদি তোমরা পরবর্তীকালে সেটা কর, সেটা তোমাদের ইহকাল এবং পরকাল দুটোকেই নষ্ট করবে। তবে তোমরা যদি মনে কর যে তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সক্ষম

হবে, তাতে যত ক্ষতিই হোক না কেন এবং তোমাদের যতজন নেতা নিহত হন না কেন, তাঁকে তোমাদের সঙ্গে মদিনায় নিয়ে যাও। সেটাই তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়ের জন্যই উত্তম হবে।"

সবাই একজোট হয়ে বলল যে, তারা পয়গম্বরকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, যতই ধনসম্পদ ও প্রাণহানি হোক না কেন। "আমরা যদি আমাদের কথা রাখি, তবে এর বিনিময়ে আমাদের কী হবে?" তারা পয়গম্বরকে জিজ্ঞেস করল। "স্বর্গ", তিনি উত্তর দিলেন। "আমাদের দিকে আপনার হাত বাড়ান", তারা চিৎকার করে বলল। তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তাদের আনুগত্য স্বীকার করলেন।(-১০৪)

আনসারদের পক্ষ থেকে এগুলো নিছক কথার কথা ছিল না; তারা কাজের মাধ্যমে এর প্রমাণ দিয়েছিল। এমনকি মুসলমানরা যখন আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তখনও তারা যে ত্যাগ স্বীকার করেছিল তার জন্য তারা কোনো রাজনৈতিক ক্ষতিপূরণ দাবি করেনি। তারা মক্কাবাসীদের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব তুলে দিতে বেশি ইচ্ছুক ছিল। তারা ইহজগতে কোনো প্রতিদান কামনা করেনি, বরং এই দুনিয়ার দায়িত্ব অন্যদের কাছে রেখে সন্তুষ্ট ছিল এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে পুরস্কারের অপেক্ষায় ছিল।

ঘ. পয়গম্বরের বাণীর সর্বব্যাপিতা

পয়গম্বরের জীবনীকার ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, কুরাইশদের অভিজাত ব্যক্তিরা একবার পয়গম্বরের কাকা আবু তালিবের বাড়িতে জড়ো হয়েছিল। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন 'উতবাহ্ ইবন রাবি'য়াহ্, শায়বাহ ইবন রাবি'য়াহ, আবু জাহল ইবন হিশাম, উমাইয়াহ ইবন খালফ এবং আবু সুফিয়ান ইবন হারব — কুরেইশদের সমস্ত অসামান্য নেতা। আবু তালিবের মাধ্যমে, তারা পয়গম্বরকে জিজ্ঞেস করেছিল, তিনি তাদের কাছে কী চান? "শুধু একটা জিনিস", পয়গম্বর উত্তর দিলেন। "যদি তোমরা সেটি গ্রহণ করো তবে তোমরা আরবদের প্রভু (নেতা) হয়ে যাবে, এমনকি অনারব লোকেরাও তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে।"(-১০৫)

একেশ্বরবাদ কেবল একটি মতবাদ নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। এই

একেশ্বরবাদ মানুষের সব ধরণের সাফল্যের রহস্য। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস মানব প্রকৃতির নিবিড়তম অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। সেই কারণেই এই বিশ্বাস মানুষের মনের গভীরে স্থান পায়। এমনকি এটি শত্রুদের হৃদয়েও স্থান পায়। খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ মক্কা বিজয়ের ঠিক আগে মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু ইসলামের বাণীর সত্যতা সম্পর্কে তিনি বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সচেতন হয়েছিলেন। পরবর্তীতে, তিনি তাঁর প্রাথমিক দৃঢ় বিশ্বাস সম্পর্কে বলেছিলেন যে, কুরাইশরা নয়, মুহাম্মদ(স.) সঠিক ছিলেন এবং ইসলামের পয়গম্বরের দলে তাঁর বাহিনী সহ যোগদান করা উচিত বলে বিবেচনা করেন। "আমি মুহাম্মদ(স.)-এর বিরুদ্ধে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি", তিনি বলেছিলেন, "কিন্তু এমন কোনো যুদ্ধ ছিল না যেখান থেকে আমি এই অনুভূতি নিয়ে ফিরে আসিনি যে, আমি ভুল দিকে যুদ্ধ করছি।"(-১০৬)

ইসলাম গ্রহণের অনেক আগে থেকেই অনেক মানুষের ইসলামের প্রতি ঝোঁক ছিল বলে জানা যায়। কেউ কেউ ইসলাম সম্পর্কে স্বপ্নও দেখেছিলেন। এমনই একজন ছিলেন খালিদ ইবন সা'ঈদ ইবন আল-আস। স্বপ্নে তিনি নিজেকে আগুনের এক বিশাল গর্তের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। কেউ তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিতে চাইছিল। তখন পয়গম্বর মুহাম্মদ(স.) এসে তাঁকে ধ্বংসের গর্ত থেকে উদ্ধার করেন।

এই ধর্মপ্রচারকার্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংযোগ খুঁজে পাওয়া কঠিন হলেও, দুটির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। যখন একজন ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়, তখন তার সমস্ত সম্পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইসলামের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করা হয়। সবার শুরুতে, পয়গম্বরের স্ত্রী খাদিজা ইসলামি আন্দোলনে আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন। এরপর আবু বকর তাঁর ব্যবসা থেকে যে ৪০,০০০ দিরহাম সঞ্চয় করেছিলেন, তার পুরোটাই ইসলামের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এবং পয়গম্বর যখন মক্কা থেকে মদিনায় যান, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে ৬০০০ দিরহাম নিয়ে গিয়েছিলেন, যা ভ্রমণের পুরো ব্যয় বহন করার জন্য যথেষ্ট ছিল। উসমান হিজরি সাল ৯-এ তাবুক অভিযানের জন্য ১০,০০০ দিনার দান করেছিলেন। শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠানে, 'আব্দ আল্- রহমান ইবন 'আউফ ইসলামের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য ৫০০টি ঘোড়া দিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের

সঙ্গেও এমনটা হয়েছিল। তারা নিজেরা যেমন ইসলামে প্রবেশ করেছিল, তেমনি তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও বৃহত্তর ইসলামি কোষাগারের অংশ হয়ে গিয়েছিল।

এক ঈশ্বরে বিশ্বাসই একমাত্র ধর্ম, যা কোনো সামাজিক বৈষম্য বা জাতিগত কুসংস্কারের অনুমতি দেয় না। এই কারণে জনসাধারণ এই ধর্মের ভিত্তিতে যে কোনো আন্দোলনে যোগ দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা উপলব্ধি করে যে একেশ্বরবাদের পতাকাতলে সকল মানুষ প্রকৃত অর্থে সমান হয়। এক মহান ঈশ্বরের বিনীত সেবক হিসাবে, তারা সকলেই মানবিক মর্যাদার অধিকার সহ সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে তাদের সত্যিকারের স্থান খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে, তারা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থান অর্জন করে যা মানুষ আশা করে। মুগিরাহ ইবন শু'বাহ ইরানি যোদ্ধা রুস্তমের দরবারে সমবেত দরবারিদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। ইবন জারিরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, তাঁর কথাগুলো শ্রোতাদের সবার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল;

'নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বলল, "ঈশ্বরের শপথ, এই আরব লোকটি সত্য বলেছে।" উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা বলেছিল, "ঈশ্বরের শপথ, তিনি আমাদের এমন সব শব্দ দ্বারা আক্রমণ করেছেন, যা আমাদের দাসরা অপ্রতিরোধ্য বলে মনে করবে। ঈশ্বর আমাদের পূর্বসূরীদের রক্ষা করুন। তাঁরা কতটা বোকা ছিলেন যে এই সম্প্রদায়কে সাধারণ ভেবেছিলেন।'(-১০৭)

পয়গম্বরের কর্মকাণ্ডের ত্রয়োদশ বছরে তিনি এবং আবু বকর যখন মদিনায় আসেন, তখন প্রায় পাঁচশো লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁরা নবাগতদের এইভাবে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন:

'স্বাগত! আপনারা দুজনেই আমাদের কাছে নিরাপদ। আমরা আপনাকে আমাদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করলাম।'(-১০৮)

একমাত্র পয়গম্বরের প্রচারই তাঁকে মদিনার জনগণের নেতা করে তুলেছিল। মদিনার প্রথম বাসিন্দা যাঁর কাছে পয়গম্বর ইসলাম প্রচার করেছিলেন সম্ভবত তিনি ছিলেন সুওয়াইদ ইবন সামিত আল-খাজরাজি। পয়গম্বর যখন তাঁকে ইসলামের শিক্ষার একটি রূপরেখা দিয়েছিলেন, তখন সুওয়াইদ বলেছিলেন: "মনে হচ্ছে তোমার বার্তা এবং আমার বার্তা এক।" "তোমার বার্তা কী?", পয়গম্বর জিজ্ঞেস করলেন। "লুকমানের প্রজ্ঞা", সুওয়াইদ উত্তর দিল।

পয়গম্বর যখন তাকে লুকমানের জ্ঞান ব্যাখ্যা করতে বললেন, তখন সওয়াইদ কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। "আমার সঙ্গে কুরআন আছে", পয়গম্বর বললেন, "যা এর চেয়ে অনেক উন্নত।" এরপর তিনি কুরআনের কয়েকটি আয়াত আবৃত্তি করেন এবং সুওয়াইদ তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মদিনায় ফিরে যান এবং নিজের গোষ্ঠীর কাছে ইসলামের বাণী প্রচার করেন, কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করে।(-১০৯)

এরপর মদিনার জনৈক সর্দার আবুল হায়সার আনাস ইবন রাফি' মক্কায় আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিল বানু 'আবদ আল-আশহাল গোষ্ঠীর একদল যুবক। তারা খাজরাজ গোষ্ঠীর পক্ষে কুরাইশদের সঙ্গে মৈত্রী করার জন্য মক্কায় এসেছিল। খাজরাজরা ছিল মদিনার অন্যতম প্রধান গোষ্ঠী যারা অন্য প্রধান গোষ্ঠী আস-এর সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিল। তারা মক্কায় আছে শুনে পয়গম্বর তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন এবং বললেন: "তোমরা যার জন্য এসেছো আমি কি তোমাদের তার চেয়েও উত্তম কিছু বলব?" তারপর তিনি তাদের এক ঈশ্বরে বিশ্বাসের অর্থ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে আয়াস ইবন মু'আজ নামে এক যুবক ছিলেন, যিনি তাঁর লোকদের বলেছিলেন, তারা যা আশা করে এসেছিল তার থেকে পয়গম্বরের বক্তব্য অনেক উত্তম। তবে গোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিরা রাজি হয়নি। "আমাদের ছেড়ে দিন", তারা বলল, "আমরা এখানে অন্য কাজে এসেছি।" তারা মদিনায় ফিরে গেল। এর পরপরই আ'স ও খাজরাজ গোষ্ঠীর মধ্যে ভয়ানক ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ শুরু হল যা বু'য়াথ নামে পরিচিত।

খুবাইব ইবন 'আবদ আল-রহমানের মতে, মদিনার দুই ব্যক্তি, সা'দ ইবন জারারাহ এবং জাকওয়ান ইবন কায়স মক্কায় এসে 'উতবাহ ইবন রাবি'য়াহর কাছে থাকছিলেন। পয়গম্বরের কথা শুনে তাঁরা তাঁকে দেখতে গেলেন। পয়গম্বর তাঁদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান এবং তাঁদের কাছে কুরআনের একটি অনুচ্ছেদ পড়ে শোনান। তাঁরা পয়গম্বরের আমন্ত্রণে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাদের নিমন্ত্রণকর্তা 'উতবাহ-র বাড়িতে ফিরে আসার পরিবর্তে তাঁরা পয়গম্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে সরাসরি মদিনায় ফিরে গেলেন। তাঁরাই সর্বপ্রথম মদিনাবাসীর কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেন। এটি ছিল মদিনায় যাওয়ার তিন বছর আগে, পয়গম্বরের কর্মকাণ্ডের দশম বছরের ঘটনা।

পরের বছর খাজরাজ গোষ্ঠীর ছয়জন লোক হজ্জ্ব করতে মক্কায় আসেন। তাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন, পয়গম্বরের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন এবং তারপর সেখান থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য মদিনায় ফিরে আসেন। অতঃপর পয়গম্বরের কর্মকাণ্ডের দ্বাদশ বছরে, বারোজন লোক পয়গম্বরের কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে আসেন। মক্কার নিকটবর্তী 'আকা'বাহ-তে তাঁরা যে শপথ নিয়েছিলেন, তা ইসলামের ইতিহাসে 'আকা'বাহ-র প্রথম শপথ' নামে বিখ্যাত। পরের বছর একই জায়গায় আর একটি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছিল, যাতে ৭৫ জন মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মক্কায় যা ঘটেছিল তার বিপরীতে, মদিনা শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উপজাতীয় প্রথা অনুসারে, সেকালে লোকেরা তাদের নেতাদের ধর্ম অনুসরণ করত। তার ফলে মদিনায় ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এমন একটি গৃহও ছিল না, যেখানে ইসলাম প্রবেশ করেনি। এটা স্বাভাবিক ছিল যে, মুসলমানরা মদিনায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায়, তারা শহরের বিভিন্ন বিষয়ে প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হল। সেই অনুসারে তাবারানি বর্ণনা করেছিলেন যে, "মুসলমানরা শহরের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল।"

ঙ. প্রচার কাজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া বিষয়গুলি

এই জগতে এমন কিছু মানুষ বাস করেন যাঁরা এই পৃথিবীর কলুষতাকে প্রতিরোধ করেন এবং তাঁদের নিজস্ব আদি প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন। এটি শাশ্বত সত্য, তবে যখন পয়গম্বর তাঁর কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন, এটি আরবদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য ছিল। তারা যে সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল তার পাশাপাশি আবরাহামের ধর্মের উত্তরাধিকার ছিল, যা অনেককে সত্যের সন্ধান করতে এবং মূর্তিপূজা থেকে দূরে সরে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই ধরণের লোকেরা সাধারণত হানিফ বা ন্যায়পরায়ণ নামে পরিচিত ছিল। কুস ইবন সা'য়িদাহ এবং ওয়ারাকা ইবন নওফাল এই হুনাফা'দের মধ্যে ছিলেন; জান্দুব ইবন আমর আল-দাওসীও তাই ছিলেন। ইসলামের পূর্ববর্তী অজ্ঞতার যুগে তিনি বলেছিলেন:

‘আমি জানি যে এই সমস্ত সৃষ্টির একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন, কিন্তু আমি জানি না তিনি কে।’(–১১০)

পয়গম্বরের কথা শুনে তিনি তাঁর উপজাতির পঁচাত্তর জন সহযোগীর সঙ্গে তাঁর কাছে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু জার আল গিফারী ছিলেন এমনই আর একজন ব্যক্তি। তিনি পয়গম্বর মুহাম্মদ(স.)-এর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে আরও জানার জন্য তাঁর ভাইকে মক্কায় পাঠান। আবু জারের ভাই পরে তাঁকে যে বিবরণ দিয়েছিলেন তার একটি বাক্য নিম্নরূপ:

‘আমি একজন মানুষকে দেখেছি যাকে মানুষ ধর্মহীন বলে।কিন্তু আমি এর আগে আর কাউকে দেখিনি, যে তোমার সঙ্গে এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ।’(–১১১)

এই ধরণের মানুষদের পয়গম্বরের বাণীর সত্যতা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

ঈশ্বরের বাণীর প্রচারক একজন রোপণকারীর মতো যিনি বীজ বপন করেন। কখনও কখনও তাঁর বীজ অনুর্বর জমির উপর পড়ে, আবার কখনও কখনও সেগুলি এমন জায়গায় পড়ে যা রোপণকারীর অজান্তেই ভালো ফলন দেয়।

কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে যথেষ্ট সময় নিয়েছে। তার মানে এই নয় যে, ইসলামের সত্য শেষ পর্যন্ত হঠাৎ করেই তাদের মধ্যে উদিত হয়েছিল। পয়গম্বর সর্বোচ্চ নৈতিক যোগ্যতার জীবন যাপন করেছেন। অধিকন্তু, তিনি তাঁর পুরো সময় ঈশ্বরের বাণী প্রচারে ব্যয় করেছিলেন। এমনকি পয়গম্বরের বিরোধীরাও তাঁর অনুকূলে একটি ইতিবাচক বিষয় হয়ে উঠেছিল: এর অর্থ হল তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর বার্তা ছিল মানুষের কথোপকথনের বিষয়। এই সমস্ত কিছু আরবদের মনে ইসলামের বীজ রোপণে ভূমিকা নিয়েছিল। উপজাতীয় ঐতিহ্যের আনুগত্য, এবং পূর্বপুরুষের উপাসনা তখনও বিদ্যমান ছিল এবং এতে কখনও কখনও মনে হয়, ইসলামের কঠোর বিরোধিতা বজায় ছিল; কিন্তু আসলে, মানুষের হৃদয়ে ইসলামের বীজ নীরবে বেড়ে উঠছিল। উদাহরণস্বরূপ, এই কথা সাধারণত মনে করা হয় যে ‘উমরের ইসলাম গ্রহণ, আকস্মিকভাবে একটি নির্দিষ্ট ঘটনার প্রভাবের অধীনে ঘটেছিল। তবে এটা বলা আরও সঠিক

হবে যে এই ঘটনাটিই তাঁর বিশ্বাসের উপর চূড়ান্ত সীলমোহর স্থাপন করেছিল, যা কিছু সময়ের ধরে তাঁর অন্তরে বিকশিত হচ্ছিল।

'উমরের ইসলাম গ্রহণের আগে, যখন তিনি পয়গম্বরের কর্মকান্ডের বিরোধিতায় অগ্রগণ্য ছিলেন, তখন কিছু মুসলমান আবিসিনিয়ায় চলে যান। উম্মে 'আবদুল্লাহ বিনতে আবি হাসমাহ ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি এভাবে তাঁর নিজের কথা বলেছেন:

"আমরা আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলাম। আমার স্বামী, 'আমির, তার কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। হঠাৎ, উমর ইবন আল-খাত্তাব, যিনি আমাদের অকথ্য যন্ত্রণা দিয়েছিলেন, আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি।" "উম্মে আবদুল্লাহ", তিনি আমাকে বললেন, "তোমরা কি কোথাও চলে যাচ্ছ?" "হ্যাঁ", আমি উত্তর দিলাম, "তোমরা আমাদের এমন কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়েছ, আমাদের এত বিরক্ত করেছ, যে আমাদের চলে যেতেই হবে, এবং ঈশ্বরের পৃথিবীতে নিজেদের জন্য জায়গা খুঁজতে হবে। আমরা চলতে থাকব যতক্ষণ না ঈশ্বর আমাদের কষ্ট থেকে মুক্তি দেন।" "ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকুন," 'উমর বললেন, এবং কথা বলার সময় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। আমি তাঁকে আগে কখনো এমন আচরণ করতে দেখিনি। তারপর তিনি তাঁর পথে চলে গেলেন, এবং আমাদের মক্কা ছেড়ে যেতে দেখে তিনি অবশ্যই খুব দুঃখ পেয়েছিলেন।(-১১২)

যুগে যুগে প্রতিদিন কিছু ধারণা জনমানসে শিকড় গেড়ে নেয়। এই ধারণাগুলি নির্বাসিত হওয়ার আগে, কোনো নতুন বার্তা, তা যত যুক্তিযুক্তই হোক না কেন, গ্রহণীয় হতে পারে না। আরবরা ইসলামের বাণীর প্রতি সর্বপ্রথম যে বিরোধিতা করেছিল, তা কেবল তাদের একগুঁয়েমি থেকে নয়। তাদের পক্ষে বোঝা সত্যিই কঠিন ছিল যে কীভাবে পবিত্র কা'বাহ-র পৃষ্ঠপোষকদের ধর্মের থেকে অন্য কোনো একটি ধর্ম 'সত্য ধর্ম' বলে বিবেচিত হতে পারে।

ইহুদি অঞ্চলের আশেপাশে বসবাসকারী আরব উপজাতিরা সাধারণত এই ধরণের সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্ত ছিল। তারা প্রায়ই ইহুদীদের কাছ থেকে শুনত যে তাদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে যে আরবদের মধ্যে একজন পয়গম্বর আসবেন। ঐতিহাসিক তাবারানি ব্যাখ্যা করেছেন, এ কারণেই মদিনার জনগণের জন্য ইসলামের সত্যতা গ্রহণ করা সহজ ছিল:

আনসাররা ঈশ্বরের বার্তাবাহকের শিক্ষা শুনে চুপ করে রইলেন। তিনি যা প্রচার করেছিলেন তা সত্য বলে তাদের অন্তর সন্তুষ্ট ছিল। তারা ধর্মগ্রন্থপ্রাপ্ত মানুষদের কাছে শুনেছিল শেষ পয়গম্বর কেমন হবেন। তারা তাঁর বাণীর সত্যতা স্বীকার করেছিল। তারা তাঁর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং তাঁকে বিশ্বাস করেছিল।(-১১৩)

পয়গম্বর যখন ‘উকাজের মেলায় গিয়েছিলেন এবং বানু কান্দাহ্ গোষ্ঠীর তাঁবুতে প্রবেশ করে তাঁর শিক্ষা ব্যাখ্যা করেছিলেন, তখন এক যুবক এই কথাটি বলেছিলেন:

‘আমার লোকেরা, আসুন আমরা তাড়াতাড়ি করি এবং এই মানুষটির অনুসরণকারী হিসেবে প্রথম হই। ঈশ্বরের দিব্যি, ধর্মগ্রন্থ থেকে জানতে পেরেছি যে পবিত্র অঞ্চল থেকে একজন পয়গম্বরের আবির্ভাব হবে, এবং তার সময় হয়ে এসেছে।’(-১১৪)

আ’ওস ও খাজরাজ গোষ্ঠী দুটি তখন একজন আরব পয়গম্বরের আগমনের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। তিনি যখন এলেন, তাদের পক্ষে তাঁকে গ্রহণ করা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। যদিও মক্কার অধিকাংশ লোক এবং তাদের সঙ্গীরা, কারা কা’বাহকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার প্রেক্ষিতে সত্যকে বিবেচনা করত। আরব ধারণায়, কা’বাহকে রাজার মুকুট হিসাবে ভাবা হতো। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রতীকটি একটি মুকুটের চেয়েও উচ্চতর ছিল, কারণ মুকুট কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে আসে; কা’বাহ-র উপর আধিপত্য বিস্তারকারী ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যেরও উত্তরাধিকারী ছিলেন। জু’ল জাওশান আল-দুব্বা’ই এবং পয়গম্বরের মধ্যে কথোপকথন থেকে দেখা যায়, আরবরা তাদের সরলতায়, কেবলমাত্র ঈশ্বরের গৃহ, মক্কার কা’বাহ্-র নিয়ন্ত্রণে কে ছিল, তার প্রেক্ষিতে সত্যের কথা ভাবতে পারে:

“তুমি ইসলাম গ্রহণ কর না কেন?” পয়গম্বর জু’ল জাওশানকে বললেন, “যাতে তুমি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য হতে পারো।” জু’ল জওশান বললেন যে তিনি তা করবেন না। পয়গম্বর তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। “আমি শুনেছি যে আপনার লোকেরা আপনার রক্তের পিছনে পড়ে আছে,” জু’ল জাওশান বললেন। “আপনি কি বদরে তাদের পরাজয়ের কথা

শোনেন নি?” পয়গম্বর জিজ্ঞেস করলেন। জু’ল জাওশান বললেন যে তিনি শুনেছেন। পয়গম্বর বললেন, “আমরা শুধু আপনাদের পথ নির্দেশনা দিচ্ছি।” জু’ল জাওশান বলেছিলেন যে, তিনি ততক্ষণ ইসলাম গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ না তিনি (পয়গম্বর) মক্কা জয় করেন এবং কা’বাহ-র নিয়ন্ত্রণ পান। “যদি আপনি বেঁচে থাকেন, তবে আপনি এটি ঘটতে দেখবেন”, পয়গম্বর বললেন। জু’ল জাওশান বলেছেন যে পরে যখন তিনি ঘাওর নামক স্থানে তাঁর পরিবারের সঙ্গে ছিলেন, তখন একজন আরোহী আসে। জু’ল জাওশান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন চারপাশে কী চলছে। “মুহাম্মদ মক্কা জয় করেছেন এবং পবিত্র অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন”, তিনি বলেছিলেন। “আফসোস আমার”, জু’ল জাওশান বলল। যদি আমি সেদিন ইসলাম গ্রহণ করতাম: আজ আমি মুহাম্মদের কাছে একটি পান্না চাইলে তিনি আমাকে তা দিতেন। (-১১৫)

চ. ইসলামের বার্তার প্রতিক্রিয়া

ইসলামের পয়গম্বর যখন তাঁর প্রচারযাত্রা শুরু করেন, তখন তিনি এমন প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছিলেন, যা একটি নতুন বার্তা শোনার পরে সমাজ থেকে আশা করা যায়। তাঁর শিক্ষার অর্থ উপলব্ধি করতে মানুষ ব্যর্থ হয়। একবার কুরাইশ অভিজাতরা ‘উতবাহ্ ইবন রাবি’য়াহকে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে পয়গম্বরের কাছে পাঠান। তিনি পয়গম্বর ও তাঁর শিক্ষার দীর্ঘ নিন্দা করলেন। যখন তিনি তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন পয়গম্বর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?” ‘উতবাহ বলেছিলেন যে তিনি শেষ করেছেন। “পরম মঙ্গলময়, করুণাময় ঈশ্বরের নামে”, পয়গম্বর শুরু করলেন এবং তারপরে হা মিম আল সাজদাহ্ শিরোনামে কুরআনের অধ্যায়ের প্রথম তেরোটি আয়াত পাঠ করলেন। “তোমার কি আর কিছু বলার আছে?” ‘উতবাহ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। পয়গম্বর জানালেন তাঁর আর কিছু বলার নেই। যখন তিনি কুরাইশদের কাছে ফিরে গেলেন, তখন তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কি ঘটেছে। “আপনারা আমাকে যা বলতে পাঠিয়েছিলেন, তা আমি বলেছি”, ‘উতবাহ উত্তর দিলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করেছিলেন— মুহাম্মদ(স.) কোনো উত্তর দিয়েছেন কিনা। ‘উতবাহ বললেন যে তিনি বলেছিলেন, কিন্তু তিনি যে প্রমাণগুলি দিয়েছেন তা বোধগম্য নয়। তিনি যা

বুঝেছিলেন, তা হল, তিনি তাদের সামুদ ও আদ জাতির উপর আছড়ে পড়া বজ্রপাত সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন। “কী হয়েছে আপনার?” কুরেইশরা জিজ্ঞেস করলেন, “এটা কীভাবে হল যে একজন ব্যক্তি আপনার সঙ্গে আরবি ভাষায় কথা বললেন, এবং সে কী বলছে আপনি তা বুঝতে পারলেন না?” “সত্যিই, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি”, ‘উতবাহ্ জোর দিয়ে বললেন। “আমি যা বুঝতে পেরেছি তা হল, তিনি একটি বজ্রপাতের কথা বলেছিলেন।”(-১১৬)

কিছু মানুষ শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট, প্রচলিত আকারে ধর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিল। ইসলামের বার্তাটি তাদের কাছে পূর্বপুরুষদের নিন্দা বলে মনে হল। দামাদ একবার ‘উমরাহ করতে মক্কায় আসেন। সেই উপলক্ষে তিনি আবু জাহল, ‘উতবাহ ইবন রাবিয়াহ এবং উমাইয়া ইবন খালফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। “তিনি [মুহাম্মদ(স)] আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছেন।”, আবু জাহল ঘোষণা করেছিলেন। “তিনি মনে করেন, আমরা সকলেই মূর্খ, এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিপথগামী। তিনি আমাদের বিগ্রহগুলির অপমান করেন।” “তিনি উন্মাদ, সন্দেহ নেই”, উমাইয়া যোগ করেন।(-১১৭)

যখন ‘আমর ইবন মুররাহ আল জুহানী তাঁর নিজের গোষ্ঠী জুহায়নার মধ্যে ইসলাম প্রচার করেছিলেন, তখন তাঁদের একজন বলেছিলেন, “ঈশ্বর তোমাকে জীবনের তিক্ততার স্বাদ দান করুক, ‘আমর। তুমি কি চাও যে আমরা আমাদের বিগ্রহগুলি ত্যাগ করি, আমাদের মানুষদের বিভক্ত করি এবং আমাদের সৎ পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা করি? তাহামাহ-র এই কুরাইশ ব্যক্তিটি যে ধর্ম প্রচার করছে, তাতে কোনো অনুভূতি নেই, মহানুভবতা নেই।” এরপর তিনি তিনটি আয়াত আবৃত্তি করতে লাগলেন, যার শেষটি এইরকম ছিল:

‘তিনি প্রমাণ করতে চান যে আমাদের পূর্বপুরুষরা মূর্খ ছিলেন। যে এইভাবে কাজ করে সে কখনই উন্নতি করতে পারে না।’(-১১৮)

কিছু মানুষ হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ইসলামের বাণী গ্রহণে অপারগ ছিল। তিনি যে ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত, এই কথা পয়গম্বর কখনো গোপন করেননি; তিনি সকলের কাছে সত্যটি ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু মানুষ সবসময় এটা মেনে নিতে পারে না যে, অন্য কাউকে এমন বাস্তবতার জ্ঞান দেওয়া

হয়েছে, যা তাদের দেওয়া হয়নি। মুগিরাহ্ ইবন শু'বাহর ভিত্তিতে বায়হাকি বর্ণনা করেছেন যে, আবু জাহল কীভাবে একবার পয়গম্বরকে একপাশে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বলেছিল, "ঈশ্বরের শপথ, আমি ভালো করেই জানি যে আপনি যা বলছেন তা সত্য, কিন্তু একটি জিনিস আমাকে বিশ্বাস করতে বাধা দেয়। বানু কুসায়িরা বলে যে তারা কা'বাহ-র দ্বাররক্ষক, এবং আমি তাদের সঙ্গে একমত। তারা বলে যে তীর্থযাত্রীদের জন্য জল বহন করা তাদের কাজ এবং আমি আবারও তাদের সঙ্গে একমত। তারা 'দার-আল-নদওয়া'তে একটি স্থান দাবী করে, এবং আমি একমত যে এটিতে তাদের সমস্ত অধিকার রয়েছে। তারা বলে যে যুদ্ধে ধ্বজা বহন করা তাদের দায়িত্ব এবং আমি তাতেও তাদের সঙ্গে একমত। এখন তারা বলে যে তাদের মধ্যে একজন পয়গম্বর আছেন। এটা আমি মেনে নিতে পারি না।"(-১১৯)

কিছু লোকের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা তাদের ইসলামের বাণী গ্রহণ করতে বাধা দেয়। পয়গম্বরের আগমনের আগে মক্কায় ঈশ্বরের ঘরটি মুর্তি পুজার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। প্রতিটি ধর্মের মানুষ সেখানে তাদের মূর্তি স্থাপন করেছিল। এমনকি কা'বাহ-র দেয়ালের মধ্যে যীশু এবং মেরির মূর্তিও ছিল। এইভাবে এটি সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। এই কারণেই চারটি মাসকে পবিত্র মাস বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, যাতে সে সময় মানুষ নিরাপদে কা'বাহ্ পরিদর্শন করতে পারে, পথে কোনো ক্ষতি বা আক্রমণের ভয় না থাকে। যে চার মাস মানুষ মক্কায় ভিড় করত, মক্কার ব্যবসায়ীরা আশাতীত ভালো ব্যবসা করত। কা'বাহ থেকে মূর্তিগুলো সরিয়ে নেওয়া হলে মানুষ শহরে আসা বন্ধ করে দেবে এবং সেখানকার অধিবাসীরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাই বহু দেবতাবাদী চর্চা অব্যাহত রাখার সাথে অনেক মানুষের স্বার্থ জড়িত ছিল। তারা আশঙ্কা করেছিল যে, একত্ববাদ যদি দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে মক্কা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আগের মতোই এলাকাটি চাষের অযোগ্য উষর উপত্যকায় পরিণত হবে।

উপরন্তু, কুরাইশরা, কা'বাহ-র পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাদের অবস্থানের কারণে, দূর-দূরান্তের উপজাতিদের উপর কর্তৃত্ব করত। তাদের কাফেলা উপদ্বীপের সীমানা ছাড়িয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে যাতায়াত করত। দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি

অনুসারে, তারা পারস্য, আবিসিনিয়া এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মতো দূরবর্তী অঞ্চলের উপজাতিদের সঙ্গে ব্যবসা করত।

কুরাইশরা মনে করেছিল যে, তারা মুহাম্মদ(স.)-কে একজন পয়গম্বর হিসাবে মেনে নিলে প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলি — আসলে আরবের সমস্ত বহুদেবতাবাদীরাই — কুরাইশদের সঙ্গে যে বাণিজ্যিক চুক্তি করেছিল, তা ভঙ্গ করবে। এর ফলে আরবদের উপর কুরাইশদের আধিপত্যের অবসানও হবে। আল-ওয়াকিয়াহ (ঘটনা) শিরোনামে কুরআনের সুরাহ-র এই আয়াতটির অর্থ: "এবং তোমরা কি অস্বীকার করাকে তোমার জীবিকার উপায় করে নিয়েছ।"(-১২০) কুরাইশদের এই ধারণার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পয়গম্বর মুহাম্মদ(স.)-কে অস্বীকার করে এবং তিনি যে একেশ্বরবাদী ধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন সেটি অস্বীকার করে, তারা আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করছিল।

যখন পয়গম্বর তাঁর বাণী প্রচার করতে শুরু করেন, তাঁকে ঘিরে সকলের কৌতূহল বেড়ে ওঠে। ইতিহাসবিদ আবু ইয়া'লার মতে, যারা তাঁকে দেখেছিল তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করত: "ইনিই কি তিনি?" তিনি হয়তো একটি কাফেলার মধ্যে ভ্রমণ করছেন, কিন্তু লোকেরা তাঁকে আলাদা করে চিহ্নিত করত। কেউ মক্কায় এলেই, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে পয়গম্বরের খবরও নিয়ে ফিরতেন। "আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ পয়গম্বরত্বের দাবী করেছেন এবং আবু কাহাফাহ্ র পুত্র তাকে অনুসরণ করেছেন," - তারা বলত। কুরেইশরা পয়গম্বরকে 'মুহাম্মদ' (যার অর্থ প্রশংসনীয়) না বলে, 'মুজাম্মাম' বলে ডাকত, যার অর্থ নিন্দনীয়। তারা তাঁকে তাদের পূর্বপুরুষদের অপমান করার জন্য অভিযুক্ত করত। পয়গম্বরের জীবনীকার ইবন হিশাম বর্ণনা করেছেন, একবার যখন পয়গম্বর তাঁর সঙ্গী এক কুরাইশকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন সেই রাস্তায় আবর্জনা ভর্তি দেখে, তিনি হতাশ হয়ে বলেন: "বানু 'আবদ আল মানাফরা প্রতিবেশী হিসেবে কী খারাপ।"(-১২১)

পয়গম্বরের কাকা আবু তালিব জীবিত থাকাকালীন তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। কারণ, উপজাতীয় প্রথা অনুযায়ী, পয়গম্বরের বিরুদ্ধে আগ্রাসন তার পুরো গোষ্ঠী বানু হাশিমের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের সমান বলে বিবেচিত হতো। ইসলাম গ্রহণের আগে 'উমর ইবন

খাত্তাব একবার মুহাম্মদ(স.)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে রওনা হন। উমরের মন পরিবর্তন করার জন্য তাঁকে কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল, "মুহাম্মদকে হত্যা করলে বানু হাশিমদের সঙ্গে আপনি কীভাবে বসবাস করবেন?" পয়গম্বরের ক্ষতি করতে চাইলে সেই ব্যক্তিকে একই প্রশ্নের সম্মুখীন হতো। মক্কায় নিপীড়ন বেশিরভাগ দাসদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের রক্ষা করার জন্য কোনো গোষ্ঠী ছিল না। পয়গম্বরের ঘনিষ্ঠ সহচর, 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদের মতে, প্রথম দিকে মক্কার মাত্র সাতজন মানুষ মুসলিম হওয়ার বিষয়ে প্রকাশ্যে এসেছিলেন; পয়গম্বর নিজে, আবু বকর, 'আম্মার, সা'ঈদ, সুহায়ব, বিলাল এবং মিকদাদ। "ঈশ্বর পয়গম্বরকে তাঁর কাকার মাধ্যমে রক্ষা করেছিলেন। আবু বকরের গোষ্ঠী তাঁর দায়িত্ব নিয়েছিল। বহুদেবতাবাদীরা বাকিদের ধরে নিয়ে যায় যারা তাদের গায়ে বর্ম পরিয়ে দেয় এবং প্রখর রোদে ফেলে রাখে।"(-১২২)

যখন বানু হাশিম গোষ্ঠীর প্রধান, পয়গম্বরের কাকা আবু তালিব মারা গেলেন, কুরাইশদের একজন অপরিচিত সদস্য পয়গম্বরের দিকে ময়লা নিক্ষেপ করে এবং তা তাঁর গায়ে লেগে যায়। তিনি যখন বাড়িতে পৌঁছোন, তখন তাঁর মেয়ে ফাতিমা তাঁর গায়ে লেগে থাকা সেই ময়লা পরিষ্কার করেন। "কুরাইশরা এর আগে আমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করেনি", পয়গম্বর মন্তব্য করেছিলেন। আবু তালিবের মৃত্যুর পরই তারা এই প্রকৃতির অমানবিক আগ্রাসন করেছিল। পয়গম্বরের সহযোগী আবু হুরায়রা উল্লেখ করেছেন, "কাকার মৃত্যুর পর কুরাইশরা পয়গম্বরের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করত।"

"কাকা, কত দ্রুত আমি আপনার অভাব অনুভব করছি", পয়গম্বর একবার বিলাপ করেছিলেন।(-১২৩)

কুরাইশরা এমনকি পয়গম্বরকে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনাও শুরু করেছিল। এইরকম একটি সময়েই আবু জাহল পয়গম্বরের মাথায় পশুর অন্ত্র(নাড়িভুড়ি) নিক্ষেপ করেছিল এবং 'উকবা ইবন মু'ইত তাঁর গলায় শক্ত করে একটি চাদর বেঁধে তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করেছিল। সৌভাগ্যক্রমে, সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। আবু তালিবের মৃত্যুর পর মনে হচ্ছিল পয়গম্বরের উপর পৈশাচিক আক্রমণ বন্ধ করা সম্ভব হবে না। কেবল একটা

বিষয় মানুষকে আটকে রেখেছিল, সেটা এই যে, আরবে বানু হাশিম গোষ্ঠীর একজন সদস্য তাঁর নিজের সঙ্গী কুরাইশদের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হওয়ার কোনো দৃষ্টান্ত এর আগে ছিল না। মূর্তিপূজকদের মধ্যে এমনও অনেক ছিল যাদের বিবেক প্রতিনিয়ত তাদের খোঁচা দিত; তারা অন্তর থেকে পয়গম্বরকে সমর্থন করেছিল। আবু জাহল প্রথমবারের মতো পয়গম্বরের উপর প্রাণঘাতী হামলা করেছিল। আবুল বাখতারি এই ঘটনা শুনে একটি চাবুক নিয়ে কা'বাহ-র কাছে গেলেন। সেখানে আবু জাহল তার সহযোগীদের সঙ্গে বিজয়ী হয়ে বসে ছিলেন। আবুল বাখতারি প্রথমে নিশ্চিত হন যে আবু জাহল সত্যিই এইভাবে পয়গম্বরকে আক্রমণ করেছে, এবং যখন দেখা গেল যে সত্যই সে তা করেছে, তখন তিনি তাঁর চাবুকটি নিয়ে আবু জাহলের মাথায় এত জোরে আঘাত করলেন যে সে ব্যথায় চিৎকার করে উঠল।

বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, একটি ধর্ম হিসাবে বহুদেবতাবাদ সমালোচনার প্রতি সর্বদা অতিমাত্রায় সংবেদনশীল ছিল। কিন্তু প্রাচীনকালে বহুদেবতাবাদ কেবল একটি ধর্মের চেয়ে অনেক বেশি ছিল; এটি ছিল সামাজিক বিধিসমূহের কাঠামোর ভিত্তি। বহুদেবতাবাদের প্রতি জনগণের অতিমাত্রায় আসক্তির একটি রাজনৈতিক কারণও ছিল। মক্কার অবস্থা ছিল একইরকম এবং সেই কারণেই পয়গম্বরের সময় ধৈর্যের একটি বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল। তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রথম তিন বছরে মাত্র কয়েকজন মানুষ তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। মক্কা শহরটিতে পয়গম্বরের কোনো সমর্থক ছিল না; যেমন সেখানে ছায়াদানকারী কোনো বৃক্ষও ছিল না। মাত্র চারজন তাঁর কাছাকাছি ছিলেন- 'আলি, যায়েদ, আবু বকর এবং খাদিজা- পঞ্চম ব্যক্তি যদি কেউ থেকে থাকেন তাহলে তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আবু বকরের কন্যা আয়েশা।

পুরো তিন বছর এই অবস্থায় কাটে। পয়গম্বর যখন তাঁর বাড়ি থেকে বের হতেন, তখন রাস্তায় তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের শিকার হতে হতো, যেন তিনি একজন উন্মাদ। একদিন আবু জাহলের প্ররোচনায় একদল লোক পয়গম্বরকে গালি দিচ্ছিল। সম্ভ্রান্ত কুরেইশ পরিবারের একজন ব্যক্তির সঙ্গে এই আচরণের দৃশ্য দেখে জনৈক পথচারী সহ্য করতে পারেননি। তিনি সরাসরি পয়গম্বরের কাকা হামজাহ-র কাছে গেলেন। "আপনি কি সব সম্মানবোধ হারিয়ে

ফেলেছেন?” সে বলেছিল, “আপনি এখানে বসে আছেন যখন লোকেরা আপনার ভাইপোকে অপমান করছে।” হামজাহ্-র অহং বোধ জাগিয়ে তুলতে এটাই যথেষ্ট ছিল। তাঁর কাছে একটি লোহার ধনুক ছিল, যা নিয়ে তিনি আবু জাহলকে খুঁজতে গেলেন। পয়গম্বরের অত্যাচারীকে আঘাত করে তিনি বলেছিলেন: “আমি মুহাম্মদ-এর ধর্মকে নিজের বলে গ্রহণ করেছি। যদি তোমার মধ্যে এটা থাকে, তাহলে এই ব্যাপারে কিছু করো।”(-১২৪)

হামজাহ্ যোদ্ধা হিসেবে সারা আরবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি এই পদক্ষেপ নেওয়ার পর মানুষ নতুনভাবে সাহস পায় এবং মুসলমানের সংখ্যা ত্রিশে গিয়ে দাঁড়ায়। এই সময় মক্কায় দুইজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন- ‘উমর ইবন আল-খাত্তাব এবং আবু জাহল ইবন হিশাম। পয়গম্বর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন: “প্রভু, ‘উমর ইবন আল্-খাত্তাব বা আবু জাহল ইবন হিশামের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।” এই প্রার্থনাটি ‘উমর ইবন আল-খাতাবের ক্ষেত্রে গৃহীত হয়। পয়গম্বরের কর্মকাণ্ডের ষষ্ঠ বছরে ‘উমর ইবন আল- খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হন এবং মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে চল্লিশে পৌঁছে যায়। এই সময়কালে দার আল-আরকামে মুসলমানদের একটি গোপন আস্তানা ছিল। ইতিহাসবিদ ইবন কাথিরের মতে, সেখানে উনত্রিশ জন মানুষ জড়ো হয়েছিলেন।

কিন্তু এত কম সংখ্যক মানুষ প্রচলিত ব্যবস্থার শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেনি, কারণ সংখ্যা ও সম্পদের দিক থেকে তা ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। মুসলমানদের ওপর আবার অত্যাচার শুরু হতে বেশি দিন লাগল না। পয়গম্বর সর্বপ্রকার নিপীড়নের শিকার হন, কিন্তু তাঁকে হত্যার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। উপজাতীয় গোষ্ঠী ব্যবস্থা তখনও পয়গম্বরের কাছে সুরক্ষামূলক ছিল। কেউ তাঁর প্রাণ কেড়ে নেওয়ার সাহস করতে পারত না, কেননা তা করলে পয়গম্বরের সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হতো। তিনিই একমাত্র পয়গম্বর নন যাঁকে এভাবে রক্ষা করা হয়েছিল। একই কারণে, হজরত শু’য়াইবের লোকেরা, তাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত ছিল:

‘তারা বলল, “হে শু’য়াইব, তুমি আমাদের যা বলছ, তার অনেক কিছুই

আমরা বুঝতে পারি না, এবং আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল মনে করি। তোমার গোষ্ঠীর সুরক্ষা না থাকলে, আমরা তোমাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতাম। আমরা তোমাকে পছন্দ করি না।'(-১২৫)

কুরাইশরা একবার বানু হাশিম গোষ্ঠীর প্রধান, পয়গম্বরের কাকা আবু তালিবের কাছে দাবি পেশ করে যে, তিনি যেন তাঁর ভাইপোকে গোষ্ঠী থেকে বহিষ্কার করেন। তাহলেই তারা পয়গম্বরকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। আবু তালিবের প্রতি সম্মান তাদের এই পদক্ষেপ নিতে বাধা দেয়। কুরাইশদের নির্দেশে আবু তালিব যখন তাঁর ভাইপোকে তাদের দেবতাদের সমালোচনা বন্ধ করতে বলেন, তখন পয়গম্বর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন যে তাঁর কাকা তাঁকে কুরাইশদের হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু আবু তালিব তৎক্ষণাৎ তাঁর ভাইপোর মন থেকে এই ভয় দূর করেন। "ঈশ্বরের শপথ, আমি তোমাকে কখনো কারো কাছে হস্তান্তর করব না," তিনি তাঁকে বললেন।(-১২৬)

সব কিছু ব্যর্থ হওয়ার পরে, পয়গম্বরের কর্মকাণ্ডের সপ্তম বছরে কুরাইশরা বানু হাশিমদের ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয়। আবু তালিব তাঁর ভাইপো এবং তাঁর পরিবারের সব সদস্যকে মক্কা থেকে নিয়ে যান এবং তাঁরা আবু তালিবের নামে পরিচিত একটি গিরিখাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কয়েকটি বুনো গাছ ছাড়া এই পাহাড়ি গিরিখাতে কিছুই ছিল না। তিন বছর ধরে আবু তালিবের পরিবার এইসব গাছের পাতা ও শিকড়ের উপর জীবন নির্বাহ করে বেঁচে ছিল। তাদের একমাত্র অবকাশ ছিল পবিত্র চারটি মাসে, যখন বানু হাশিমরা মক্কায় আসত। তারা পশু কুরবাণি দিয়ে ফিরে যেত এবং সেই শুকনো মাংসের রসদেই আবু তালিবের পরিবার কয়েক মাস বেঁচে থাকত।

তিন বছর পর, পয়গম্বরের কর্মকাণ্ডের দশম বছরে, কুরাইশরা নিজেদের মধ্যে তাঁকে বহিষ্কারের যে চুক্তি করেছিল সেই চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। বানু হাশিমরা তখন মক্কায় ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু আবু তালিবের জন্য এই নির্বাসিত সময়ের চাপ খুব বেশি হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি সেই বছরে (৬২০ খ্রিস্টাব্দ) মারা যান। আবু লাহাব নামে পরিচিত 'আব্দ আল-'উজ্জা, বানু হাশিমদের প্রধান হন। তিনি পয়গম্বরের কট্টর বিরোধী ছিলেন, এবং আবু তালিব যে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি তা তিনি দ্রুত নিয়েছিলেন; তিনি পয়গম্বরকে তাঁর গোষ্ঠী থেকে বহিষ্কার করেছিলেন।

ছ. বিতাড়ন

তখনকার দিনে একজন আরবকে তার গোষ্ঠী থেকে বহিষ্কার করার অর্থ ছিল, যেন নেকড়েদের দল থেকে একটি নেকড়েকে বের করে দেওয়া। সেই দিনগুলিতে নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য কোনো সরকার দায়িত্বে ছিল না। সেখানে শুধুমাত্র উপজাতীয় ব্যবস্থা ছিল, এবং একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র একটি উপজাতির সুরক্ষায় বসবাস করতে পারত। মিনাতে অবস্থানকালে তীর্থযাত্রীদের তাঁবুতে পয়গম্বর একবার একটি বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। তবুও, তাদের একজন, মায়সিরাহ্ ইবন মাসরুক আল'-আব্বাসি, বলতে বাধ্য হয়েছিল, পয়গম্বরের কথা তার উপর প্রভাব ফেলেছিল। ইবন কাসির ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে মায়সিরাহ্ সম্পর্কে পয়গম্বরের আশা জাগ্রত হয়েছিল। "আপনি কত ভালো কথা বলেছেন, এবং আপনার কথাগুলি কত জ্ঞানদায়ক। কিন্তু আমার গোষ্ঠী আমার সঙ্গে একমত নয়, এবং কেউ নিজের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যেতে পারে না।(-১২৭) একজন ব্যক্তির কাছে তার উপজাতি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাহলে তখন একজনের পক্ষে গোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত হওয়াটা কতই না গুরুতর ব্যাপার ছিল!

পয়গম্বরের এখন নিজের দেশে যাওয়ার মতো জায়গা ছিল না। অন্য কোনো গোষ্ঠীর সুরক্ষা চাওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় ছিল না। তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা ছিল তা'ইফ যাত্রা। পরে তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশাকে পুরো ঘটনাটি ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, তিনি "ইবন 'আবদ ইয়ালিলের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন।" 'উরওয়াহ ইবন জুবায়েরের ভাষায়, "যখন আবু তালিব মারা গেলেন এবং পয়গম্বরের দুঃখ-কষ্ট আরও তীব্র হয়ে উঠল, তখন তিনি এই আশায় সাকিফ গোষ্ঠীর কাছে গেলেন এই আশায় যে তাঁরা তাকে আশ্রয় ও সমর্থন দেবে। "-(১২৮) কিন্তু পয়গম্বর তাদের কাছে কী পরিমাণ খারাপ ব্যবহার পেয়েছিলেন, তা মক্কায় ফেরার পরে তাঁর এই প্রার্থনা থেকে বোঝা যায়;

"প্রভু, আমি আমার দুর্বলতা এবং অসহায়তার জন্য আপনার কাছে অভিযোগ করছি। হে পরম করুণাময়, আমি কত দুর্বল!"(-১২৯)

মক্কায় ফিরে আসার পর, পয়গম্বর মন্তব্য করেছিলেন যে, তা'ইফে তাঁর

সঙ্গে কী হয়েছিল, তা ভাগ্যিস মক্কার লোকেরা শোনেনি। যদি তারা শুনে থাকত, তবে তাদের আটকে রাখা মুশকিল হতো।(-১৩০) পয়গম্বর শহরের মধ্যে বসবাস করতে পারতেন না, তিনি বাইরেই থেকে গেলেন, এবং তাঁকে তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষায় নিতে অনুরোধ করে বিভিন্ন লোকের কাছে বার্তা পাঠাতে থাকলেন, যাতে তিনি শহরে ফিরে যেতে পারেন। অবশেষে মুত'ইম ইবন 'আদি নামক এক ব্যক্তি হজরত মুহাম্মদ(স.)-কে সুরক্ষা দিতে সম্মত হন; মুত'ইমের ছেলেরা ঢাল হয়ে দাঁড়ালে তিনি শহরের ভেতর প্রবেশ করতে পারেন।

তখনকার দিনে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত মেলায় সারা আরবের বিভিন্ন উপজাতিরা অংশগ্রহণ করত। পয়গম্বর সেখানে যেতেন এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলতেন, এই আশায় যে তাদের মধ্যে অন্তত একজনও তাঁকে সুরক্ষা দিতে রাজি হবে। তিনি তাঁর কাকা 'আব্বাসকে তাঁর দুর্দশার কথা জানান। তিনি তাঁকে বললেন, "আমি এখানে আপনার এবং আপনার আত্মীয়দের সঙ্গে নিরাপদ নই। আপনি কি আমাকে আগামীকাল মেলায় নিয়ে যাবেন, যাতে আমরা তাঁবুতে থাকা মানুষজনের সঙ্গে দেখা করতে পারি এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি?(-১৩১)

পয়গম্বর তখন লোকেদের তাঁবুতে যেতেন এবং তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, তারা তাঁকে কী সুরক্ষা দিতে পারে। তিনি তাদের বলতেন যে, তাঁর লোকেরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাদের থেকে তাঁকে বহিষ্কার করেছে। "আমাকে আশ্রয় দিন এবং আমাকে নিরাপত্তা দিন, যাতে আমি সেই বিশ্বাস প্রচার করতে পারি, যা ঈশ্বর আমাকে প্রকাশ করেছেন।" ইতিহাসবিদেরা পনেরোটি গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করেছেন যাদের কাছে পয়গম্বর ব্যক্তিগতভাবে গিয়েছিলেন, ফল হয়েছিল শুধুমাত্র একের পর এক প্রত্যাখ্যান। কোনো ব্যক্তি অন্য একটি গোষ্ঠীর আশ্রয় প্রার্থনা করছে এবং তার অনুরোধটি মঞ্জুর করা হচ্ছে না, এটি একটি লজ্জাজনক ও অসম্মানের বিষয় হিসাবে বিবেচিত হতো। পয়গম্বরের ক্ষেত্রে আরব ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে একজন ব্যক্তি একটি গোষ্ঠীতে আশ্রয় পাওয়ার সন্ধানে কয়েক বছর ব্যয় করেছেন, তবুও কেউ এই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিল না। যখন কোনো এক গোষ্ঠীর একটি দল পয়গম্বরের প্রতি করুণায় আনত

হয়েছিল, তখন তাদের একজন প্রবীণ তাদের তিরস্কার করেছিলেন: “তার নিজের গোষ্ঠী তাকে বহিষ্কার করেছে। এখন আপনারা তাকে সুরক্ষা দিতে চান। আপনারা কী করতে চান? আপনারা কি সমগ্র আরব জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন?”(-১৩২) তিনি জানতেন যে কোনো গোষ্ঠীর দ্বারা বহিষ্কৃত কোনো ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়ার অর্থ সেই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

কুরাইশরা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল এবং তারাই সমগ্র আরব উপদ্বীপের অধিপতি ছিল। তাদের দ্বারা বহিষ্কৃত একজনকে আশ্রয় প্রদানের অর্থ ছিল প্রতিটি আরব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। তারা কুরাইশদের তাদের নেতা তথা পবিত্র কা’বাহ-র অভিভাবক হিসাবে দেখত। সেজন্যই, আনসাররা যখন পয়গম্বরের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিচ্ছিল, তখন আবু’ল হাইসাম ইবন আল-তাইয়িহান তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন: “যদি তোমরা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাও, তাহলে সমগ্র আরব জাতি একযোগে তোমাদের উপর চড়াও হবে।”(-১৩৩)

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সীমান্তের আরব উপজাতিগুলি, যারা প্রতিবেশী বিদেশি শক্তির সঙ্গে চুক্তি করেছিল। পয়গম্বরের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিত্বকে সঙ্গে নেওয়ার পরিণতি সম্পর্কে এই গোষ্ঠীগুলির আশঙ্কা ছিল। ইবন কাসির ‘আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ’-তে ব্যাখ্যা করেছেন, পয়গম্বর একবার মক্কায় বানু শায়বান ইবন সা’লাবা গোষ্ঠীর তাঁবুতে গিয়েছিলেন এবং তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁরা পয়গম্বরের কথায় মুগ্ধ হয়েছিল কিন্তু অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয় যে, পারস্যের সীমান্তে তাদের অবস্থান, পয়গম্বরের দায়িত্ব নেওয়া তাদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। তাদের মুখপাত্র হিসাবে, হানি ইবন কুবাইসাহ মনে করিয়ে দেন, তারা পারস্য সম্রাটের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ এবং “এটা খুবই সম্ভব যে রাজারা আপনার প্রচারিত বার্তার প্রতি সদয় হবেন না।”-১৩৪

পয়গম্বর এমন একটি উপজাতি খুঁজে পেতে মরিয়া ছিলেন যারা তাঁকে সুরক্ষা দিতে পারে, কারণ তাঁর কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য অন্য কোনো উপায় ছিল না। একবার তিনি একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, যা বানু আবদুল্লাহ নামে পরিচিত ছিল। পয়গম্বর যথারীতি তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করার পর তারা তাঁকে আশ্রয় দেবে এই আশায় নিজেকে তাদের

কাছে উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন: "বানু আবদুল্লাহ, কি সুন্দর নাম ছিল তোমাদের পূর্বপুরুষের।" কিন্তু তাঁর সুস্পষ্ট শুভেচ্ছা তাদের স্পর্শ করেনি এবং তারা তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল।(-১৩৫)

মক্কায় পয়গম্বরের সময়কালের শেষ তিনটি বছর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে একটি আশ্রয়ের সন্ধানে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, সে সময় একটি গোষ্ঠীও তাঁকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। তিনি যাদের কাছে যেতেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে কটূক্তি করতেন এবং বলতেন, "আপনার কি এখনও আমাদের থেকে কোনো আশা আছে?" অবশেষে ঈশ্বর মদিনার অ'ওস ও খাজরাজ গোষ্ঠীকে পয়গম্বরের প্রতি তাদের সমর্থন প্রসারিত করার জন্য সাহস দেন। তাদের সিদ্ধান্তের একটি বিশেষ, মনস্তাত্ত্বিক কারণও ছিল। তাদের আশেপাশে ইহুদি উপজাতি বাস করত, বিশেষ করে খায়বারের ইহুদিরা, যারা এই অঞ্চলের সবচেয়ে উর্বর জমির অধিকারী ছিল এবং সেইসঙ্গে এই অঞ্চলের বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রকও ছিল। এই ইহুদিরা আ'ওস ও খাজরাজের অনেক মানুষকে চাকরি দিয়েছিল, কিন্তু সেই কাজ এতই কঠিন এবং বেতন এতই অপর্যাপ্ত ছিল যে এটি তাদের জন্য দাসত্বের মতো ছিল। (এ ব্যাপারে পয়গম্বর উল্লেখ করেছেন, মদিনায় চলে যাওয়ার পর, তাঁর সহযোগীরা যাতে নিজের হাতে পয়গম্বরের মসজিদ নির্মাণ করে, তিনি তা নিশ্চিত করেছিলেন। ইবন কাসিরের মতে, পয়গম্বর মন্তব্য করেছিলেন যে "এটি খায়বারের শ্রম নয়; এটি অনেক বেশি মূল্যবান এবং সৎ কাজ।") ইহুদিদের অর্থনৈতিক আধিপত্য এবং মদিনার গোষ্ঠীগুলিকে তাদের শোষণের প্রেক্ষিতে, ইহুদি এবং আ'ওস ও খাজরাজ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। ইহুদিরা এই গোষ্ঠীগুলিকে বিদ্রূপ করে বলত যে, আরবদের মধ্যে শীঘ্রই একজন পয়গম্বর আসবেন এবং তিনি যখন আসবেন তখন তারা তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন এবং আ'ওস ও খাজরাজ গোষ্ঠীগুলিকে তারা সমূলে ধ্বংস করে দেবেন।

যখন আ'ওস ও খাজরাজ গোষ্ঠী দুটি হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর শিক্ষা গ্রহণ করল, তখন তারা তাঁকে পয়গম্বর হিসাবে বুঝতে পারল (যে পয়গম্বর বিষয়ে ইহুদিরা তাদের ঠাট্টা করেছিল) এবং ইহুদিরা তাঁকে গ্রহণ করার আগেই, তারা তড়িঘড়ি তাঁকে গ্রহণ করেছিল। অবশ্য এর অন্যান্য ঐতিহাসিক কারণও ছিল; আ'ওস ও খাজরাজের জন্য পয়গম্বরের আনীত বাণী অনুধাবন করা

এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তাই, তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ নেওয়ার আগে তারা খুব বেশি চিন্তাভাবনা করেনি।

সুতরাং সেই সময়, যার জন্য পয়গম্বর বছরের পর বছর অপেক্ষা করছিলেন, অবশেষে এল। তিনি এমন একটি স্থান খুঁজে পেয়েছিলেন যেখানে, উপজাতীয় সুরক্ষার অধীনে কার্যকরভাবে তিনি তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন। মক্কা ও আশেপাশের অঞ্চলের মুসলমানরা এখন একটি কেন্দ্রে একত্রিত হতে পারবে। মদিনার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত সম্পদকে এক জায়গায় একত্রিত করা সহজ হয়েছিল এবং ইসলামি উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তা আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আ'ওস ও খাজরাজ গোষ্ঠী দুটি আনুগত্যের শপথ নিলে পয়গম্বর দ্রুত অনুগামীদের কাছে ফিরে আসেন। "ঈশ্বরের প্রশংসা করুন" তিনি তাঁদের বললেন, "কারণ আজ রাবি'য়াহ-র বংশধররা পারসিকদের প্রায় পরাস্ত করে ফেলেছে।"-(১৩৬) পয়গম্বর দেখলেন, আনসাররা মুসলমানদের আশ্রয় দেওয়ার ফলে ইসলাম অনেক শক্তিশালী হয়েছে। তিনি অনুভব করলেন, মুসলমানদের পরাক্রমশালী পারস্য জয় করা কিছু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

পয়গম্বর মদিনায় চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। আ'ওস ও খাজরাজ গোষ্ঠী ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তিনি আর ছয় মাস সময় নিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারপরও মূর্তিপূজক কুরাইশরা, তাঁর চলে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছিল। মদিনায় যে তাঁকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল এবং আনসাররা তাঁকে যে সুরক্ষা দিয়েছিল, সে সম্পর্কে তারা আগেই শুনেছিল। আনসাররা যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাও তাদের নজরে আসে এবং তারা এ-ও জানতে পারে যে, মুসলমানরা মদিনায় জড়ো হচ্ছে। হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা তাঁর প্রস্থানের মুহূর্তে তাঁকে বন্দি করবে, এবং হয় তাঁকে হত্যা করবে অথবা তাঁকে আটকে রাখবে।(-১৩৭) কিন্তু তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। কারণ ইতিমধ্যে পয়গম্বর তাঁর সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেন, এবং অতি সন্তর্পণে তিনি নিজের নতুন আবাসে চলে যেতে সফল হন।

১১. মদিনায় ইসলামের আগমন

ইসলামের আগমনের পূর্বে মদিনা শহরটি ইয়াথরিব নামে পরিচিত ছিল। সেখানে আ'ওস ও খাজরাজ — এই দুটি প্রধান গোষ্ঠী ছাড়াও কিছু ইহুদি উপজাতি বাস করত, যারা বিভাজন ও আধিপত্যের নীতি অনুসরণ করে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের প্রধান চেষ্টা ছিল তাদের প্রতিবেশী আরবদের দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন রাখা। পয়গম্বরের মদিনায় আসার মাত্র পাঁচ বছর আগে, ইহুদিদের প্ররোচনায় খাজরাজ আ'ওসের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আবু'ল বায়সার আনাস ইবন রাফি' নামে এক আ'ওস সর্দার তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ কুরাইশদের কাছ থেকে সাহায্যের জন্য মক্কায় গিয়েছিলেন। তাদের আগমনের কথা শুনে পয়গম্বর তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

তাদের সঙ্গীদের একজন, আয়াস ইবন মু'আজ নামে এক যুবক, পয়গম্বরের কথায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সহযোগীদের বললেন যে, তাঁরা যে উপলক্ষে মক্কায় এসেছিলেন, তার চেয়ে এটি আরও অনেক ভালো বিষয়, কিন্তু তাঁরা রাজি হননি। আবুল বায়সার ঘৃণাভরে আয়াসের মুখে কিছু মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং তাঁকে বললেন মুহাম্মদ(স.) যা বলেছিলেন তা ভুলে যেতে; কারণ তাঁদের নিজস্ব অন্য অনেক কাজ আছে।

আ'ওস প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ না করেই ফিরে আসে। এর পরপরই আ'ওস ও খাজরাজের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয় যা বু'আথ নামে পরিচিত। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে তারা একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। এই যুদ্ধে প্রথমে খাজরাজ গোষ্ঠী জয়ী হয়। তারপর আবু উসাইদের নেতৃত্বে আ'ওসরা খাজরাজদের পরাজিত করে। তারা একে অপরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে, এমনকি ঘরবাড়ি ও বাগান পুড়িয়ে দেয়। এভাবে আরবরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে নিজেদের দুর্বল করে ফেলে।

এই যুদ্ধে ইহুদিরা উপকৃত হয়েছিল এবং মদিনায় তাদের আধিপত্য আরও সুসংহত হয়েছিল। পরিস্থিতি ঠান্ডা হলে, আ'ওস ও খাজরাজ উভয় গোষ্ঠীর দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা একটি গুরুতর ভুল করেছেন। তাঁরা নিজেদেরকে তাঁদের শত্রুদের হাতের খেলনা করে দিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের দুর্বল ও ইহুদিদের শক্তিশালী করেছিলেন। উভয় গোষ্ঠীর অনেকেই এই পরিস্থিতি সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তবে তা তখনই সম্ভব, যদি উভয়েই ক্ষমা করতে এবং ভুলে যেতে সম্মত হয়। পুনর্মিলনের সর্বোত্তম উপায় ছিল শান্তি প্রক্রিয়া সমন্বয়ের জন্য একজন রাজাকে নিয়োগ করা। খাজরাজ গোষ্ঠীর একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই এই কাজের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঠিক এই সময়ে কিছু খাজরাজী তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। সেখানে তাঁরা হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাঁদের বলেছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁকে সত্য ধর্মের সঙ্গে পাঠিয়েছেন, এবং তিনি তাঁদেরকে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পয়গম্বরের কথা তাঁদের মনে বেজে উঠল। তাঁদের মনে পড়ল, ইহুদিরা তাঁদের বিদ্রূপ করে বলত যে, শীঘ্রই একজন পয়গম্বর আসবেন যিনি সর্বত্র রাজত্ব করবেন। ইহুদিরা তাঁর আগমনের প্রতিশ্রুতিতে আনন্দ করত, কারণ, তারা আরবদের চিরতরে পরাজিত করার জন্য তাঁর বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। মদিনাবাসীরা বুঝতে পেরেছিল যে, ইহুদিরা তাদের যে পয়গম্বরের কথা বলেছিল, ইনিই তিনি। ইহুদিরা তাঁকে গ্রহণ করার আগে মদিনাবাসীদের জন্য তাঁকে গ্রহণ করার এটা ছিল একটি সুবর্ণ সুযোগ।

তাই, পয়গম্বরের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস প্রকাশ করে, তাঁরা তাঁকে বললেন "আমরা আমাদের লোকদের পিছনে ফেলে এসেছি। আর কোনো জাতি নেই যারা তাদের মতো শত্রুতা ও কোন্দল দ্বারা দীর্ণ হয়। সম্ভবত ঈশ্বর আপনার মাধ্যমে তাদের একত্রিত করবেন। আমরা তাদের কাছে ফিরে যাব এবং আমরা যে ধর্মকে মেনে নিয়েছি সেই বিষয়ে তাদের বলব। এই ধর্মবিশ্বাসে যদি আমাদের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে এই দেশে আপনার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ থাকবে না।"(-১৩৮)

অতঃপর মদিনাবাসীরা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করে। তারা

ইসলামের আনসার বা সাহায্যকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ইসলামকে তারা নিঃস্বার্থ সমর্থন দিয়েছিল, যার ফলে পয়গম্বরের ধর্ম আরবে আধিপত্য অর্জন করতে সক্ষম করেছিল।

পয়গম্বরের মদিনায় আসার পাঁচ বছর আগে, সেই শহরের লোকেরা তাঁর বাণী সম্পর্কে কোনো ভাবনাচিন্তাই করেনি এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। অথচ মাত্র পাঁচ বছর পর সেই একই লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। এর কারণ, তারা যখন প্রথম পয়গম্বরের সঙ্গে দেখা করেছিল তখন তারা সামরিক বিবেচনায় ব্যস্ত ছিল; তখন তারা তাদের শত্রুদের দমন করা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিল না। এর অর্থ হল আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো বিবেচনা করার জন্য তাদের কাছে সময় ছিল না। ঈশ্বর এবং মৃত্যুর পরের জীবন তাদের কাছে বহিরাগত বিষয় হিসাবে দেখা দিয়েছিল, যা তাদের আসল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করত।

আ'ওস ও খাজরাজ গোষ্ঠী দুটি তাদের সমস্ত সম্পদ বু'আথের যুদ্ধে ঢেলে দিয়েছিল। বিনিময়ে তারা যা পেয়েছিল, তা ছিল আত্ম-ধ্বংস। দুটি গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ সন্দেহের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হয়েছিল যেন ইহুদিরা সব ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে বাধ্য করবে। এই চিন্তাগুলি তাদের মনোভাব পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। তারা যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি, গৃহযুদ্ধের পরিবর্তে ঐক্যের কথা ভাবতে শুরু করে। তারা তাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করে। তারা দেখতে পেল যে, সমস্যাটি একদিকে আরব গোষ্ঠীর আ'ওস ও খাজরাজের মধ্যে এবং অন্যদিকে এই দুই গোষ্ঠীও ইহুদিদের মধ্যে। আ'ওস ও খাজরাজ গোষ্ঠী দুটি যদি এক মঞ্চে একত্রিত হতে পারে তবে তারা ইহুদিদের সামনে একটি ঐক্যফ্রন্ট উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে। গোষ্ঠী সংঘর্ষের ক্ষত সারাতে এবং দুটি উপজাতির মধ্যে পার্থক্য মিটিয়ে আনতে তাদের একটি ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাস প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায়, যদি তারা উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য নেতা খুঁজে পায়, তবে তিনি পুনর্মিলনের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারবেন। হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর মধ্যে, তারা তাদের প্রয়োজনীয় নেতা এবং বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছিল। তারা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করতে ছুটে গেল।

বু'আথের যুদ্ধ থেকে ইসলামই পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছিল, কারণ এটি আ'ওস ও খাজরাজ গোষ্ঠী দুটিকে যুদ্ধের অসারতা উপলব্ধি করতে এবং

নিজেদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারা ইসলামের মধ্যে এই শান্তি খুঁজে পেয়েছিল এবং তারা পয়গম্বরের সাহায্যকারী হিসাবে একে অপরের সঙ্গে একত্রিত হয়েছিল। “বু’আথের যুদ্ধ”, আয়েশা(রা.) একবার বলেছিলেন, “একটি যুদ্ধ যা ঈশ্বর তাঁর পয়গম্বরের জনসমর্থনের ভিত্তি তৈরি করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন।”

১২. অভিবাসন — মক্কা থেকে মদিনায়

মক্কা থেকে মদিনায় পয়গম্বরের অভিবাসন ছিল ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ কারণেই অনুগামীরা এই ঘটনাকে ইসলামি ক্যালেন্ডারের সুচনাবিন্দু হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু মক্কাত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য বোঝার জন্য, ইতিহাসের দর্পণে বছরের পর বছর ধরে জমতে থাকা কিংবদন্তি এবং রূপকথার গল্পগাথার ধুলোটা আগে মোছা প্রয়োজন।

মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার পথে স'ওর গুহায় পয়গম্বরের অবস্থান নিয়ে এমনই একটি কল্প কাহিনী জনমানসে বহুল প্রচলিত। কুরাইশরা গোড়া থেকেই তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিল এবং তাদের রোষ থেকে নিজেকে আড়াল করার জনাই মুহাম্মদ(স.) গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। লোকশ্রুতি আছে যে, পয়গম্বরের প্রবেশের পর, ঈশ্বর একটি মাকড়সাকে গুহার দরজায় একটি জাল বুনতে নির্দেশ দেন। তারপর তিনি একটি ঘুঘুকে ঐ জালের উপরে একটি ডিম পাড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে এই ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে গুহাটি জনমানবহীন ছিল। কিন্তু এই ধরণের কাহিনীর মাধ্যমে, পয়গম্বরের মদিনায় আসার ঘটনাগুলিকে ঐতিহাসিক স্বীকৃতির বদলে অতিরঞ্জিত ও বিকৃত করা হয়েছে। আসলে ঠিক কী ঘটেছিল তার প্রকৃত বিবরণ থেকেই স্পষ্ট।

ঐতিহাসিক ইবন কাসির উল্লেখ করেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের ভিত্তিতে ঘটনাগুলির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন ইমাম আহমাদ। বর্ণনাটি অনুরূপ:

'তারা (কুরাইশরা) পয়গম্বরকে ধাওয়া করে তার পিছু নিয়েছিল; কিন্তু যখন তারা পাহাড়ে পৌঁছাল, তখন তারা তাঁর কোনো চিহ্ন খুঁজে পেল না। তারপর তারা পাহাড়ে উঠল এবং একটি গুহার পাশ দিয়ে গেল। গুহার মুখে

মাকড়সার জাল দেখে তাদের মধ্যে একজন বলল, “তিনি যদি এই গুহায় প্রবেশ করতেন, তাহলে মাকড়সার জাল অক্ষত থাকত না।”(-১৩৯)

তারা যে গুহাটি দেখেছিল, সেটি সওর গুহা ছিল কিনা তা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। এমনকি যদি আমরা স্বীকার করি যে সেই গুহাটিই ছিল, তবে এই বিবরণ থেকে যা পরিষ্কার হয় তা হ’ল, তারা একটি গুহার মুখে একটি মাকড়সার জাল দেখেছিল। পয়গম্বরের প্রবেশের পর ঈশ্বর একটি মাকড়সাকে একটি জাল বুনতে আদেশ দিয়েছিলেন, বা তিনি জালের উপরে একটি ঘুঘুকে ডিম পাড়তে বলেছিলেন, তার কোনো উল্লেখ নেই। এই ধরণের সংযোজন কল্পনাপ্রসূত।

এই ধরণের প্রক্ষেপের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল এগুলো মানুষের মনোযোগকে একটি চমৎকার কষ্টকল্পিত গল্পের দিকে সরিয়ে দেয় এবং ঘটনার মূল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে, বাস্তব বিবরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য গল্পের দিকে নজর ঘুরিয়ে দেয়।

ক.অভিবাসীদের আপন করে নেওয়া

মদিনার গোষ্ঠীগুলি পয়গম্বরকে যেভাবে সাহায্য করেছিল, তা ইতিহাসের অন্যতম অসাধারণ ঘটনা। তাঁদের সহায়তার কারণেই তাঁরা ‘আনসার’, অর্থাৎ সাহায্যকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। সাধারণত মানুষ যখন কাউকে কিছু দেয়, সেটি হয় কোনো আনুকূল্যের বিনিময়ে, অথবা কারো কৃতজ্ঞতা অর্জন করার জন্য। এমন কিছু মানুষ আছে যারা ‘ধার্মিক’ মানুষদের উপহার বা নৈবেদ্য তুলে দেয়, কারণ তারা মনে করে যে এটি করার ফলে তাদের পরিবার এবং সম্পদের উপর আশীর্বাদ নেমে আসবে। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষিতে পয়গম্বরের অভিবাসন সম্ভবত একমাত্র উদাহরণ যেখানে লোকেরা নিঃস্ব ও অসহায় উদ্বাস্তুদের জন্য তাদের দরজা খুলে দিয়েছিল, অথচ তাদের নিজেদের পাওয়ার কিছুই ছিল না, বরং এই দয়াশীলতার জন্য তাদের নিজেদের অনেক কিছুই হারাতে হয়েছিল। আনসারদের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে ইসলামের উদ্দেশ্যে তাদের নিবেদিত অঙ্গীকারের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তারা অভিবাসীদের তাদের বাড়িতে শুধু থাকার ব্যবস্থাই করেনি, তারা তাদের সঙ্গে ভাই ও বোনের মতো আচরণ করত এবং তাদের সম্পদ তাদের সঙ্গে ভাগ

করেও নিত। তারা এই সব করেছে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই যে, তাদের এই কর্মের সঙ্গে অর্থনৈতিক ত্যাগের চেয়েও আরও অনেক বিষয় জড়িত। তারা ভালো করেই জানত যে, তারা যা করছে তা আরব ও পারস্য উভয় দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী দলগুলোর শত্রুতা জাগিয়ে তুলবে। তাদের বর্ণনা করার জন্য 'আলির কথার চেয়ে উপযুক্ত আর কোনো কথা নেই; "তারা তাদের কথার প্রতি সৎ, প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা অবিচল ছিল।(-১৪০)

মুহাজিররা যখন নিজেদের দেশ ত্যাগ করে মদিনা এলেন, তখন প্রত্যেক আনসার তাদের আতিথেয়তা দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এমনকি এই ধরণের মহৎ অতিথিদের আপ্যায়ন করার সুযোগ পাওয়ার জন্য তাঁরা নিজেদের মধ্যে লটারি করতেন। তাঁরা তাঁদের সম্পত্তির সেরা অংশটি পর্যন্ত মুহাজিরদের হাতে তুলে দেন। তাঁরা এই সব করতেন এটা জেনে যে, তাঁরা যে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন, তাতে বিশেষভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল যে তাঁদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যদিও তাঁরা ইসলামের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তবুও তাঁরা এর প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তোষ দেখাননি।(-১৪১)

অনেক সহায়তা অর্জন করা সত্ত্বেও মদিনায় পয়গম্বরের জীবন সহজ ছিল না। সমগ্র আরব মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে এমন আশঙ্কা খুবই সত্য প্রমাণিত হল। পয়গম্বরের সহযোগী উবাই ইবন কা'ব এইভাবে পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন: 'পয়গম্বর ও তাঁর সহযোগীরা মদিনায় আগমন করলে এবং আনসাররা তাদের আশ্রয় দিলে আরবরা তাদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয় এবং মুসলমানরা দিনে এবং রাতে, সবসময় রণসাজে সজ্জিত থাকত।'(-১৪২)

কুরাইশরা মদিনার জনগণের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করে। কুরাইশদের নেতৃত্বে সমস্ত আরব গোষ্ঠীগুলি, মদিনা শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে। মদিনার যথেষ্ট বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদের অভাব ছিল এবং শহর রক্ষার ব্যয় তার অর্থনীতিকে দূর্বলতার দিকে ঠেলে দেয়। 'উমর বলেন, পয়গম্বর সারাদিন মদিনায় অনাহারে অস্থির ছিলেন। পেট ভরে খাওয়ার জন্য তাঁর পর্যাপ্ত শুকনো খাবার ছিল না। পরবর্তী বছরগুলিতে কেউ একজন আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, তাঁদের একটি লণ্ঠন আছে কিনা। "আমাদের যদি লণ্ঠন জ্বালানোর তেল থাকত", আয়েশা বললেন, "আমরা তাহলে সেই তেল পান করতাম।" মুসলমানরা খুব সামান্য

ব্যবস্থা নিয়ে অভিযানে বের হতেন। আবু মুসা পয়গম্বরের সঙ্গে তাঁর একটি অভিযানের কথা বলেন। "আমাদের ছয়জনের মধ্যে একটি মাত্র উট ছিল। আমরা তাতে পালা করে চড়তাম। অত্যধিক হাঁটার ফলে আমাদের পায়ের চামড়া উঠতে শুরু করে এবং আমরা সেগুলিকে কাপড় দিয়ে বেঁধে দিতাম। সে কারণেই এই অভিযানটি ধাত আল-রিকা (রিকা অর্থাৎ কাপড় বা পট্টি) নামে পরিচিতি পায়। খাবারের সংস্থান এত কম ছিল যে মানুষ খেজুর একবারে না চিবিয়ে, চুষত। বাবলা পাতা এবং পম্পাল তাদের খাদ্যের বাকিটা সরবরাহ করতো। এর পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনের সাথেও মুহাজিরদের অভ্যস্ত হতে হয়েছিল।

মক্কায় প্রধান খাদ্য ছিল মাংস ও দুধ, এবং মদিনায় খেজুর ছিল তাদের খাদ্যের প্রধান অংশ। তাবারানি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন — এক জুম্মার দিনে পয়গম্বর যখন নামাজ পড়তে আসেন, সেদিন ঘটনাটি ঘটে। একজন মক্কার মুসলমান তাঁকে ডেকে বললেন: "ঈশ্বরের পয়গম্বর, এই খেজুরগুলো আমাদের অন্ত্র (নাড়িভুড়ি) পুড়িয়ে দিয়েছে।"(-১৪৩)

মদিনায় হিজরত ইসলামের ইতিহাসে একটি চরম মুহূর্ত। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সময় ইসলাম 'শুধুমাত্র প্রচারমূলক' পর্ব থেকে বেরিয়ে 'সক্রিয় সংগ্রামে'র পর্বে প্রবেশ করে। যে সময়কালে তিনি কেবল প্রচারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেই সময় পয়গম্বর একটি কঠোর নিয়মনীতি অনুসারে কাজ করতেন। তিনি সমস্ত বিতর্কিত বিষয়গুলি থেকে দূরে থাকতেন এবং স্বর্গের আনন্দের সুসংবাদ এবং নরকের শাস্তির সতর্কবার্তা প্রদানে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতেন। তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও গোষ্ঠী রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা এড়িয়ে যেতেন। তিনি যখন 'উকাযের মেলায় বানু আমির ইবন সা'সা'আহ গোষ্ঠীর কাছে ইসলামের বাণী প্রচার করেন, তখন তিনি তাদের এই বলে আশ্বস্ত করেন যে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর প্রচার কাজ চালিয়ে যাবেন; তিনি কোনো বহিরাগত সমস্যা উত্থাপন করবেন না। তিনি বললেন, 'আমি ঈশ্বরের পয়গম্বর। যদি আমি তোমাদের মধ্যে আসি, তাহলে কি তোমরা আমাকে রক্ষা করবে, যাতে আমি আমার বার্তা প্রচারের কাজটি চালিয়ে যেতে পারি? আমি কোনো বিষয়ে তোমাদের জোর করব না।"(-১৪৪)

মদিনায়, ধর্মপ্রচার ছিল পয়গম্বরের মিশনের মূল উদ্দেশ্য। তবে এর

পরিধি বিস্তৃত হয়েছিল, এবং এখন ইসলামকে সামাজিক বিষয়গুলোও বিবেচনা করতে হচ্ছিল। সেই সময় পয়গম্বর যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের হৃদয়কে ইসলামের প্রতি নরম করা, যাতে কোনো বিরোধ ছাড়াই তাঁর মিশনের উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। তিনি একবার বলেছিলেন "সম্ভ্রমের অনুভূতি আমাকে সাহায্য করেছে যাতে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি- যেটি এক মাসের যাত্রার সমতুলা"। সাধারণত তাঁর শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের কারণেই তাঁর মিশন সফল হতো।

এই পদ্ধতির দুটি পরিপূরক দিক ছিল: একটি হল ইসলামের বিরোধীদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করা, অন্যটির হল তাদের মধ্যে ভালোবাসার বীজ রোপণ করা। প্রথমটির অর্থ ছিল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে ইসলামের বিরোধীদের এই বার্তা দেওয়া যে তারা এটিকে পরাজিত করতে পারবে না, এবং তাই তাদের জন্য এর অধীনে আসাই শ্রেয়।(-১৪৫)

দ্বিতীয় উপায় ছিল, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের হৃদয় নরম করার লক্ষ্য নিয়ে ইসলাম বিরোধীদের বিভিন্ন উপহার দেওয়া।(-১৪৬) তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য পয়গম্বর যে উদারতা দেখিয়েছিলেন, তার কোনো তুলনা নেই। তাঁর আগে বা পরে কেউই এমন সীমাহীন উদারতা প্রদর্শনের দাবি করতে পারে না। সাফওয়ান ইবন উমাইয়া নামে মক্কার এক অভিজাত ব্যক্তি পাহাড়ের গিরিখাতে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের পর পয়গম্বর তাঁকে সাধারণভাবেই ক্ষমা করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। হাওয়াজিনদেরকে পরাজিত করার পর, পয়গম্বর জি'রানা থেকে অধিগৃহীত সম্পদ বণ্টনের তত্ত্বাবধান করছিলেন। সাফওয়ান ইবন উমাইয়া তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। একটি গলির ধারে দাঁড়িয়ে তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে ছাগল এবং উটের বিশাল পালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। "আবু ওয়াহাব," পয়গম্বর তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি এই সব গবাদি পশু পছন্দ কর?" সাফওয়ান বললেন, হ্যাঁ। "তাহলে এগুলো সব তোমার," পয়গম্বর তাঁকে বললেন। "একজন পয়গম্বর ছাড়া আর কেউ এত উদার হতে পারে না," সাফওয়ান উত্তর দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাক্ষ্য দেন যে, ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউ উপাসনার যোগ্য নেই এবং মুহাম্মদ(স.) তাঁর সেবক ও পয়গম্বর।(-১৪৭)

পয়গম্বরের একাধিক বিবাহও এই নীতির অংশ ছিল। উপজাতীয় ব্যবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্ককে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মদিনায় অভিবাসনের পর তাঁর দ্বারা স্থাপিত বৈবাহিক সম্পর্কগুলির মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়। এই বৈবাহিক সম্পর্কগুলির মাধ্যমে অগণিত মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং তাদের হৃদয় তাঁর মিশনের প্রতি কোমল হয়ে পড়েছিল। পয়গম্বরের প্রথম বিবাহ হয়েছিল তাঁর বয়সের প্রায় দ্বিগুণ বয়সী বিধবা খাদিজার সঙ্গে। এই বিবাহ ব্যতীত, তাঁর অন্য বিবাহগুলো রাজনৈতিক কারণে ও ধর্মপ্রচারের সুবিধার জন্য করা হয়েছিল, যার থেকে ইসলাম প্রচারের কাজে সুবিধা হয়েছিল।

হুদায়বিয়ার শান্তি চুক্তির পরের বছর (৬২৮ খ্রীস্টাব্দ), পয়গম্বর ২০০০ মুসলমানের সঙ্গে পবিত্র কা'বাহ দর্শনে গিয়েছিলেন। মক্কায় তিন দিনের অবস্থানকালে তিনি মায়মুনা বিনতে আল হারিস নামে এক বিধবাকে বিয়ে করেন। তাঁর আট বোন ছিল, এবং তাদের সকলেরই মক্কার বিশিষ্ট সব পরিবারে বিয়ে হয়েছিল। তাঁকে বিয়ে করার মাধ্যমে পয়গম্বর এই আটটি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ ছিলেন মায়মুনার ভাইপো এবং মায়মুনা তাঁকে পুত্র হিসাবে লালন-পালন করেছিলেন। সেই সূত্রে কুরাইশদের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা খালিদ পয়গম্বরের সৎ ছেলে হয়েগেলেন। এর পর খালিদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর কোনো শত্রুতায় যোগ দেননি এবং অচিরেই তিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ করেন। মায়মুনার সঙ্গে তাঁর বিবাহের পর পয়গম্বর মক্কাবাসীদের জন্য একটি বিবাহ সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু কুরাইশরা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, হুদায়বিয়ার চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি কেবলমাত্র তিন দিন মক্কায় থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন। তাঁর সময় শেষ হয়ে গিয়েছে এবং তাঁকে অবিলম্বে শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। বিয়ের সংবর্ধনা, যার লক্ষ্য ছিল তাঁর বিশ্বাসের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা, তা হতে পারেনি। কিন্তু খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ ও 'আমর ইবন আল'-আস একসঙ্গে মুসলমান হয়েছিলেন। তারা যখন মদিনায় এলেন, লোকেরা তখন চিৎকার করে বলেছিল: "এই দুই জনের সাহায্যে, মক্কাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।"

কুরাইশদের একজন বিশিষ্ট সদস্য আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা এবং তার স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবন জাহ্‌শ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আবিসিনিয়ায়

চলে যান। সেখানে অবশ্য হাবিবার স্বামী খ্রিস্টান হন। এর অল্পকাল পরেই তিনি মারা যান। একথা শুনে পয়গম্বর উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করার ব্যবস্থা করলেন। বদরের ময়দানে আবু জাহলের মৃত্যুর পর আবু সুফিয়ান কুরাইশদের সবচেয়ে বড় নেতা হয়ে উঠেছিলেন। এখন পয়গম্বর হবেন তাঁর জামাই। এই বিয়ে সম্পন্ন করতে কিছু কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল, কারণ আশঙ্কা ছিল যে উম্মে হাবিবা মক্কায় ফিরে গেলে তাঁর বাবা এই বিয়ে মেনে নেবেন না। অনুষ্ঠানটি তখন আবিসিনিয়ার রাজা নাজাশি পরিচালনা করেন এবং নববধূ অবিলম্বে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, পয়গম্বরের প্রতি আবু সুফিয়ানের বৈরিতা কমে যায় এবং মক্কা বিজয়ের একদিন আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই নীতির অন্য দিকটি ছিল, ইসলামের শত্রুদের হৃদয়ে 'আতঙ্কের ছাপ ফেলা'। এই নীতি অনুসারে এতখানি শক্তি সংগ্রহ এবং প্রদর্শন করা প্রয়োজন যে, সেই শক্তির কোনো বাস্তব প্রয়োগ প্রয়োজন হবে না, অর্থাৎ সরাসরি যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না। উহুদ (হিজরি সাল ৩)-এর যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় একটি ভয়াবহ দুর্যোগের কারণ হতে পারত যদি আবু সুফিয়ান তাঁর বিজয়ের পরে মক্কায় ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে আর একটি আক্রমণ করতেন।

প্রকৃতপক্ষে, যখন তিনি রুহায় পৌঁছালেন, তখন তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারছিলেন এবং আবারও মুসলমানদের ঘাঁটির দিকে ফিরতে চাইলেন। কিন্তু এই চরম অস্থিরতার সময়েও পয়গম্বরের সংবাদ ও তথ্য ব্যবস্থা কার্যকরভাবে কাজ করছিল। তিনি আবু সুফিয়ানের অভিপ্রায়ের কথা শুনে তিনি নিজেই তাঁর মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বাহিনীকে পুনরায় একত্রিত করে মক্কার দিকে রওনা হলেন। তাঁর সামরিক কৌশলের চরম গোপনীয়তা বজায় রাখার নৈতিক অনুশীলনের বিরুদ্ধে গিয়ে, এই অভিযানকে খুব ধুমধাম প্রচার করা হয়েছিল। মুসলমানরা যখন মদিনা থেকে আট মাইল দূরে হামরা-আল-আসাদে পৌঁছায়, তখন আবু সুফিয়ান এই অভিযানের কথা জানতে পারেন। নতুন শক্তি বৃদ্ধি হয়ে এসেছে এই ভেবে, তিনি মদিনা আক্রমণের আশা ছেড়ে দেন এবং মক্কায় ফিরে আসেন। আবু সুফিয়ানের সৈন্য প্রত্যাহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর পয়গম্বর মদিনায় ফিরে আসেন।

হিজরি সাল ৮-এর জুমাদা আল আউয়াল মাসে সংঘটিত মু'তাহ্ যুদ্ধের

এক বছর পর বাইজান্টাইন সম্রাট সিরিয়ার সীমান্তে তাঁর সেনা সমাবেশ করতে শুরু করেন। ঘাসানীয়রা এই অঞ্চলের অন্যান্য আরবীয় রোমান মিত্র গোষ্ঠীদের সঙ্গে সম্রাটের নেতৃত্ব অনুসরণ করেছিল। জবাবে পয়গম্বর ত্রিশ হাজার সৈন্য সম্বলিত বাহিনী নিয়ে তাবুকের দিকে অগ্রসর হন। তাবুকের অভিযান ছিল সত্যিই একটি সামরিক কৌশল, একটি পূর্ব-পরিকল্পিত অভিযান। উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করা, যাতে তারা ভীত হয় এবং তাদের শত্রুতামূলক উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে। পয়গম্বর যখন তাবুকে পৌঁছান, তখন তিনি শুনতে পান যে সিজার মুসলমানদের সঙ্গে মোলাকাত করার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন না, বরং তাঁর বাহিনীকে সীমান্ত থেকে প্রত্যাহার করতে শুরু করেছেন। এখন যুদ্ধের কোনো প্রশ্নই ছিল না, এবং সিজারের পশ্চাদপসরণ পয়গম্বরকে একটি নৈতিক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যা তিনি তার নিজের রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন।

তাবুকে তাঁর কুড়ি দিনের অবস্থানের সময়, হজরত মুহাম্মদ(স.) প্রতিবেশী আরব উপজাতিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, যারা তখন রোমান প্রভাবাধীন ছিল। দাউমাত আল জান্দালের খ্রিস্টান সর্দার, উকাইদির ইবন আবদ আল মালিক আল কিন্দি, আইলাহ্ থেকে ইউহান্না ইবন রুয়াহ্, এছাড়াও মাকনা, জারবা এবং আজরুহের খ্রিস্টানরা জিজিয়া দিতে সম্মত হন। জিজিয়া হচ্ছে একটি মুসলমান সরকারের সুরক্ষার অধীনে থাকা অমুসলমানদের উপর আরোপিত কর, যা তাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং তাদের অবাধ ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা দেয়।

পয়গম্বরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে উসামার নেতৃত্বের অভিযানের পেছনেও একই কারণ রয়েছে। পয়গম্বরের মৃত্যুর পরে মদিনার গোত্রগুলি ছাড়া সমগ্র আরবজাতি বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিল। হঠাৎ মুসলমানরা তাদের সমস্ত আরব দেশবাসীর সঙ্গে নিজেদের মতানৈক্যের মুখোমুখি হল। অভ্যন্তরীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তখন মদিনার শক্তিকে সংহত রাখাই সমীচীন বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এটা না করে, আবু বকর পয়গম্বরের গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর কাজ করলেন। উসামার অধীনে ৭০০ জন লোকের একটি বাহিনী রোমান সীমান্তে পাঠানো হয়েছিল। আবু হুরায়রা বিদ্রোহী আরব উপজাতিদের উপর এই অভিযানের প্রভাব ব্যাখ্যা করেছেন:

“ উসামার বাহিনী যখন ধর্মত্যাগের দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত গোষ্ঠীগুলিকে অতিক্রম করত, তখন তারা বলাবলি করছিল: ‘যদি মুসলমানদের শক্তির বিশাল ভাণ্ডার না থাকত, তাহলে তারা কখনোই এরকম বাহিনী প্রেরণ করত না। ওদের রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দাও।’ মুসলমানরা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করে, নিরাপদে ফিরে আসে। এটা দেখার পরে, যারা ধর্মত্যাগের কথা ভাবছিল, তারা আরও নিবিড়ভাবে ইসলামে প্রবেশ করে।”(-১৪৮)

পয়গম্বর যখন মদিনায় পৌঁছালেন, তখন সেখানে একটি ক্ষুদ্র মূর্তিপূজক গোষ্ঠী ছাড়াও দুটি প্রধান সম্প্রদায় — ইহুদি ও মুসলমানরা বসবাস করত। এই দুটি সম্প্রদায় আবার কয়েকটি ছোট দলে বিভক্ত ছিল। কেউই একটি ঐক্যবদ্ধ দল গঠন করতে পারে নি। লোকেরা শুধু এমন একজনের জন্য অপেক্ষা করছিল যে তাদের সংগঠিত করবে এবং একত্রিত করবে। যখন পয়গম্বর বুঝতে পারলেন যে মানুষ এটাই চায়, তখন তিনি একটি ফরমান জারি করেন যাতে ইহুদি এবং মুসলমানদের সম্প্রদায় হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। “ইহুদিরা মুসলমানদের মতোই একটি সম্প্রদায়.... তারা নিজেদের ধর্ম মানবে এবং মুসলমানরা তাদের নিজেদের।” ইহুদি বা মুসলমান কারোরই প্রথাগত অধিকার ও দায়িত্বের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করা হয়নি এবং উভয় সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে গ্রহণযোগ্য ছাড় দেওয়া হয়েছিল। সেইসঙ্গে একটি ধারা যোগ করা হয়েছিল, যা নিম্নরূপ:

“যখনই কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হবে, তখন বিষয়টি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং মুহাম্মদের কাছে প্রেরণ করা উচিত।”(-১৪৯)

এই ডিক্রিটি একটি রাজনৈতিক উদ্যোগ ছিল, যা সবচেয়ে কৌশলী এবং বুদ্ধিমান পদ্ধতিতে, মদিনা শহরে ইসলামি সাংবিধানিক শাসনের সূচনা করেছিল।

পয়গম্বরের মদিনায় অভিবাসন কুরাইশদের তুষ্ট করার পরিবর্তে তাদের ক্ষোভকে নতুন মাত্রায় উসকে দিয়েছিল। তারা দেখল যে, মুসলমানরা সবাই এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে, এবং সেই প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে। মাত্র দুই বছরের মধ্যে পয়গম্বরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, তিনি শহরের বাইরে

কুরাইশ সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করবেন, নাকি তাদের মদিনায় ঢোকবার অনুমতি দিয়ে ইসলামের সদ্যনির্মিত নীড়টি বিপর্যস্ত করতে দেবেন?

কুরাইশদের সৈন্যবাহিনীতে ৯৫০ জন লোক ছিল, যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। কিন্তু পয়গম্বরের অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে বলেছিল যে কুরাইশরা শুধুমাত্র নেতিবাচক আবেগ দ্বারা পরিচালিত। মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ এবং পয়গম্বরের প্রতি ঈর্ষা তাদের আগ্রাসনের পেছনে নিহিত রয়েছে। অন্যদিকে মুসলমানরা সবচেয়ে ইতিবাচক ও মহৎ প্রবৃত্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য ছিল ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস, সেইসঙ্গে মুসলমানরা নিশ্চিত ছিল যে তারা একটি সত্য কারণের জন্য লড়াই করছে। তখন মুসলমানরা তাদের শত্রুদের চেয়ে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত বোধ করেছিল। তা ছাড়া আরবে যুদ্ধ ছিল ব্যক্তিগত বিষয়। প্রতিটি যোদ্ধা তার নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করে নিজের জন্য একটি খ্যাতি তৈরি করতে চাইত। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস মুসলমানদের এই দুর্বলতা দূর করেছিল। আরবের ইতিহাসে হজরত মুহাম্মদ(স.) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য এবং বিভিন্ন নির্দিষ্ট স্তরবিন্যাসে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তি হিসাবে নয়, একটি দল হিসাবে লড়াইয়ের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। ইসলামে বিশ্বাসীদের সংহতির জোরে কুরাইশদের ব্যক্তিগত শক্তিকে ধ্বংস করার আহ্বান জানানো হয়েছিল:

"ঈশ্বর তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সারিতে বিন্যস্ত হয়ে লড়াই করে, যেন তারা একটি সুদৃঢ় প্রাচীর।"(-১৫০)

এই বিশ্বাস এবং মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার ক্ষমতা বদরের যুদ্ধে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম বিজয় নিয়ে আসে।

খ. ইসলামের বিজয়

বদরের পরাজয় কুরাইশদের আরও উত্তেজিত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধ, বিশেষ করে উহুদ (হিজরি সাল ৩) এবং খন্দকের যুদ্ধ (ব্যাটল অব দ্য ট্রেঞ্চ) (হিজরি সাল ৫), কয়েক বছরের ব্যবধানে সংঘটিত হয়েছিল। এই অভিযানগুলিতে মুসলমানরা কঠিন সমস্যায় পড়েছিল।

খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৮০০ জনকে এতটাই চরম ঠান্ডা, ক্ষুধা ও ক্লান্তি সহ্য করতে হয়েছিল যে, পয়গম্বর যখন শত্রু শিবিরে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য কাউকে স্বেচ্ছাসেবক করতে চেয়েছিলেন, তখন কেউ দাঁড়ায়নি। অবশেষে পয়গম্বর ব্যক্তিগতভাবে হুজাইফাকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। মদিনার ইহুদিদের সঙ্গেও বারবার সমস্যা দেখা দেয়। তারা কুরাইশদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছিল। খন্দকের যুদ্ধের সময় মদিনা বিশ দিন অবরুদ্ধ ছিল। অবশেষে কুরাইশরা একটি ভয়ঙ্কর বালির ঝড়ের কবলে পড়ে মক্কায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কুরাইশদের সঙ্গে ইহুদিদের জোট প্রকাশ্যে এসে পড়ায়, পয়গম্বর সমস্যা সমাধানের জন্য এই সময়টিকে বেছে নিয়েছিলেন। মদিনার আশেপাশে তিনটি ইহুদি গোষ্ঠী ছিল– বানু নাদির, বানু কাইনুকা এবং বানু কুরাইজা। খন্দকের যুদ্ধের পরপরই, তাদের নিজেদের ইহুদি আইন প্রয়োগ করে তাদের অবরুদ্ধ এবং নির্বাসিত করা হয়েছিল। এইভাবে তারা মদিনার মুসলমানদের জন্য যে বিপদের সৃষ্টি করেছিল, তা চিরতরে দূর হয়ে গেল।

তখন খায়বারের সমস্যা দেখা দেয়। পয়গম্বরের মদিনায় অভিবাসনের ছয় বছর পর চারশো কিলোমিটার দক্ষিণে মক্কার কুরাইশ গোষ্ঠী এবং দুশো কিলোমিটার উত্তরে খায়বার প্রদেশের ইহুদিদের মাঝখানে মদিনা ছিল ইসলামের একটি দ্বীপস্বরূপ। কুরাইশ এবং ইহুদিরা ইসলামের প্রতি তাদের শত্রুতায় একত্রিত হয়েছিল, কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে একা যুদ্ধ করার মতো শক্তিশালী না হওয়ায় তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যৌথ পদক্ষেপের পরিকল্পনা নির্ধারণের লক্ষ্যে আলোচনায় প্রবেশ করেছিল। ইহুদিরাও একই সময়ে কুরাইশ এবং মুসলমান উভয় শত্রুকে মোকাবিলা করার অবস্থানে ছিল না।

এই প্রেক্ষাপটের বিপরীতে পয়গম্বর, ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হিজরি ৬ সালে ১৪০০ জন অনুগামীসহ মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি এটা একেবারে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, কারো সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা মুসলমানদের নেই এবং তারা শুধু উমরাহ করতে যাচ্ছে। তাদের শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায়ের প্রমাণ দিয়েছিল কুরবাণির উট, যা মুসলমানরা তাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। এমনকি উটগুলিতে কালাদাহ্ নামে পরিচিত কুরবাণির প্রতীক দেওয়া হয়েছিল, যাতে মক্কার লোকেরা নিশ্চিত হতে পারে যে সেগুলি কুরবাণির জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানরা

যে কা'বাহ্-র ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক মর্যাদা ধ্বংস করতে চায় না, সে বিষয়ে কুরাইশদের নিশ্চিন্ত করা।

প্রত্যাশিতভাবেই, কুরাইশরা মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। মক্কা থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে উভয় পক্ষ মিলিত হয়। শত্রুতা এড়াতে উদ্বিগ্ন হয়ে পয়গম্বর সেখানে শিবির স্থাপন করেন। এরপর তিনি কুরাইশদের কাছে দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি চুক্তির প্রস্তাব দিয়ে একটি বার্তা পাঠান। তিনি তাঁর দূতদের এই বার্তা দিয়ে পাঠালেন যে তাঁরা কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেননি। "আমরা তীর্থযাত্রী হিসাবে এসেছি। যুদ্ধের কারণে কুরাইশরা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তারা যদি চায়, আমি তাদের সঙ্গে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে রাজি আছি; তারা সেই সময়ে আমার এবং জনগণের মধ্যে হস্তক্ষেপ করবে না। যদি আমি মহত্তম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হই, তখন তারা ইচ্ছা করলে সেই ধর্ম গ্রহণ করতে পারে, যা অন্যরা গ্রহণ করেছে। আমি যদি মহত্তম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না হই, তবে তাদের ইচ্ছামতো কাজ করার অধিকার থাকবে। যদি কুরাইশরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, আমি আমার লক্ষ্যের সমর্থনে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। এমনকি আমার জীবন হারানোর ঝুঁকি নিয়েও এই যুদ্ধ করব। ঈশ্বর যা চান, তা ঘটবে।"(-১৫১)

এই বার্তাটির বিষয়বস্তু থেকে দেখা যায় যে, পয়গম্বর প্রথম কুরাইশদের মননের একটি নরম জায়গায় আবেদন করেছিলেন। যখন পয়গম্বর মক্কায় তাঁর প্রথম প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড শুরু করেন, কুরাইশদের পক্ষ থেকে 'উতবাহ্ ইবন রাবি'য়াহ্ তাঁর কাছে আসেন। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যান, তখন তিনি তাদের বলেন: "এই লোকটিকে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে দিন, ঈশ্বর জানেন, তিনি কখনোই এই কাজ ছেড়ে দেবেন না। তাঁকে আরবদের কাছে প্রচার করা থেকে বাধা দেবেন না। যদি তিনি তাদের জয় করেন, তাহলে তাঁর সম্মান আপনাদের নিজের সম্মান হবে। যদি তারা (তাঁর উপর) জয়ী হয়, তাহলে, আপনাদের ধন্যবাদ, আপনারা তাঁর থেকে মুক্তি পাবেন।"(-১৫২)

এইভাবে পয়গম্বর কুরাইশদের কাছে সেই শর্তে আবেদন করেছিলেন যা তারা নিজেরাই ভাবছিল; ফলস্বরূপ, তিনি শত্রু শিবিরে তাঁর শান্তি উদ্যোগের অনেক সমর্থক খুঁজে পেতে সক্ষম হন।

পয়গম্বর কুরাইশদের এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং একই সঙ্গে তাদের প্রভাবিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। বানু কিনানাহ গোষ্ঠীর এক ব্যক্তি মুসলমানদের অভিপ্রায় জানার জন্য মক্কা থেকে হুদায়বিয়ায় এসেছিলেন। পয়গম্বর যখন তাঁর আসন্ন আগমনের কথা শুনেছিলেন, তখন তিনি তাঁর অনুসারীদের কুরবাণির জন্য আনা উটের প্রতি বানু কিনানাহ্-দের শ্রদ্ধার কথা বলেছিলেন, এবং যখন তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তখন তাদের উটগুলি তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তারা তাই করেছিল, একই সঙ্গে তীর্থযাত্রার প্রার্থনাও উচ্চারণ করেছিল– "আমরা এখানে আপনার সেবায়, প্রভু…।" কুরাইশদের দূত অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। মক্কায় ফিরে এসে তিনি কুরাইশদের বলেছিলেন, তিনি নিশ্চিত যে মুসলমানরা তীর্থযাত্রায় এসেছেন এবং অন্য কোনো কারণে নয়; অতএব তাদের এগোতে দেওয়াই উচিত।

১৪০০ জন মুসলমানের ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস প্রদর্শনের দৃশ্যটিও কুরাইশদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। যখন কুরাইশদের একজন দূত মুসলিম শিবিরে প্রবেশ করল, মুসলমানরা সবাই পয়গম্বরকে সামনে রেখে সারিবদ্ধভাবে নামাজ পড়ছিল। তিনি উপাসকদের সংগঠন ও শৃঙ্খলা দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। যখন তিনি কুরাইশদের কাছে ফিরে আসেন, তখন তিনি তাদের বলেছিলেন যে, মুসলমানরা একটি দল হিসাবে কাজ করে: যখন মুহাম্মদ(স.) একটি পদক্ষেপ নেন, তখন তাঁর সমস্ত অনুসারীরা একইভাবে কাজ করে। অন্য একজন দূত দেখলেন যে, পয়গম্বর যখন অজু করেন, তখন সেই ব্যবহৃত জল মাটি স্পর্শ করার আগেই তাদের হাতে ধরতে মুসলমানরা ছুটে যায়। তিনি লক্ষ্য করলেন, পয়গম্বর যখন বক্তৃতা করছিলেন তাদের উপর নেমে এসেছিল এক নীরবতা; এক শ্রদ্ধা যা তাদের সরাসরি তাঁর চোখের দিকে তাকাতে বাধা দেয়। যখন সেই দূত কুরাইশদের কাছে ফিরে এসেছিলেন, তখন নেতার প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য এবং ভালোবাসার বর্ণনা শুনে তারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। 'উরওয়াহ ইবন মাস'উদ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি আমার পিতা ও পুত্রের মতো নও?" অনুগামীরা তাঁকে বলেছিল যে তারা আসলে তাই। "তোমরা কি আমাকে কোনোভাবে সন্দেহ করছ?" তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন। তারা জানাল

তারা তাঁকে সন্দেহ করছে না। “আচ্ছা,” ‘উরওয়াহ বললেন, “এই লোকটি [মুহাম্মদ(স.)] তোমাদের একটি সুন্দর প্রস্তাব দিয়েছে। তোমরা এতে সম্মত হও এবং আমাকে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে যেতে দাও।”(-১৫৩)

পয়গম্বর এটা স্পষ্ট করেছিলেন যে, ঈশ্বরের বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তিনি কুরাইশদের যে কোনো দাবি নির্দ্বিধায় মেনে নেবেন। চুক্তিটি সংকলিত হওয়ার সময় কুরাইশরা সব ধরণের গোঁড়ামি প্রদর্শন করেছিল। তারা খসড়া থেকে ‘মুহাম্মদ, ঈশ্বরের প্রতিনিধি’ শব্দবন্ধটি সরিয়ে তার পরিবর্তে ‘আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ’ সন্নিবেশিত করেছিল। “ঈশ্বরের নামে, পরম করুণাময়, দয়াময়” শব্দগুলিকে দূরে সরিয়ে তারা “তোমার নামে, হে ঈশ্বর” লেখার উপর জোর দিয়েছিল। তারা একটি ধারা যোগ করে বলেছিল যে, যদি কোনো কুরাইশ মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে তাকে কুরাইশ গোষ্ঠীর কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। অন্যদিকে কুরাইশদের কাছে আসা কোনো মুসলমানের সঙ্গে একই আচরণ করা হবে না। তারা সে বছর মুসলমানদের তাদের তীর্থযাত্রার জন্য মক্কায় প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এই ধারাগুলো হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সহযোগীদের (সাহাবীদের) কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। ‘উরওয়াহ ইবন মাস’উদ মন্তব্য করেছিলেন যে, পয়গম্বর নিজের চারপাশে যাদের একত্র করেছিলেন, তারা হয়তো এখনই তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে। ‘উরওয়াহ-র মন্তব্যটি স্বাভাবিকভাবে শান্ত আবু বকরের জন্য খুব বেশি সত্য ছিল। তিনি তাঁকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, “তাহলে আপনি মনে করেন যে আমরা পয়গম্বরকে একা একা ছেড়ে দেব?” কিন্তু পয়গম্বর স্বয়ং উত্তেজিত হলেন না। তিনি কুরাইশদের সকল দাবি মেনে নেন এবং তাদের সঙ্গে দশ বছরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন করেন। যতদিন যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্থায়ী ছিল, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুতায় অংশগ্রহণ করা থেকে কুরাইশদের বিরত রাখা সম্ভব হয়েছিল।

এই চুক্তিটি মুসলমানদের উপর এতটাই চাপ সৃষ্টি করেছিল যে, এটি সম্পন্ন হওয়ার পরে, তাদের সঙ্গে আনা উটগুলি কুরবাণি করার জন্য পয়গম্বর বারংবার আহ্বান জানালেও প্রথমে তারা কোনো সাড়া দেয়নি। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শেষ পর্যন্ত তারা সেই কর্তব্য সম্পাদন করতে উঠেছিল। পরে যখন

তারা মাথা কামিয়েছিল, তখন তাদের দুঃখ এতটাই গভীর ছিল, মনে হয়েছিল যে তারা একে অপরের গলা কাটতে চলেছে। কিন্তু এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি, যার শর্তাবলী মুসলমানদের জন্য এতটাই প্রতিকূল বলে মনে হয়েছিল, পরবর্তীতে সেই চুক্তিই তাদের জন্য অগণিত সুবিধা বয়ে এনেছিল।

যুদ্ধবিরতি চুক্তির সময় মুসলমানদের সামনে দুটি প্রধান বিরোধী শক্তি ছিল — খায়বারের ইহুদিরা এবং মক্কার কুরাইশরা। মুসলিমরা তখনো একসঙ্গে এই দুই প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার মতো শক্তিশালী ছিল না। একজনকে আক্রমণ করলে অন্যজনকে পেছন থেকে মদিনা আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগ দেওয়া হতো; তাহলে মুসলমানদের ঘাঁটি ধ্বংস হয়ে যেত। এখন পয়গম্বর, কুরাইশদের সকল দাবি মেনে নিয়ে দুই শক্তির মধ্যে একটির সঙ্গে দশ বছরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছিলেন। তারা আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পারেনি। কুরাইশরা পথ থেকে সরে যাওয়ায়, পয়গম্বর তখন খায়বারের ইহুদিদের দিকে মনোযোগ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। হুদায়বিয়ার চুক্তির (জুল-কা'দাহ, হিজরি সাল ৬) অব্যবহিত পরেই হিজরি সাল ৭-এর মহরম মাসে খায়বার অভিযান শেষ পর্যন্ত ইহুদি সমস্যার সমাধান করেছিল।

খায়বারের আটটি শক্তিশালী দুর্গে কুড়ি হাজার সশস্ত্র লোক অবস্থান করছিল। দুর্গগুলিও অত্যন্ত আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সজ্জিত ছিল। এই সুরক্ষিত শহর বিজয়ের ঘটনাটি দীর্ঘ, যেখানে অসাধারণ সামরিক কৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ জন লোক একজোট হয়ে একটি বিশাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে শহরের মূল ফটকটি ভেঙে দিয়েছিল। পরপর কয়েকটি শক্তিশালী আঘাত ফটকটি ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, এবং তীব্র তীর ও পাথরের বৃষ্টির মধ্যে মুসলমানরা ভেতরে প্রবেশ করে। এভাবে চারটি দুর্গ দখল করা হয়। বাকিরা আতঙ্কিত হয়ে তাদের দরজা খুলে দেয় এবং নিজেদের মুসলমান সেনাবাহিনীর কৃপার পাত্র করে তোলে।

কুরাইশরা তখনও অপরাজিত থেকে গিয়েছিল। পয়গম্বরের অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে বলেছিল, তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করার আগে চুক্তি ভঙ্গ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। পয়গম্বর জানতেন, কুরাইশদের নেতিবাচক মনোভাব তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যেহেতু তারা হিংসা, ঘৃণা, লোভ ও অহংকার অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল,

তাই পয়গম্বর বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো অনৈতিক এবং অযৌক্তিক পদক্ষেপ নেওয়া থেকে কিছুতেই বিরত থাকবে না। তাঁর অনুমান সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। হিজরি সাল ৮-এর শা'বান মাসে খুজা'আহ এবং বানু বকর গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ বাধে। বানু বকর গোষ্ঠী কুরেইশদের সঙ্গে এবং খুজা'আহ গোষ্ঠী মুসলমানদের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। হুদায়বিয়ার চুক্তির শর্তের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচারণ করে, কুরাইশরা তাদের মিত্রদের গোপন সমর্থন দিয়েছিল, যার ফলে তারা খুজা'আহ আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিল। হুদায়বিয়ার চুক্তির ঠিক দুই বছর পর এই ঘটনাটি ঘটে। এই সময়ে পয়গম্বরের সঙ্গে থাকা মানুষের সংখ্যা ১৫০০ থেকে বেড়ে ১০,০০০-এ পৌঁছেছিল। তাদের সঙ্গে পয়গম্বরও গোপনে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁর কৌশল এতই বুদ্ধিদীপ্ত এবং কূটনৈতিক ছিল যে কার্যত কোনো রক্তপাত ছাড়াই মক্কা জয় করা সম্ভব হয়েছিল:

'ঈশ্বর আপনাকে অনেক লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা আপনি অর্জন করবেন, এবং তিনি আপনাকে এটি আগেই দিয়েছেন, এবং তিনি জনগণের হাত থেকে আপনাকে সুরক্ষিত রেখেছেন।'-১৫৪

যখন হুদায়বিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তখন পয়গম্বরের ধর্মপ্রচার কাজ কুড়ি বছর সময় অতিক্রম করেছে। ইসলামের বাণী সমগ্র আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতিটি গোষ্ঠীতে এমন অনেক লোক ছিল যাদের অন্তরে পয়গম্বরের ধর্ম স্থান পেয়েছিল। কিন্তু তারপরও তারা কুরাইশদের তাদের নেতা বলে মানত। ইসলামের সত্যতা উপলব্ধিকারী অনেকেই কুরাইশদের ভয়ে ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করতে পারেনি। তারা জানত যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমান। এরপর তারা শুনল যে মুসলমান ও কুরাইশরা দশ বছর সময়কালের জন্য শত্রুতা মুলতবি রাখতে সম্মত হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী মনে হচ্ছিল কুরাইশরা আর ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারবে না।

ইসলাম গ্রহণ করা থেকে মানুষকে আটকানোর আর কোনো উপায় ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন ইসলামের দরজায় বিশাল জনসমাগম হয়েছে। হুদায়বিয়ার চুক্তির মাধ্যমে দরজাটি খুলে যায় এবং দলে দলে মানুষ সেখানে ভিড় জমায়।

ইবন শাহাব আল-জাহরি এবং অন্যরা উল্লেখ করেছেন — মুসলমানরা তাদের যে কোনো অভিযানের চেয়ে হুদায়বিয়ার চুক্তি থেকে বেশি লাভবান হয়েছিল। পয়গম্বর দুই বছর পর ১০,০০০ লোক নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন, এর আগে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ৩,০০০-এর বেশি ছিল না। কুরাইশদের ক্ষোভ ও বিরক্তি, যা ছিল ইসলাম গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা, সেটি সরে যাওয়ায় ইসলাম গ্রহণে আর কোনো বাধা রইল না। হুদায়বিয়ায় উপস্থিত মুসলমানদের একজন ছিলেন বারা'। বুখারী বর্ণনা করেছেন, কীভাবে তিনি পরবর্তীকালের মানুষদের — যাঁরা মক্কা বিজয়কে ইসলামের মহান বিজয় বলে মনে করতেন — বলতেন যে পয়গম্বরের সহযোগীরা হুদায়বিয়ার শান্তি চুক্তিকে অসামান্য বিজয় বলে মনে করতেন।

এই চুক্তির ফলে মদিনার অর্থনৈতিক অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। মদিনা থেকে কাফেলাগুলিকে মক্কার মধ্য দিয়ে অবাধে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশ গোষ্ঠীর আবু জান্দাল, আবু বাসির এবং অন্যান্য যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, চুক্তির শর্ত অনুসারে কুরাইশদের কাছে তাদের ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল। অল্পকালের মধ্যেই তারা পালিয়ে যায় এবং জুল-মারওয়াতে আশ্রয় নেয়। এত বেশি মুসলিম ধর্মান্তরিতরা সেই জায়গায় জড়ো হয়েছিল যে সেটি ইসলামের একটি নতুন, বিকাশমান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সেখান থেকে তারা কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাগুলিতে ধরপাকড় চালাতো। অবশেষে 'যদি কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য কুরাইশদের ত্যাগ করে, তাকে আবার কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে, কুরাইশরা তাদের এই জেদ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

হুদায়বিয়ার সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল, অস্থিরতা পরিহার করা উচিত এবং শুধুমাত্র বাহ্যিক চেহারা দেখেই কোনো কিছু বিচার করা উচিত নয়। হুদায়বিয়ার 'বাহ্যিকভাবে প্রতিকূল' চুক্তি মুসলমানদের জন্য অনেক বড় সুযোগ এনেছিল, যা কেবল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরাই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ইবন 'আসাকির হুদায়বিয়ার চুক্তি সম্পর্কে আবু বকরের কিছু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। "এটি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামি বিজয়" আবু বকর বলেন, "যদিও সেদিন লোকেরা মুহাম্মদ(স.) এবং তাঁর ঈশ্বরের মধ্যে অপ্রকাশ্য সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারেনি। মানুষ অধৈর্য হয়, কিন্তু ঈশ্বর কখনও অধৈর্য হন

না। তিনি সমস্ত বিষয়কে তাদের আপন গতি নিতে দেন, যতক্ষণ না সেগুলি তাঁর কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে।” একমাত্র বাস্তববাদ এই পৃথিবীতে সাফল্য নিয়ে আসে; কিন্তু মানুষ তাৎক্ষণিক সাফল্য চায়। সাফল্য অর্জনের জন্য যে সময়সাপেক্ষ দীর্ঘ ধাপগুলি পার করতে হয়, সেগুলি সে অতিক্রম করতে চায় না।

খায়বারদের সঙ্গে বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করার পর পয়গম্বর আর একটি অভিযানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। লক্ষ্যটি তিনি গোপন রেখেছিলেন, এমনকি আবু বকরকেও বলেননি যে তাঁরা কোথায় অগ্রসর হবেন। শুধুমাত্র হিজরি সাল ৮-এর রমজান মাসে, যখন মুসলিম সেনাবাহিনীকে মক্কার দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন তারা বুঝতে পেরেছিল যে তারা কোথায় যাচ্ছে। তাদের যাত্রা এতটাই গোপন ও সাবধানী ছিল যে, তারা কুরাইশদের অজ্ঞাতসারে মার’উজ-জাহরান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পয়গম্বর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন মুসলমানরা মক্কা নগরীতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত ‘কুরাইশদের গুপ্তচর ও সংবাদ সরবরাহকারীদের’ সংযত রাখতে।

মক্কায় অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি গোপন রাখার জন্য পয়গম্বর অনেক দূরের ভাবনা ভেবেছিলেন। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে মদিনাকে বাকি আরব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে: কাউকে শহরে প্রবেশ করতে বা বের হতে দেওয়া যাবে না। ‘আলির অধীনে একটি দলকে মদিনার দিকে যাওয়ার রাস্তা পাহারা দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তারাই হাতিব ইবন আবি বালতা’য়াহ্-র বার্তাবাহককে গ্রেপ্তার করেছিল, যিনি মক্কার লোকদের কাছে তাদের শহরের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে একটি চিঠি নিয়ে যাচ্ছিলেন। ইবন আব্বাস-এর ভিত্তিতে তাবারানি বর্ণনা করেছেন, “প্রত্যেক গোষ্ঠী তার সম্পূর্ণ ক্ষমতা অনুসারে জনশক্তি এবং অস্ত্র সরবরাহ করেছিল।” কেউ পিছিয়ে ছিল না। মোট দশ হাজার সৈন্য এক শত-র বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি বিভাগ সুসংহত সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন একজন সেনাপতি যিনি রণধ্বজা বহন করেছিলেন। পয়গম্বর তাঁর কাকা আব্বাসকে বললেন, তাঁর পুরানো বিরোধী আবু সুফিয়ানকে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা দেখতে দিতে। আবু সুফিয়ান একটি সরু গিরিপথের পাশ থেকে সারি সারি মুসলিম সৈন্যদল দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি। “এই বাহিনীকে

মোকাবিলা করার ক্ষমতা কার আছে?" তিনি চিৎকার করে বললেন, "আমি এর আগে এইরকম কিছু দেখিনি।" এভাবেই পয়গম্বর আবু সুফিয়ানকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি কেউ আবু সুফিয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। এর ফলে আবু সুফিয়ান নিজেই মক্কাবাসীদের কাছে আবেদন করেছিলেন, মুহাম্মদ(স.)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য, কারণ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো শক্তিশালী কেউ ছিল না। মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি রক্তপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছিল না; তাদের উদ্দেশ্য ছিল মক্কাবাসীকে ভয় দেখানো, যাতে যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়াই শহরটি ইসলামের জন্য দখল করা যায়। মুসলমান সেনাবাহিনী মক্কার কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে তার নেতাদের একজন, সা'দ ইবন উবাদাহ, ডাক দিলেন, "আজ যুদ্ধের দিন!" পয়গম্বর তাঁকে সংশোধন করে দিয়ে বললেন, দিনটা যুদ্ধের নয়; করুণার দিন। তখন সা'দকে পদত্যাগ করতে বলা হল এবং তাঁর পরিবর্তে তাঁর ছেলের হাতে ধ্বজা তুলে দেওয়া হল।

মক্কা বিজয়ের পর আরও কিছু অভিযান হয়েছিল, যার ফলে পয়গম্বরের মোট সামরিক অভিযানের সংখ্যা হয় আশি। তবে, মুসলমানরা আরবের রাজধানী দখল করে নেওয়ার পরে, ছোটখাটো কিছু সংঘর্ষ হয়েছিল। এরপর, সমগ্র আরব পয়গম্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁকে তাদের অবিসংবাদিত নেতা বলে মেনে নেয়।

১৩. বিজয় এবং তারপরে

যে কোনো যুদ্ধে বিজয়ীদের সাধারণত দুই ধরণের অনুভূতির শিকার হন — অহংকার এবং প্রতিহিংসা। তবে, ইসলামের পয়গম্বর, হিজরি ৮ সালে মক্কা বিজয়ের পর, এই অনুভূতিগুলির কোনোটিই প্রদর্শন করেননি। এই বিজয় ছিল ঈশ্বরের পয়গম্বরের বিজয়। ইবন ইশহাকের মতে, পয়গম্বর যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর মাথা এত নত হয়েছিল যে, জনগণ দেখতে পেল তাঁর দাড়ি উটের জিন স্পর্শ করছে। এমনই ছিল পয়গম্বরের বিনয় এবং নম্রতা, এমনকি তাঁর বিজয়ের সময়েও। কা'বাহ-র দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পয়গম্বর একটি ভাষণ দেন, যার মধ্যে তিনি বলেন,

'এক ঈশ্বর ছাড়া উপাসনা পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন। তিনিই শত্রুদের পরাভূত করে দিয়েছেন।'-১৫৫

পয়গম্বর কখনোই তাঁর বক্তব্যের মধ্যে এই বিজয়ের জন্য কোনো কৃতিত্ব দাবি করেননি; তিনি এই বিজয় সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে সমর্পণ করেছেন। পরবর্তীতে একই বক্তৃতায় তিনি কুরাইশদের উদ্দেশে এই কথা বলেছিলেন

"আপনারা কী মনে করেন, আমি এখন আপনাদের সঙ্গে কী করতে যাচ্ছি?" "আমরা মনে করি আপনি আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন", তারা উত্তর দিল, "কেননা আপনি আমাদের আদর্শবান ভাই এবং আমাদের আদর্শবান ভাইয়ের সন্তান।" তখন পয়গম্বর বললেন, "আমি আপনাদের তাই বলব যা যোসেফ তাঁর ভাইদের বলেছেন: আজ যেন কোনো নিন্দা আপনাদের স্পর্শ না করে। যান, আপনারা মুক্ত।"(-১৫৬)

সুতরাং, শুরু থেকেই পয়গম্বর প্রতিহিংসার পথ গ্রহণ করেননি; তার ফলে তাঁর নতুন প্রজাদের পক্ষ থেকে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সমস্ত সম্ভাবনা দূর হয়।

যুদ্ধের ময়দানে যে-কোনো পরাজিত জাতিই সাধারণত গোপন প্রতিরোধের আশ্রয় নেয়। পয়গম্বর সাধারণভাবে সকলের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করে শুরুতেই সব প্রতিরোধ নির্মূল করে দিয়েছিলেন। যে সমস্ত শক্তি ইসলামের সুরক্ষিত দুর্গটি ধ্বংস করতে চাইতে পারত, তারাই ইসলামের দুর্গ নির্মাণ এবং সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়ে গেল।

মক্কা বিজয়ের পর পয়গম্বর যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তাঁর সেনাপতিদের আদেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে আক্রমণ না করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা আক্রান্ত না হয়। যারা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল, তাদের তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে "কা'বাহ-র সুরক্ষিত পর্দার আড়ালে আশ্রয় নিলেও", মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। ইবন হিশাম এবং পয়গম্বরের অন্যান্য জীবনীকারেরা সেইসব ঘটনাগুলি পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে তাদের নাম এবং তাদের অপরাধের প্রকৃতি তুলে ধরা হলো:

১. 'আবদুল্লাহ ইবন সা'দ, যিনি মুসলমান হয়েছিলেন এবং পয়গম্বর কর্তৃক ঐশী বাণীর লেখক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং পরে তিনি ধর্মত্যাগ করে অবিশ্বাসীদের দলে যোগ দেন। মক্কা বিজয়ের পর, যখন তিনি শুনলেন যে পয়গম্বর তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন, তখন তিনি তাঁর পাতানো-ভাই 'উসমানের কাছে আশ্রয় নেন। 'উসমান তাঁকে আশ্রয়ও দেন, তারপর তাঁকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে পয়গম্বরের কাছে নিয়ে যান। পয়গম্বর নীরব থাকলেন। 'উসমান তখন দ্বিতীয়বার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তারপর পয়গম্বর 'আবদুল্লাহ ইবন সা'দের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে 'উমর এবং 'উসমান যখন খালিফা ছিলেন, তখন সাদ মিশরের গভর্নর হন, যিনি আফ্রিকা বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

২. 'আবদুল্লাহ ইবন খাতাল, যিনি পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং পয়গম্বর তাঁকে 'দান কর' আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। একজন ক্রীতদাস এবং একজন আনসার তাঁর সঙ্গে গেল। তাঁদের যাত্রাবিরতিতে, 'আবদুল্লাহ ইবন খাতাল ক্রীতদাসকে খাবারের জন্য মুরগির মাংস তৈরি করতে বলেন, কিন্তু ক্লান্ত ক্রীতদাস সেটা না করে তার পরিবর্তে ঘুমিয়ে

পড়ল এবং সময়মতো খাবার তৈরি করতে পারল না। ‘আবদুল্লাহ ইবন খাতাল ক্রুদ্ধ হয়ে সেই ক্রীতদাসকে হত্যা করলেন। এরপর যদি তিনি মদিনায় ফিরে যান, তাহলে পয়গম্বর ক্রীতদাসের মৃত্যুর জন্য তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন এই আশঙ্কায় তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং অবিশ্বাসীদের দলে যোগ দেন। তিনি কবি ছিলেন, পয়গম্বরকে গালিগালাজ করে পদ্য লিখতে শুরু করেন। যেদিন মক্কা বিজয় হয়েছিল, সেদিন তিনি কা’বাহ-র পর্দায় নিজেকে জড়িয়ে নেন। পয়গম্বরকে সে কথা বলা হলে তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবন খাতালকে ওই স্থানেই হত্যার নির্দেশ দেন। আবু বুরজাহ এবং সা’ঈদ ইবন হারিস তাঁকে কালো পাথর এবং আবরাহামের স্থানের মাঝখানে হত্যা করেছিলেন।

৩. ফারতানা ছিলেন ‘আবদুল্লাহ ইবন খাতালের দাসী। তিনিও পয়গম্বরকে গালিগালাজ করে কবিতা আবৃত্তি করতেন। কুরাইশদের মদ্য পানের আসরে তাঁর নৃত্য ছিল একটি নিয়মিত ঘটনা। তাঁকেও তাঁর মালিকের সঙ্গে হত্যা করা হয়েছিল।

৪. কুরাইবা ছিলেন ‘আবদুল্লাহ ইবন খাতালের দাসী এবং ফারতানার মতো একই পেশা অনুসরণ করেছিলেন। তারও ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যখন তিনি পয়গম্বরের কাছে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন, তখন তাঁর অনুরোধ মঞ্জুর করা হয়। তারপর তিনি মুসলমান হয়ে যান।

৫. হুওয়াইরিস ইবন নাফিস ইবন ওয়াহাব ছিলেন একজন কবি, যিনি ইসলামকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তিনি মুহাম্মদ(স.)-এর নামে ‘নিন্দার স্তূপ’ তৈরি করে রেখেছিলেন। ‘আব্বাস ইবন ‘আবদুল মুত্তালিব এবং পয়গম্বরের দুই কন্যা ফাতিমা ও উম্মে কুলসুম যখন মক্কা থেকে মদিনায় যাচ্ছিলেন, তখন হুওয়ারিস ইবন নাফিস তাঁদের অনুসরণ করেন এবং বর্শা দিয়ে তাঁদের উটটিকে জখম করেন। উটটি ছটফট করতে থাকে এবং পয়গম্বরের কন্যারা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং ‘আলি তা কার্যকর করেছিলেন।

৬. মিকিয়াস ইবন সুবাবাহ, হিশাম ইবন সুবাবাহ-র ভাই। জু কারাদ অভিযানে একজন আনসারি ভুলবশত হিশামকে হত্যা করেছিল। এরপর মিকিয়াস মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য পয়গম্বরের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলেন এবং তাঁর অনুরোধ মঞ্জুর করা হয়েছিল। তিনি কয়েকদিন মদিনায় অবস্থান করেন, তারপর তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য দোষী ব্যক্তিকে হত্যা করেন। এরপর তিনি মক্কায় পালিয়ে যান এবং ধর্মত্যাগ করেন। পয়গম্বর তাঁকেও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন এবং নুমাইলা ইবন 'আবদুল্লাহ লায়সি ঐ মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেন।

৭. সারাহ, 'ইকরিমাহ ইবন আবি জাহলের একজন দাসী, যিনি পয়গম্বরের প্রবল নিন্দা প্রকাশ করে আনন্দলাভ করতেন। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি পয়গম্বরের কাছে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'উমরের খিলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

৮-৯. হারিস ইবন হিশাম এবং জুবায়ের ইবন আবি উমাইয়াকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল; তাঁরা তাঁদের আত্মীয় উম্মে হাম বিনত আবি জাহলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। 'আলি তাদের অনুসরণ করলেন এবং শপথ করলেন যে তিনি তাদের ছেড়ে দেবেন না। উম্মে হাম 'আলির পথ অবরোধ করেন এবং দুই পলাতককে তাঁর বাড়িতে তালা দিয়ে আটকে রেখে পয়গম্বরের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। উম্মে হাম পয়গম্বরকে বলেছিলেন, তিনি এমন দুজন মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন, যাদের আলি হত্যা করতে চান। "আপনি যাদের আশ্রয় দিয়েছেন, আমরাও তাদের আশ্রয় দিয়েছি এবং আপনি যাদের আপনার আশ্রয়ে নিয়েছেন, আমরাও তাদের আশ্রয়ে নিয়েছি", পয়গম্বর তাঁকে বলেছিলেন। সেই দুজনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য 'আলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি তা পালন করেছিলেন।

১০. 'ইকরিমাহ্ ইবন আবু জাহল তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, এবং তিনি ছিলেন ইসলামের আপসহীন বিরোধী। মক্কায় তাঁর ভয়াবহ পরিণতি নিশ্চিত বুঝে তিনি ইয়েমেনে পালিয়ে যান। তাঁর স্ত্রী উম্মে বাকিম বিনত বারিস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর সুরক্ষিত

আশ্রয়ের জন্য পয়গম্বরের কাছে আবেদন করেছিলেন। তাঁর অনুরোধ মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি ‘ইকরিমাহকে ফিরিয়ে আনতে ইয়েমেনে যান। তিনি তাঁর সঙ্গে ফিরে আসেন এবং পয়গম্বরের নেতৃত্বে মুসলমান হন। তিনি ধর্মান্তরিত হওয়ার পর ইসলামের জন্য ব্যক্তিগত ও বিপুল আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেন, অবশেষে আবু বকরের খিলাফতকালে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় আজনাদিনে তাঁর মৃত্যু হয়।

১১. হাব্বার ইবন আল-আসওয়াদ মুসলমানদের উপর প্রভূত নির্যাতনের জন্য দায়ী ছিলেন। হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর মেয়ে জয়নাব ছিলেন আবু’ল ‘আসের স্ত্রী। তিনি যখন মক্কা থেকে মদিনায় যাচ্ছিলেন, তখন হাব্বার বর্শা দিয়ে তাঁর উটটিকে আক্রমণ করলেন। উটটি উন্মত্ত হয়ে উঠল এবং জয়নাব উট থেকে পড়ে গেলেন। সে সময় তিনি সন্তানসম্ভবা ছিলেন। তাঁর শুধু গর্ভপাতই হয়নি, দুর্ঘটনার ভয়াবহ প্রভাব সারা জীবন জয়নারের সঙ্গে থেকে যায়। হাব্বারকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি পয়গম্বরের কাছে গিয়ে করুণার আবেদন জানান। তিনি বললেন, “হে ঈশ্বরের পয়গম্বর, আমার অজ্ঞতা ক্ষমা করুন। আমাকে মুসলমান হতে অনুমতি দিন।” পয়গম্বর তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

১২. ওয়াহশী ইবন হারব পয়গম্বরের কাকা হামজাহ-র মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিলেন। মুসলমানরা তাঁকে খুঁজে পেলে, তাঁকে হত্যা করবেই, সেকথা জানতে পেরে, তিনি মক্কা থেকে তা’ইফে পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে তিনি মদিনায় পয়গম্বরের সামনে আসেন, তাঁর অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দেন। হজরত মুহাম্মদ(স.) তাঁকে ইসলামে প্রবেশ করান এবং তাঁকে ক্ষমা করে দেন। তিনি আবু বকরের খিলাফতকালে ভণ্ড পয়গম্বর মুসাইলিমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মুসাইলিমাকে হত্যা করেন, এবং সেই একই অস্ত্র ব্যবহার করেন, যা দিয়ে তিনি হামজাহকে শহীদ করেছিলেন।

১৩. কা’ব ইবন জুহায়ির ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি, যিনি পয়গম্বরকে অবজ্ঞা এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কবিতা লিখতেন। যখন মক্কা জয় করা হয়েছিল, তিনি সে সময় শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারপরে তিনি মদিনায় আসেন,

পয়গম্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার জন্য প্রার্থনা করেন। পয়গম্বর তাকে ক্ষমা করলেন, এবং এই সময়ে তিনি কা'বকে নিজের চাদর দিয়ে দিয়েছিলেন।

১৪. হারিস ইবন তালাতিল ছিলেন একজন কবি, যিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে পয়গম্বরকে লাঞ্ছনার চেষ্টা করতেন। তাঁকে হত্যা করার জন্য মুসলমানদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং 'আলি তা কার্যকর করেছিলেন।

১৫. 'আবদুল্লাহ ইবন জিব'আরি ছিলেন আর একজন কবি, যিনি পদ্যে পয়গম্বরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতেন। পয়গম্বর তাঁকেও হত্যার নির্দেশ দিলে তিনি নাজরানে পালিয়ে যান। পরে তিনি পয়গম্বরের কাছে এসে অনুতপ্ত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। পয়গম্বর তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

১৬. হুবায়রা ইবন আবি ওয়াহাব মাখজুমি ছিলেন একজন কবি, যিনি পয়গম্বরের কর্মকাণ্ড বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেন। তাঁকেও হত্যার বিধান দেওয়া হয়েছিল। তিনি নাজরানে পালিয়ে যান এবং সেখানে তিনি অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা যান।

১৭. হিন্দ বিনতে 'উতবাহ্ হলেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। ইসলামের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ এতটাই প্রবল ছিল যে, উহুদের যুদ্ধে তিনি হামজাহর হৃৎপিণ্ড বের করে তা পিষে দিয়েছিলেন। তাঁকে হত্যা করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি পয়গম্বরের সামনে এসে ক্ষমা চাইলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। পয়গম্বর তাঁকে ক্ষমা করে ইসলামের অংশ করার পর হিন্দ নিজের বাড়িতে গিয়ে তাঁর বাড়ির সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেলে বললেন: "সত্যি, তোমরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছ।"

তাহলে এটা স্পষ্ট যে, মক্কা বিজয়ের পর যে সতেরো জন নারী-পুরুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তারা সবাই নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য দণ্ডিত ছিল। তবুও তাদের মধ্যে যে-ই ক্ষমা চেয়েছিল বা তার পক্ষ থেকে যে-ই আবেদন করেছিল, পয়গম্বর তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যারা ক্ষমার আবেদন করেছিল, তাদের কাউকেই হত্যা করা হয়নি। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সতেরোজনের মধ্যে

এগারোজনকে সরাসরি বা কোনো মধ্যস্থ ব্যক্তির মাধ্যমে ক্ষমা করা হয়েছিল। যে পাঁচজন ক্ষমার আবেদন করেনি, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন মক্কা থেকে পালিয়ে যায় এবং দূর দেশে তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

মক্কা বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যারা অপরাধী, পয়গম্বর কীভাবে তাদের ক্ষমা করেছিলেন? বানু মাখজুম গোষ্ঠীর ফাতিমা নামের এক মহিলা যখন চুরি করেছিল, তখন তার আত্মীয়রা ভয় পেয়েছিল, যে তার হাত কেটে ফেলা হবে। তারা উসামা ইবন জায়েদের কাছে গিয়েছিল। তারা আশা করেছিল, যে ইনি পয়গম্বরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হওয়ার কারণে, তাদের আত্মীয়ের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারবেন। উসামা পয়গম্বরের কাছে এসে ফাতিমা মাখজুমির পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উসামার কথা শুনে হজরত মুহাম্মদ(স.) দৃশ্যত বিচলিত হন। “আপনি কি আমাকে সেই বিষয়ে অনুরোধ করতে চাইছেন, স্বয়ং ঈশ্বর যার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন?” তিনি জানতে চাইলেন। পয়গম্বর তখন সকলকে একত্রিত করলেন এবং একটি বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, “আমার আত্মার উপর যার নিয়ন্ত্রণ আছে সেই শক্তির শপথ, যদি আমার কন্যা ফাতিমা চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে ফেলতাম।” ফাতিমা মাখজুমি তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছিলেন, তারপরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং ক্রমে একজন ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।”(-১৫৭)

এখানে স্পষ্ট হয় যে একজন অপরাধীকে কেউ ক্ষমা করতে সক্ষম নয়, যখন স্বয়ং ঈশ্বর তার শাস্তির বিধান দিয়েছেন। তাহলে, মক্কা বিজয়ের পর পয়গম্বর এত মহানুভবতার সঙ্গে মানুষকে ক্ষমা করে দিলেন কীভাবে? কারণটি ছিল যুদ্ধাপরাধ এবং সাধারণ পরিস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের অপরাধের জন্য মানুষের শাস্তি মকুব করা যায় না। অন্যদিকে যুদ্ধকালীন সময়ে সংঘটিত অপরাধ ক্ষমা করা যেতে পারে, যদি অপরাধীরা তাদের শত্রুতা পরিত্যাগ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থায় সংঘটিত অপরাধগুলি বাতিল হয়ে যায় যখন ঈশ্বরের নির্দিষ্ট শাস্তি প্রদান করা হয়, যুদ্ধাপরাধগুলি কেবলমাত্র আত্মসমর্পণ এবং করুণার আবেদনের মাধ্যমে বিচার্য। আরবে ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ করেছিল। তা সত্ত্বেও, কুরআন ঘোষণা করেছে যে,

তারা যদি সত্যিই অনুতপ্ত হয়, তাহলে পূর্বে যা হয়েছে, তা ক্ষমা করা হবে।(-১৫৮) তদুপরি, শত্রুপক্ষ যদি শান্তির জন্য আবেদন করে, শান্তির শর্ত ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও শান্তি স্থাপন করা উচিত।

'যদি তারা শান্তির দিকে ঝোঁকে, তাহলে তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করবে এবং ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখবে। তিনি শ্রবণকারী, তিনি সর্বজ্ঞ। যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে ঈশ্বরই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনি তাঁর সাহায্য দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমার চারপাশে বিশ্বস্তদের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।'(-১৫৯)

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এবং পরবর্তীতে ক্ষমাপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন হলেন 'ইকরিমাহ্ ইবন আবি জাহল। তাঁর পিতার মতো তিনিও ইসলামের সক্রিয় বিরোধী ছিলেন। তিনি পয়গম্বর এবং তাঁর সহযোগীদের সকল প্রকার অত্যাচার এবং নিপীড়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপরও যখন খবর এলো যে 'ইকরিমাহ্ ইসলাম গ্রহণ করতে আসছেন, তখন পয়গম্বর তাঁর সহযোগীদের বললেন, তারা যেন 'ইকরিমাহ্-র পিতা সম্পর্কে কোনো কঠিন কথা না বলেন, কারণ, "মৃতকে কটু কথা বললে জীবিতদের কষ্ট দেওয়া হয়।"

মক্কা বিজয়ের পরে এইরকম মহানুভবতা ইসলামের সবচেয়ে কঠিন শত্রুকেও ক্রমে ইসলাম বিশ্বাসের একনিষ্ঠ রক্ষকে পরিণত করেছিল।

তৃতীয় পর্ব

১৪. পয়গম্বরত্বের অবসান

হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর ধর্মপ্রচারের প্রাথমিক বছরগুলিতে, মক্কায় তীর্থ করতে আসা এক ব্যক্তিকে তাঁর দেশে ফেরার সময় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মক্কায় নতুন কী ছিল। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "হজরত মুহাম্মদ পয়গম্বরত্ব দাবি করেছেন, কিন্তু একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি যিনি তাঁর অনুসারী হয়েছেন, তিনি হলেন আবু কাহাফাহ্-র পুত্র আবু বকর।" এই উত্তর শুনে যে কেউ বলে দিতে পারে, যে, ৬১০ খ্রিস্টাব্দে যখন হজরত মুহাম্মদ(স.) ধর্মপ্রচার শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর সম্পর্কে জনগণের কী ধারণা ছিল। তখনকার দিনে, তাঁর বিরোধীরা তাঁকে 'গ্রামের ছেলে' বলে সম্বোধন করত এবং তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা করার জন্য তাঁকে 'ইবন আবি কাবশাহ', অর্থাৎ তাঁর 'গ্রামের পালক পিতামাতা'র ছেলে বলে ডাকত। যারা একটু নম্র আচরণ করত, তারা তাঁকে 'কুরাইশ যুবক' নামে অভিহিত করত।

নিজের জীবদ্দশায় পয়গম্বরকে এভাবেই সম্বোধন করা হতো। এখন কয়েক শতাব্দী পরে, বিষয়গুলি পরিবর্তিত হয়েছে। মুহাম্মদ(স.)-এর পয়গম্বরত্ব আর বিতর্কিত বিষয় নয়; এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে উঠেছে। এখন, যখন কেউ হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর কথা চিন্তা করেন, তখন এই চিন্তা একজন মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কথা মনে করায়, যিনি গত ১৫০০ বছর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে আছেন। এই ইতিহাস যদি ইসলাম ধর্মের পথপ্রদর্শকের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে তিনি মানুষের দৃষ্টিতে 'ইবন আবি কাবশাহ' হয়েই আবার ফিরে আসবেন। যদি এমনটা ঘটত, তাহলে বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা কোটিতে না গুণে, দশকের

সংখ্যায় গোণা যেত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'ইবন আবি কাবশাহ'-র বেশে আসা ঈশ্বরের দূতকে চিনতে পারাটা খুবই কঠিন।

অপরদিকে, যিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন, তাঁকে গ্রহণ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। কুরআন যাকে "প্রশংসা ও গৌরবের অবস্থান" (-১৬০) বলে অভিহিত করেছে, ইসলাম ধর্মের পথপ্রদর্শক এখন তাতে সুপ্রতিষ্ঠিত। এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তাঁর গুণগান করা মানুষের সংখ্যাটা এখন বহু হাজার কোটি ছুঁয়েছে।

এই বিষয়টিই পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের তাদের সমসাময়িক পয়গম্বরদের অস্বীকার করার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল। লোকে বলত, "তিনি তো একজন সাধারণ মানুষ ।" "এতদিন পর্যন্ত আমরা তাঁকে তাঁর সাধারণ নামেই চিনতাম। তিনি হঠাৎ করে কীভাবে ঈশ্বরের দূত হয়ে গেলেন?" যখনই কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়, তখনই এই আপত্তি উত্থাপিত হয়, যা একজন পয়গম্বরের সমসাময়িকদের জন্য তাঁর বার্তা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় সৃষ্টি করে।

সমস্ত পয়গম্বরদের আবির্ভাবের সময়ে সন্দেহ ও সংশয় নিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। তাদের চোখে তিনি যেহেতু একজন সাধারণ মানুষের মতোই ছিলেন, তাই তাঁর অনন্যতাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একধরণের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। ফলে তারা যখন পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে ব্যর্থ হল, তখন ঈশ্বরের আইন অনুসারে তাদেরকে শাস্তি পেতে হয়েছিল।

এরপর ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি এমন একজন পয়গম্বর পাঠাবেন, যিনি এই প্রতিবন্ধকতাকে ভেঙে দেবেন। তাঁর পয়গম্বরত্বের দাবি সত্য ছিল নাকি এটি ছিল গগনচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফল, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। তিনি ঈশ্বরের একজন দূত বা পয়গম্বর হিসেবে ইতিহাসের পাতায় তাঁর স্থান করে নেবেন। তাঁর নাম একটি বাতিঘরের মতো কলের সমুদ্রে স্থায়ী থাকবে, যা মানুষকে বিশ্বাসের আলো দেখাবে। তাঁকে ঈশ্বরের দূত হিসাবে স্বীকৃতি দিতে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে, এবং ঈশ্বরের চিরন্তন আশীর্বাদের অংশীদার হতে মানুষের কোনো অসুবিধা হবে না।

এমন বেশ কিছু হাদিস আছে, যেখানে পয়গম্বর বলেছেন, তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা অন্য যে কোনো পয়গম্বরের অনুসারীদের চেয়ে বেশি হবে। এটি আসলে একই বিষয়কে অন্যভাবে প্রকাশ করা। মুহাম্মদ(স)-এর পর আর কোনো পয়গম্বর আসবেন না। তাঁর অনুসারীদের আর কখনও বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে বেছে নিতে হবে না। শেষ দিবসের আগমন (কেয়ামত) পর্যন্ত তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

ইসরায়েলীয় ইতিহাসের দিকে নজর দিলে এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। ঈসা বা যিশুর সময়ে যেসব ইহুদিরা ছিল তারা মুসা বা মোজেসের কাছে উদ্ঘাটিত ঈশ্বরের নিয়মে বিশ্বাস করত। তারপর যখন তাদের মধ্যে একজন নতুন ঈশ্বরের দূত মেরির পুত্র যিশু আবির্ভূত হলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল। তারা তাদের নিজেদের পুরোনো পয়গম্বরকেই বিশ্বাস করতে থাকে এবং তাদের সমসাময়িক পয়গম্বরকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। এর সাতশো বছর পরে আরবের পয়গম্বর এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এই সময়ের মধ্যে বিশ্বে উল্লেখযোগ্যভাবে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। তবে আবারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। খ্রিস্টানরা ইসরায়েলীয় পয়গম্বরের পরিবর্তে একজন ইসমায়েলীয় পয়গম্বরকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না। আবার তারা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এক পয়গম্বর যিশুর উপর তাদের বিশ্বাস ধরে রেখেছিল, কিন্তু সমসাময়িক একজন ঈশ্বরের দূত, অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদ(স)-কে বিশ্বাস করেনি। ইসলাম গ্রহণ করেছিল এমন অল্প কিছু খ্রিস্টান ছাড়া, যাঁরা যিশুর পথের অনুগামী ছিলেন, তাঁরা যিশুর উত্তরসূরীকে অবিশ্বাস করেছিলেন।

পয়গম্বরত্ব অবসানের কল্যাণে, মুহাম্মদ(স.)-এর অনুসারীদের আর কখনও প্রাচীন পয়গম্বর এবং আধুনিক পয়গম্বরের মধ্যে কোনো একজনকে বেছে নিতে হবে না। বর্তমান বিশ্বে অন্তত আর কখনও এমন ঘটনা ঘটবে না যেখানে পুরোনো এবং নতুনের মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হচ্ছে,— এমন ঘটনা তখনই ঘটে যখন ঐতিহাসিকভাবে সিদ্ধ কোনো পয়গম্বরের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের কাছে সমকালীন কোনো পয়গম্বরের আবির্ভাব ঘটে। ইতিহাসের শিখরে হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর উত্তরণ, কুরআন যাকে 'প্রশংসা ও গৌরবের অবস্থান (-১৬১) বলে অভিহিত করেছে, সেটি একটি উপাদান,

যা তাঁকে 'সকল জাতিসমূহের জন্য ক্ষমাশীল'(-১৬২) হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। ঈশ্বরের দূত হিসাবে হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকভাবে প্রশ্ন তোলা যায় না — এটাই এই পৃথিবীতে তাঁর প্রশংসা ও গৌরবের অবস্থানের প্রকৃতি। রোজ-হাশরের দিনে তা বিশেষ ঐশ্বরিক অনুগ্রহের আকারে তাঁর উপর প্রকাশিত হবে।

এটা ভাবলে ভুল হবে যে, হজরত মুহাম্মদ(স.)-কে পয়গম্বরের মতো উচ্চতম পদে নির্বাচন করাটা একটি সাধারণ বিষয় ছিল। এই ঘটনা মানব ইতিহাসে বিপ্লব এনে দিয়েছিল। সেইজন্য, একজন সর্বোচ্চ নৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তার অতুলনীয় কীর্তি সম্পাদন করতে সক্ষম, তাঁকেই উপযুক্ত বলে বেছে নেওয়া যেতে পারে। এই কাজের জন্য মুহাম্মদ(স.)-কে আহ্বান করা সঠিক হবে বলে ঈশ্বর মনে করলেন;

'হে বস্ত্রাবৃত, জেগে ওঠো এবং সতর্ক করো। তোমার ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করো, তোমার পোশাক পরিচ্ছন্ন করো এবং যাবতীয় অশুদ্ধতা থেকে দূরে থাকো। পাওয়ার আশায় কোনো উপকার করবে না। তোমার প্রতিপালকের জন্য ধৈর্য ধরো।'(-১৬৩)

'বস্ত্রাবৃত' সেই মহান আত্মা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং আন্তরিকভাবে ঐশ্বরিক পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যদিও ধর্মপ্রচারের আগে পয়গম্বরকে অনেক পরীক্ষা এবং ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছিল। বিশ্বে একের পর এক বারংবার পয়গম্বরদের আগমন ছিল মানবতার জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। সেই যুগ এখন পেরিয়ে গেছে এবং সর্বকালের জন্য একজন স্বীকৃত পয়গম্বর থাকবেন, যিনি অবিরাম মানুষকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ-পরিসরে প্রবেশ করতে সাহায্য করবেন।

তাহলে হজরত মুহাম্মদ(স.)-কে নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে পয়গম্বরত্ব ঐতিহাসিক বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তি লাভ করল। এর অর্থ হল, ভবিষ্যতে আর কোনো পয়গম্বরকে পৃথিবীতে আসতে হবে না। কিন্তু এটা নিছক ঐশ্বরিক ঘোষণার বিষয় ছিল না। এটি হওয়ার আগে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়েছিল। প্রথমত, মানব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কিত ঈশ্বরের আদেশগুলি প্রকাশ করতে হয়েছিল। কুরআন বলছে সেটি যথাযথভাবে

সম্পন্ন হয়েছিল — "তিনিই তোমাদের জন্য কুরআনকে বিশদভাবে ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করেছেন।"(-১৬৪) দ্বিতীয়ত, মানবজাতির সামনে একটি নিখুঁত নমুনা উপস্থাপন করতে হবে। হজরত মুহাম্মদ(স.) ছিলেন মানবজাতির জন্য একটি 'ভালো দৃষ্টান্ত'(-১৬৫) — সুতরাং, এই শর্তটি পূরণ হয়েছিল। তৃতীয়ত, কুরআনকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আর সেই কাজটি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজের উপর নিয়েছিলেন: "আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমি অবশ্যই এটি সংরক্ষণ করব।"(-১৬৬)

পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের ঈশ্বর নির্দিষ্ট লক্ষণ ও অলৌকিক চিহ্ন দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। অপরদিকে, পয়গম্বররা জনগণের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য তাঁদের দায়িত্ব পালনে কোনো ফাঁক রাখেননি। এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন যে, তাঁরা বিস্ময়কর কাজ সম্পাদন করতে ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। এত কিছুর পরেও যদি মানুষ বিশ্বাস না করত, তাহলে পয়গম্বদের আর কিছু করার থাকত না। যারা অবিশ্বাসী ছিল, সেইসময় তাদের উপর ঈশ্বরের দূতের শাস্তি নেমে আসাটাই একমাত্র পথ ছিল।

তবে, শেষ পয়গম্বরের ক্ষেত্রে, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, তিনি যে মানুষদের সম্বোধন করেছিলেন, তাদের এই ধরণের ঐশ্বরিক শাস্তির শিকার হওয়া উচিত নয়। বরং স্বয়ং পয়গম্বর এবং তাঁর সহযোগী সাথীদের(সাহাবাদের) বলা হয়েছিল যে, যারা এখনও ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং যারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে আক্রমণ করেছে, তাদের মুসলমানদের হাতে শাস্তি দেওয়া হবে।(-১৬৭) অন্য কথায়, যে কাজটি ঈশ্বরের আজ্ঞাবহরা (ফেরেশতারা) সম্পাদন করতেন, তা মানুষের হাতে সম্পন্ন হবে।

এই ছিল ঐশ্বরিক বিধান — যার কারণে মদিনায় অভিবাসন (হিজরত)-এর পর এবং তাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে দেওয়ার পরেও, যখন অস্বীকার করার মতো আর কোনো যৌক্তিক কারণ অবশিষ্ট রইল না, তখনও পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের যুগের জনগণের মতো তারা কেউই ঈশ্বরের ক্রোধের সম্মুখীন হয়নি। বরং, পয়গম্বর ও তাঁর সাথীরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের মোকাবিলা করেছিল। ইসলামে বিশ্বাসীরা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের সাহায্য পেয়েছিলেন এবং তারা বিজয়ী হয়েছিলেন। এইভাবে আরব উপদ্বীপে ঈশ্বরের ধর্ম রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এটাই ঈশ্বরের রীতি— তিনি তাঁর আদেশগুলি প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রকাশ করেন। যেহেতু এই পৃথিবীতে পয়গম্বরের রেখে যাওয়া ধর্ম বিস্তারিতভাবে সম্পূর্ণ হতে হবে, তাই তাঁর মিশনকেও মানব জীবনের প্রতিটি আঙ্গিক অতিক্রম করতে হয়েছে। তবেই আগামী প্রজন্মের জন্য ব্যক্তিগত এবং সাধারণ উভয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত জীবনের একটি সঠিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। যে অমুসলমানরা মুসলমানদের অবিশ্বাস করেছিল এবং তাদের আক্রমণ করেছিল, মুসলমানরা যখন তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত করতে থাকে, সেই সময় ঈশ্বরের আদেশ দান প্রায় শেষের পথে ছিল। বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত আদেশগুলি সেই সময় প্রকাশ করা হচ্ছিল, তবে সবগুলি একই সময়ে নয়, ধীরে ধীরে, বিদ্যমান পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল। ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ বা ফেরেশতাদের দ্বারা অবিশ্বাসীদের শাস্তি না দিয়ে মুসলমানদের হাতে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি এইভাবে শরিয়তের পরিপূর্ণতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, কারণ পয়গম্বরকে যদি প্রতিটি মানবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি করা হয়, তবেই তিনি ইসলামি জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি দিক প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন। কীভাবে একজনকে বাড়িতে থাকতে হবে তাই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং ক্ষমতার শীর্ষ অবস্থানে কীভাবে আচরণ করা উচিত, ঘটনাসমূহের মাধ্যমে সেই সব দৃষ্টান্ত পয়গম্বর নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি আগামী প্রজন্মের জন্য যে নমুনাটি রেখে গিয়েছেন, তা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে ঘিরে শেষ দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

পয়গম্বরত্বের অবসানের জন্য ঈশ্বর যে বিধান রচনা করেছিলেন, তা ঈশ্বরের প্রকাশিত বাণী, অর্থাৎ কুরআন সংরক্ষণের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলি তাদের আসল আকারে সংরক্ষিত না হওয়ার কারণ হল, তাদের সমর্থনে কোনও সুরক্ষামূলক শক্তি সত্যিই আবির্ভূত হয়নি। কিন্তু পয়গম্বর ও তাঁর সহযোগীরা তাঁদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং বিশ্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাতে ঈশ্বরের গ্রন্থ রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা উপভোগ করে, এটিকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করার সমস্ত প্রচেষ্টা নিশ্চিতভাবে বিনষ্ট করা যায়। এক হাজার বছর ধরে কুরআন এইভাবে সংরক্ষিত ছিল, এবং ইসলামি সরকারের একটি

প্রতিরক্ষামূলক শাখার তত্ত্বাবধানে এটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রেরিত হয়েছে। তারপরে মানবজাতি ছাপাখানার যুগে প্রবেশ করেছিল এবং সেখানে কুরআনের আর কোনো ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না।

এটা ভাবা ভুল হবে যে, এসব খুব সহজে সম্পন্ন হয়েছিল। ইসলামকে প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং যথার্থভাবে ঈশ্বরের গ্রন্থের সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য পয়গম্বর ও তাঁর অনুসারীদের অসহনীয় তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। বহুদেবতাবাদী পৌত্তলিকরা অলৌকিক ঘটনা দেখার দাবী করেছিল। পয়গম্বরও তাঁর পয়গম্বরত্বের অলৌকিক নিদর্শন দেখাতে পারলে নিশ্চয় খুশি হতেন। কিন্তু সেটা হওয়ার নয়। বরং পয়গম্বরের চরিত্র ও আচার-আচরণই অলৌকিক নিদর্শনের স্থান নিয়েছিল। পয়গম্বরের বিরোধীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনো স্বর্গীয় বা পার্থিব শাস্তির মুখোমুখি হয়নি, যেমনটি পূর্বতন পয়গম্বরদের অস্বীকারকারীদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। অতীতে ভূমিকম্প ও অগ্নুৎপাত ঘটিয়ে প্রকৃতি যেমন অবিশ্বাসীদের শাস্তি দিত, ঠিক তেমনই শাস্তি দেওয়ার জন্য পয়গম্বর ও তাঁর সহযোগীদের নিজেদেরই ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ঈশ্বরের গ্রন্থ একবারে প্রকাশিত হয়নি; প্রকাশের সময়কাল তেইশ বছর ধরে প্রসারিত হয়েছিল। এই সময়কালে, পয়গম্বরের নেতৃত্বে মুসলমানদের জীবনের সমস্ত চড়াই-উৎরাইয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যার মাধ্যমে ঈশ্বর যে পথটি তাঁর অনুগামীদের অনুসরণ করাতে চেয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হয়েছে।

এই সময়কালে পয়গম্বর ও তাঁর সহযোগীরা যে দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, তা তীব্র উচ্চতায় পৌঁছেছিল — কুরআনে তাকে ‘একটি প্রচণ্ড কম্পন’(-১৬৮) বলে অভিহিত হয়েছে। পয়গম্বরকে অত্যন্ত কঠিন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তিনি যেন তাঁর অত্যাচারীদের সঙ্গে কোনোভাবেই আপস না করেন।(-১৬৯) পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের ঈশ্বরের আহ্বানে ‘পিছিয়ে থাকার’ কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি।(-১৭০) পয়গম্বরের স্ত্রীরা দিনে দুই বেলা খাবার দাবী করলে, তাদের একদিকে “ইহজীবন এবং তার চাকচিক্য” এবং অন্য দিকে “ঈশ্বর এবং তাঁর বার্তাবাহকের পথ”-এর মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।(-১৭১)

পয়গম্বরত্ব প্রতিষ্ঠা, যা 'প্রশংসা ও গৌরবের' বিষয় হয়ে উঠবে, তা ছিল মানব ইতিহাসে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প। এমনকি পয়গম্বরকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, তিনি যেমনভাবে নিপীড়িত হয়েছিলেন 'আর কোনো পয়গম্বর' তেমনভাবে নিপীড়িত হননি। তাঁর স্ত্রী আয়েশা(রা.)-এর কথায় — তাঁর প্রতি এহেন আচরণে তিনি বিধ্বস্ত বোধ করেছিলেন; যদিও তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা জীবনের সমস্ত আয়েশ-আরাম, এমনকি প্রয়োজনগুলিও ত্যাগ করেছিলেন, যাতে মুহাম্মদ(স.)-এর পয়গম্বরত্ব "সকল জাতির জন্য কৃপা" বহন করে আনতে পারে।

এটাই হল একটা মহান অনুগ্রহ, যা হজরত মুহাম্মদ(স.) মানব জাতির প্রতি করেছিলেন। এই কারণেই তাঁর অনুসারীদের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর প্রতি শান্তি ও আশীর্বাদ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাথীরাও এই আহ্বানের অন্তর্ভুক্ত, কারণ তারা তুমুল বাধা বিপত্তির মধ্যেও পয়গম্বরের পাশে দাঁড়িয়েছিল, সবচেয়ে কঠিন যন্ত্রণার সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিল। যারা ইসলামের পয়গম্বরের অনুগ্রহ স্বীকার করে, তাদের পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। মুসলমানরা তাদের পয়গম্বরের জন্য যে শান্তি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করে, তা আসলে প্রার্থনার মাধ্যমে তাদের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। পয়গম্বর যেমন নিজেই বলেছেন "ঐ ব্যক্তি কৃপণ, যে আমার নাম শুনেও আমার প্রতি শান্তি এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করে না।"(-১৭২)

১৫. কুরআন — পয়গম্বরের জীবনের অলৌকিকতা

প্রত্যেক পয়গম্বরকে অলৌকিকতার একটি চিহ্ন দেওয়া হতো। ইসলামের পয়গম্বরের অলৌকিকতা হল কুরআন। মুহাম্মদ(স.)-এর পয়গম্বরত্ব শেষ দিন পর্যন্ত বৈধ থাকবে। অতএব, এটা অপরিহার্য ছিল যে তাঁর অলৌকিক চিহ্নটিও সর্বকালের জন্য স্থায়ী হবে। তাই কুরআন, হজরত মুহাম্মদ(স)-এর চিরস্থায়ী অলৌকিক চিহ্ন হিসাবে আরোপিত হয়েছিল।

এদিকে, হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর বিরোধীরা তার কাছে পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের দ্বারা সম্পাদিত অলৌকিকতা মতো অলৌকিকতা দাবী করছিল। কিন্তু কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে যে এই ধরণের কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটবে না।(-১৭৩) কুরআনে এমনকি পয়গম্বরের উদ্দেশে বলা ছিল:

'যদি ওদের বিমুখতা সহ্য করা তোমার কাছে কঠিন মনে হয় (এবং তাদের একটি অলৌকিকতা দেখাতে চাও), তাহলে তুমি পৃথিবীর একটি সুড়ঙ্গ বা আকাশের একটি সিঁড়ি খোঁজার চেষ্টা কর, যা দিয়ে তুমি ওদের জন্য কোনো নিদর্শন আনতে পার। যদি ঈশ্বর চাইতেন, তাহলে তিনি তাঁদের সকলকে সুপথে পরিচালনা করতেন। তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।'(-১৭৪)

পরিবর্তে, ঈশ্বরের উদঘাটিত গ্রন্থটিকে পয়গম্বরের অলৌকিকতায় পরিণত করা হয়েছিল:'তারা জিজ্ঞেস করে: "তাঁকে কেন তাঁর পালনকর্তা কোনো নিদর্শন দেননি"? বলো "নিদর্শনাবলী ঈশ্বরের হাতে। আমার কর্তব্য শুধুমাত্র স্পষ্ট সতর্ক করা। এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার কাছে সেই গ্রন্থ প্রকাশ করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়েছে? নিঃসন্দেহে এতে রয়েছে প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ।" (-১৭৫)

কুরআনের অলৌকিক প্রকৃতির বিভিন্ন দিক রয়েছে। এখানে আমরা মাত্র তিনটি বিষয়ে মনোনিবেশ করতে চলেছি:

১. কুরআনের ভাষা– আরবি– অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষার থেকে আলাদা, যুগে যুগে যোগাযোগের একটি জীবন্ত মাধ্যম হিসেবে রয়ে গেছে।

২. কুরআন ঈশ্বরীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে অনন্য এই কারণেই যে, এর পাঠ্য মূল আকারে অক্ষত রয়েছে।

৩. কুরআন তার প্রতি সন্দেহকারীদের অনুরূপ একটি গ্রন্থ তৈরি করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। কেউ এই স্পর্ধা দেখাতে সক্ষম হয়নি এবং ঈশ্বরের গ্রন্থের সমতুল্য কিছু তৈরি করতেও পারেনি।

যেসব ভাষায় প্রাচীন সব ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, সেসব ভাষা ইতিহাসের সংরক্ষণাগারে বন্দি হয়ে আছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হল আরবি, কুরআনের ভাষা, যা আজও বিশ্বে প্রচলিত। প্রায় ১৫০০ বছর আগে যে ভাষায় কুরআন প্রকাশ পেয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনও সেই ভাষায় কথা বলে এবং লেখে। এটাই কুরআনের অলৌকিক প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য সাক্ষ্য, কারণ ইতিহাসে অন্য এমন কোনো গ্রন্থ নেই যে গ্রন্থ তার ভাষার উপর এইরকম প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে; অন্য আর কোনো বই নেই যে বই তার নিজস্ব শৈলী অনুসারে একটি সম্পূর্ণ ভাষাকে আকার দিয়েছে এবং বহু শতাব্দী ধরে সেই একই আকার বজায় রেখে চলেছে।

ইঞ্জিল-এর কথাই ধরুন, যা 'নিউ টেস্টামেন্ট' নামে পরিচিত, যার মধ্যে প্রাচীনতম বিদ্যমান অনুলিপিটি আরামাইক নয়, গ্রীক ভাষায়, যে ভাষায় যিশু কথা বলেছিলেন বলে মনে করা হয়। এর মানে হল পয়গম্বর যীশু যা বলেছিলেন এবং যা করেছিলেন তার একটি অনূদিত বিবরণ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে এবং তাও প্রাচীন গ্রীক ভাষায়, যা আধুনিক ভাষা থেকে যথেষ্ট আলাদা। উনিশ শতকের শেষের দিকে গ্রীক ভাষা এতটাই পরিবর্তিত হয়েছিল যে, নিউ টেস্টামেন্টের অন্তত ৫৫০টি শব্দের অর্থ,— সম্পূর্ণ পাঠ্যের প্রায় ১২ শতাংশ,— প্রশ্নের মুখে পড়েছিল। সে সময় একজন জার্মান বিশেষজ্ঞ, অ্যাডলফ ডেইসম্যান, মিশরে কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অংশ আবিষ্কার করেন। সেগুলি থেকে একথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, বাইবেলের গ্রীক প্রকৃতপক্ষে ধ্রুপদী গ্রীকের একটি কথ্য রূপ ছিল। এই ভাষাটি প্রথম শতাব্দীতে প্যালেস্টাইনে কথ্য ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। ডেইসম্যান কিছু

অজানা শব্দের অর্থ সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তবে আরও পঞ্চাশটি মতো শব্দের অর্থ এখনও অজানা রয়ে গিয়েছে।(-১৭৬)

আর্নেস্ট রেনান (১৮২৩-১৮৯৪) সেমিটিক ভাষার উপর বিস্তারিত গবেষণা করেছিলেন। তিনি তাদের শব্দভাণ্ডারের উপর একটি বই লিখেছিলেন, যেখানে তিনি আরবি ভাষা সম্পর্কে বলেছিলেন:

'আরবি ভাষা মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা। ধ্রুপদী যুগে অজ্ঞাত এই ভাষা হঠাৎ করেই একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষা হিসেবে আবির্ভূত হয়। তারপরে এটি আর কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়নি, তাই কেউ এটির প্রাথমিক বা পরবর্তী পর্যায়কে সংজ্ঞায়িত করতে পারে না। এটি আজও ঠিক একই রকম আছে, প্রথম আবির্ভূত হওয়ার সময় যেমনটি ছিল।'(-১৭৭)

ফরাসি প্রাচ্যবিদ রেনান, প্রকৃতপক্ষে কুরআনের অলৌকিক প্রকৃতিকে "মানুষের ইতিহাসের আশ্চর্যজনক ঘটনা" বলে স্বীকার করেছেন। এটি হল কুরআনের অসাধারণ সাহিত্য শৈলী, যা অন্যান্য ভাষার তুলনায় আরবি ভাষাকে পরিবর্তন থেকে রক্ষা করেছে। বিখ্যাত খ্রিস্টান লেখক, জুরগি জায়দান (১৮৬১-১৯১৪), এই সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আরবি সাহিত্য বিষয়ক একটি বইয়ে তিনি লিখেছেন:

'অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ সেই ভাষার ওপর এতখানি প্রভাব ফেলতে পারেনি, যেমনটি কুরআন আরবি সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল।'-১৭৮

যুগে যুগে বিশ্বভাষা এতটাই পরিবর্তিত হয়েছে যে, কোনো আধুনিক ভাষা বিশেষজ্ঞের পক্ষে অভিধানের সাহায্য ছাড়া এর প্রাচীন রূপ বুঝতে পারা সম্ভব নয়। একটি জাতির সমাজ ব্যবস্থায় বিবর্তন এবং সেই ভাষায় সাহিত্যের বিকাশ, এই দুটি প্রধান কারণে ভাষা তার রূপ পরিবর্তন করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বিষয়গুলো অন্য ভাষার মতো আরবি ভাষাতেও কাজ করছে। পার্থক্য হল তারা আরবি ভাষার কাঠামো পরিবর্তন করতে পারেনি। আজকে যে আরবি ভাষায় কথা বলা হয়, তা কুরআন প্রকাশের সময়েও মক্কায় প্রচলিত ছিল। হোমারের ইলিয়াড (৮৫০ খ্রিস্টপূর্ব), তুলসীদাসের রামায়ণ (১৬২৩ খ্রিস্টাব্দ), এবং শেক্সপিয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) নাটকগুলিকে তাদের নিজ নিজ ভাষার সাহিত্যের সেরা রচনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাদের রচনার সময়

থেকে আজ অবধি সেগুলি নিরন্তর পঠিত ও অভিনীত হয়ে আসছে। কিন্তু সেগুলি যে ভাষায় লেখা হয়েছে, তা পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়নি। হোমারের গ্রীক, তুলসীদাসের সংস্কৃত ভাষা, এমনকি শেক্সপিয়রের ইংরেজিও এখন আধুনিক ভাষার পরিবর্তে ধ্রুপদী ভাষায় পর্যবসিত।

কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা একটি ভাষাকে তার নিজস্ব ছাঁচে ঢেলেছে এবং যুগে যুগে সেই ছাঁচ অপরিবর্তিত রেখেছে। আরব দেশগুলিতে বিভিন্ন বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক উত্থান ঘটেছে, কিন্তু কুরআন প্রকাশ হওয়ার সময় আরবি ভাষা যেমন ছিল, তেমনই রয়ে গিয়েছে। আরব সমাজ ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন আরবি ভাষাকে কোনোভাবেই পরিবর্তিত করতে পারেনি। এই সত্যটি একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে কুরআন এক অতিলৌকিক উৎস থেকে এসেছে। পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর উপর অবতীর্ণ এই গ্রন্থের অলৌকিক প্রকৃতি দেখতে গেলে গত ১৫০০ বছরের ইতিহাস ছাড়া আর কিছু না দেখলেও চলে।

ক. সামাজিক উত্থান

ল্যাটিন ভাষার উদাহরণ দেখায় কীভাবে সামাজিক উত্থান বিভিন্ন ভাষাকে প্রভাবিত করে। যদিও পরবর্তী সময়ে ইতালি ল্যাটিন ভাষার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, এটি মূলত সেই দেশের ভাষা ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকের দিকে, লৌহ যুগে, অনেক মধ্য ইউরোপীয় উপজাতি আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কিছু, বিশেষ করে আলপাইন উপজাতি, ইতালিতে প্রবেশ করে এবং রোমের আশেপাশে বসতি স্থাপন করে। তাদের নিজস্ব ভাষা রোমের ভাষার সঙ্গে মিশে যায় এবং এভাবেই ল্যাটিন ভাষার সৃষ্টি হয়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে লুবাস অ্যাড্রোনিকাস কিছু গ্রীক গল্প এবং নাটক ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন; এইভাবে ল্যাটিন ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে গড়ে তোলা হয়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ল্যাটিন তখন থেকেই সরকারি ভাষা হয়ে ওঠে। খ্রিস্টধর্মের প্রসারের ফলে ল্যাটিন ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়েছিল। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থনে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সহায়তায় ল্যাটিন প্রায় পুরো

প্রাচীন ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেন্ট অগাস্টিনের সময়ে ল্যাটিন তার শিখরে পৌঁছেছিল, এবং মধ্যযুগ পর্যন্ত এটি প্রধান আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে বিবেচিত হতো।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী ছিল মুসলিম বিজয়ের যুগ। রোমানরা কনস্ট্যান্টিনোপলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, যা সাম্রাজ্যের পূর্বভাগের রাজধানী হয়ে ওঠে, যতক্ষণ না ১৪৫৩ সালে তুর্কিরা কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করে এবং রোমানদের তাদের সর্বশেষ ঘাঁটি থেকে নির্বাসিত করে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলে বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা, বিশেষ করে ফরাসি, ইতালীয়, স্প্যানিশ এবং পর্তুগিজ সমৃদ্ধ হয়। এই সমস্ত ভাষাগুলির আদিভাষা হিসেবে ল্যাটিন তাদের সকলের উপর একটি শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু নিজে শুধুমাত্র রোমান ক্যাথলিক চার্চের সরকারি ভাষা হিসাবে রয়ে গিয়েছিল। এটি আর জীবন্ত কথ্যভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল না; এটি শুধুমাত্র তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বজায় রেখেছিল এবং প্রযুক্তিগত, আইনি এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ল্যাটিন ভাষা ভালোভাবে বুঝতে না পারলে কেউ নিউটনের লেখা ‘প্রিন্সিপিয়া’ পড়তে পারে না।

প্রতিটি ধ্রুপদী ভাষা প্রায় একই ধাঁচে সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত, মূল ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে অন্য একটি ভাষাকে পথ তৈরি করে দেয়। জাতিগত সংহতি, রাজনৈতিক বিপ্লব, এবং সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ সবসময়ই ভাষার উপর তাদের গভীর প্রভাব রেখে যায়। এই কারণগুলি গত ১৫০০ বছর ধরে আরবি ভাষার উপর কাজ করছে, কিন্তু, আশ্চর্যজনকভাবে, এটি অক্ষত রয়েছে। কুরআনের অলৌকিক আশীর্বাদের কারণে আরবি ভাষা এই অসাধারণ স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করেছে।

৭০ খ্রিস্টাব্দে, কিছু ইহুদি উপজাতি সিরিয়া ছেড়ে মদিনায় বসতি স্থাপন করে, যেখানে আরবিভাষী ‘আমালিকাহ্ উপজাতি বসবাস করত। ‘আমালিকাহ-দের সঙ্গে, ইহুদিরা আরবি ভাষাকে তাদের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তারা যে আরবি ভাষায় কথা বলত তা সাধারণ আরবি থেকে আলাদা ছিল; সে ভাষায় হিব্রু’র জোরালো প্রভাব ছিল। ইসলামের আগমনের পর, আরবরা আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে, যেখানে

আরবি ছাড়াও অন্যানা ভাষায় কথা বলা হতো। অন্যান্য জাতিগুলির সঙ্গে তাদের সংমিশ্রণের ফলে আরবদের ভাষার উপর কিন্তু কোনো প্রভাব পড়েনি; এটি তার মূল অবস্থায় রয়ে গিয়েছে।

কুরআন প্রকাশের পর প্রথম শতাব্দীতে, আরবি ভাষা বিভিন্ন ধরণের শক্তির সংস্পর্শে আসে, যার ফলে একটি ভাষা আমূল পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। এই সময় বিভিন্ন আরব উপজাতির মধ্যে ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, এবং এই মানুষেরা মুসলিম প্রধান শহরগুলিতে জমায়েত বাড়াতে শুরু করলেন। বিভিন্ন আরব গোষ্ঠীর মধ্যে স্বর ও উচ্চারণের যথেষ্ট স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্য ছিল। এতটাই বৈচিত্র্য ছিল যে আবু 'আমর ইবন আল-'উলা' এমন মন্তব্য করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, "হিমিয়ার উপজাতি আমাদের ভাষায় কথা বলে না; তাদের শব্দভাণ্ডার আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।" উমর ইবন খাত্তাব একবার পয়গম্বরের সামনে একজন আরবকে নিয়ে গিয়েছিলেন, যাকে তিনি কুরআন পাঠ করতে শুনেছিলেন। আরব ব্যক্তিটি এমন অদ্ভুতভাবে কুরআনের শব্দগুলি উচ্চারণ করছিল যে, ঈশ্বরের গ্রন্থ (কুরআন)-এর কোন অংশটি পাঠ করা হচ্ছে 'উমর সেটা বুঝতে পারছিলেন না। একবার একটি আরব গোষ্ঠী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হজরত মুহাম্মদ(স.) তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলেছিলেন। হজরত 'আলির মনে হয়েছিল, পয়গম্বর বুঝি কোনো বিদেশি ভাষায় কথা বলছেন।

এই পার্থক্যের প্রধান কারণ ছিল উচ্চারণের ভিন্নতা। উদাহরণস্বরূপ, নজদের পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী বানু তামিমরা 'জে' (জিম) অক্ষরটি উচ্চারণ করতে পারত না এবং তার পরিবর্তে 'ওয়াই' (ইয়ে) উচ্চারণ করত। মসজিদ শব্দটি তারা মঈদ' উচ্চারণ করত, এবং 'শাজরাত' (গাছ) এর পরিবর্তে বলত শরত'। 'কিউ' (কাফ) উচ্চারণ করত 'জে' (জে), ফলে 'তারিক' (রাস্তা) কে বলত 'তারিজ'। তাদের উচ্চারণের ফলে সাদিক' (বন্ধু) হল সাদিজ; কদর' (মূল্য) জাদর' এবং ফাসিম' (পরিবেশক) 'জসিম' হয়ে উঠত। সাধারণ ভাষাগত নিদর্শন অনুসারে, এই ধরণের বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলা উপজাতিদের একত্রিত হওয়ায় আরবি ভাষার পরিবর্তনের একটি নতুন প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হওয়ার ছিল না। কুরআনে ব্যবহৃত ভাষার শ্রেষ্ঠতা আরবিতে এই ধরণের কোনো পরিবর্তন থেকে তাকে রক্ষা করেছিল।

এর পরিবর্তে কী ঘটেছিল তা ডঃ আহমদ হাসান জায়াত নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ব্যাখ্যা করেছেন:

‘ইসলাম আসার পর আরবি ভাষা কোনো একটি জাতির একচেটিয়া হয়ে থেকে যায়নি। যারা বিশ্বাসের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছে, আরবি তাদের সকলের ভাষা হয়ে গেল।’(-১৭৯)

তারপর এই আরব মুসলমানরা পূর্বে কাশঘর থেকে পশ্চিমে জিব্রাল্টার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জয় করে তাদের জন্মভূমি ছেড়ে চলে যায়। তারা যেসমস্ত মানুষদের সংস্পর্শে এসেছিল, তারা ফার্সি, কিবতি, বারবার, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, আরামাইক এবং সূর্যানি প্রভৃতি ভাষায় কথা বলত। এর মধ্যে কিছু জাতি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আরবদের চেয়ে উন্নত ছিল। তারা যে সমস্ত দেশে প্রবেশ করেছিল তার মধ্যে ইরাক, একটি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র এবং প্রধান উপজাতিগুলির সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। তারা ইরানিদের সঙ্গে মিশেছে, যারা এই বিশ্বের দুটি মহান সাম্রাজ্যের একটির মালিক। অত্যন্ত উন্নত রোমান সভ্যতা, এবং ক্রমবর্ধমান খ্রিস্টান ধর্ম, এই দুটি শক্তির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল। তাদের দখলীকৃত দেশগুলির মধ্যে সিরিয়া ছিল, যেখানে ফিনিশিয়, ঘাসানীয়, গ্রীক, মিশরীয় এবং কানা’আনিয়ান উপজাতিরা সাহিত্য ও নীতিশাস্ত্রে অসামান্য ঐতিহ্যের সাক্ষ্য রেখে গিয়েছে। তারপর ছিল মিশর, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের মিলনস্থল। এই কারণগুলি আরবি ভাষাকে রূপান্তরিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল, যেমনটি একই ধরণের শক্তির সংস্পর্শে থাকা অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে হয়েছিল। কিন্তু কুরআনের দ্বারা সেগুলিকে অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছিল, এটি অতুলনীয় সাহিত্য ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের এমন একটি নমুনা: যে ভাষায় এটি রচিত হয়েছিল, তার থেকে কোনো শক্তিই সেই ভাষাকে নাড়াতে পারেনি।

ইসলামের বিজয়ের ফলে আরবি ভাষা আর কোনো একক জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল না; এটি বিভিন্ন জাতি এবং বর্ণের ভাষা হয়ে ওঠে। যখন এশিয়া ও আফ্রিকার “আজমি’রা”(-১৮০) ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তারা ধীরে ধীরে আরবি ভাষাকে তাদের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে। স্বাভাবিকভাবেই, এই নতুন ধর্মান্তরিতরা প্রাচীন আরবদের মতো এই ভাষায় কথা বলতে স্বচ্ছন্দ ছিল না। তারপর আরবরা তাদের নতুন সহ-অধর্মীদের ব্যবহৃত কথ্য ভাষার

দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আরবি ভাষার অবনতি বিশেষত বৃহৎ, বহুজাতিক শহরগুলিতে স্পষ্ট হয়েছিল, যেখানে জাতিগুলি আরও বেশি মিশ্রিত হচ্ছিল। প্রথমে এটি ছিল সাধারণ মানুষের স্তরে, যারা ভাষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম দিকগুলিতে খুব বেশি মনোযোগ দেয়নি, তারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক অভিজাতরাও প্রভাবিত হয়েছিল। একবার এক ব্যক্তি জিয়াদ ইবন উমাইয়ার দরবারে এসে বিলাপ করে বলেছিল, "ছোটো ছোটো সন্তান রেখে আমাদের পিতারা মারা গিয়েছেন", যেখানে 'পিতা' এবং 'সন্তান' উভয় শব্দেরই ভুল প্রয়োগ হয়েছে। এই ধরণের ভুলগুলি বহুল প্রচলিত হয়ে উঠেছিল, তবুও আরবি ভাষা মূলত একই রয়ে গেছে। কুরআনের সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠতার দ্বারা সুরক্ষিত, লিখিত আরবি ভাষা কথ্য সংস্করণের অবক্ষয় দ্বারা কলুষিত হয়নি। এটি কুরআনের মূল ছাঁচেই থেকে গিয়েছে।

কুরআনের অলৌকিক প্রকৃতির প্রমাণের জন্য, একজনকে শুধুমাত্র বিগত ১৫০০ বছর ধরে আরবি ভাষা যে সমস্ত আঘাতের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, আমাদের সেই অভিজ্ঞতার দিকে নজর দিতে হবে। কুরআনের রক্ষাকারী ছত্রছায়ায় না থাকলে আরবি ভাষা অবশ্যই পরিবর্তিত হতো। কুরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অতুলনীয় ধাঁচটি ছন্দোবদ্ধ আরবি ভাষার অপরিবর্তনীয় কষ্টিপাথর হিসাবে রয়ে গেছে।

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে উমাইয়া রাজবংশের পতন আরবি ভাষার জন্য একটি বড় বিপদ ছিল। উমাইয়ারা ছিল বিশুদ্ধভাবে আরব রাজবংশীয়।তারা ছিল আরব জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী সমর্থক, তারা তাদের আরবি সাহিত্য ও ভাষার প্রচারকে প্রায় পক্ষপাতমূলক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। আরবের প্রাণকেন্দ্র দামাস্কাসে তাদের রাজধানী ছিল। তাদের সময়ে, সামরিক এবং বেসামরিক প্রশাসন উভয়ই আরবদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

এরপরে আব্বাসীয়রা ক্ষমতার রাশ হাতে নেয়। ইরানি সমর্থন আব্বাসীয়দের জন্য খিলাফত নিয়ে এসেছিল। তার ফলে এটা প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল যে, তাদের প্রশাসনে ইরানিদের শক্তিশালী প্রভাব বজায় থাকবে। এই প্রভাবের ফলে পারস্যের দ্বারপ্রান্ত বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। আব্বাসীয়রা ইরানিদের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে স্বাধীনতা দিয়েছিল, কিন্তু তারা আরব ও তাদের সভ্যতাকে নীচু চোখে দেখত এবং তাদের দুর্বল করার

সচেতন প্রচেষ্টা করেছিল; অপরদিকে উমাইয়ারা সবসময় উচ্চপদে আরবদের অগ্রাধিকার দিত।

আরবপন্থী পক্ষপাতের অবসানের ফলে, ইরানি, তুর্কি, সিরিয়ান, বাইজান্টাইন এবং বারবার'রা সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সক্ষম হয়। তখন থেকেই আরব ও অ-আরবীয়দের মধ্যে বিবাহ সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আর্য ও সেমিটিক সভ্যতার মিশেলে, আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি এক নতুন সংকটের সম্মুখীন হয়। পারস্যের সম্রাট ও অভিজাতদের নাতিরা তাদের পূর্বপুরুষদের সভ্যতাকে পুনরুত্থিত করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এসব ঘটনা আরবি ভাষার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কবি মুতানাব্বি-র (৯১৫- ৯৬৫ খ্রীস্টাব্দ) সময় আরবি ভাষা যে অবস্থায় পৌঁছেছিল তা নিম্নোক্ত পংক্তিগুলিতে প্রকাশ করা হয়েছে:

"ইরানের ইমারতগুলো সৌন্দর্যে অন্য সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছে, যেভাবে বসন্ত ঋতু অন্য সব ঋতুকে ছাপিয়ে যায়। একজন অপরিচিত আরব যুবক তাদের মাঝে ঘুরে বেড়ায়, তার মুখ, তার হাত, তার ভাষা, সবই তাদের জন্য অপরিচিত। তারা বলে, সলোমন জ্বিনদের সঙ্গে কথোপকথন করতেন, কিন্তু তিনি যদি ইরানিদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তবে তাঁর একজন দো-ভাষীর প্রয়োজন হতো।"-১৮১

একমাত্র কুরআনের সাহিত্যিক মাহাত্ম্যের কারণে আরবি ভাষাকে এইসব উত্থান-পতনের দ্বারা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়নি। ভাষাটি সর্বদা তার কুরআনীয় ভিত্তিতে ফিরে আসে; একটি জাহাজের মতো, যা মহাসমুদ্রে অস্থায়ী ঝড় মোকাবিলা করার পরে, নিরাপদে তার পোতাশ্রয়ের ফিরে আসে।

খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসন আমলে (হি.২০৭-২৪৭) বিপুল সংখ্যক আজামি', বিশেষ করে ইরানি এবং তুর্কি, আরব ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। ৬৫৬ সালে দুর্ধর্ষ মঙ্গোলিয়ান যোদ্ধা হুলাকু খান বাগদাদ অধিকার করেন। পরবর্তীতে ইসলামি সাম্রাজ্য আরও ধাক্কা খেয়েছিল যখন, ৮৯৮ সালে আন্দালুসিয়া খ্রিস্টানদের কবলে পড়ে। মিশর ও সিরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারকারী ফাতিমীয় রাজবংশও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি: ৯২৩ সালে আরব ভূখণ্ডের বিশাল অংশে অটোমান তুর্কিদের দ্বারা তারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। তখন কায়রো থেকে

ইসলামি সরকারের কেন্দ্র কনস্টান্টিনোপলে সরে গিয়েছে; আরবির পরিবর্তে তুর্কি সরকারি ভাষা হয়ে ওঠে, এবং আরবি ভাষা বহু বিদেশি শব্দ এবং বাক্যাংশ আত্মস্থ করতে শুরু করে।

আরবি ভাষা আজমী (অ-আরব) রাজাদের পতাকাতলে সাড়ে পাঁচশ বছর অতিবাহিত করেছে। ফার্সি, তুর্কি এবং মুঘল শাসকরা এমনকি আরবি ভাষার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল। আরবি লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, স্কুল ধ্বংস করা হয়; এই ভাষার পণ্ডিতদের অসম্মান করা হয়। অটোমান সম্রাটরা যে আরবি বিরোধী অভিযান শুরু করেন, তাকে সুপরিচিত সংস্কারক জামালুদ্দিন আফগানি (১৮৩৮-৯৭) উপযুক্তভাবে 'তাত্রিক আল-আরব' (আরবের তুর্কিকরণ) বলে অভিহিত করেন। কিন্তু কোনো প্রচেষ্টাই এতটা শক্তিশালী ছিল না যে আরবি ভাষার মুখে কোনো স্থায়ী রেখাপাত করে। বুখারা এবং বাগদাদে তাতারদের দ্বারা, প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ায় ক্রুসেডারদের দ্বারা, তারপর আন্দালুসিয়ায় অন্যান্য ইউরোপীয়দের দ্বারা আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উপর মারাত্মক আক্রমণ শুরু হয়েছিল। অন্যান্য ভাষার ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, আরব সংস্কৃতির উপর এই আক্রমণগুলি আরবি ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এটা প্রত্যাশিত ছিল যে, আরবি ভাষাও অন্যান্য ভাষার পথ অনুসরণ করবে এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষার সঙ্গে মিশে যাবে। প্রকৃতপক্ষে, এটা বলা যায় যে, আরবি ভাষা যদি তুর্কি অজ্ঞতা এবং ফারসি পক্ষপাতের বিরুদ্ধে এগিয়ে না আসত, তবে আজ সারা মুসলিম বিশ্বে তা উচ্চারিত হতো না। আরব বিশ্বে এর টিকে থাকা কেবলমাত্র কুরআনের অলৌকিক প্রভাবের কারণেই সম্ভব হয়েছে। কুরআনের মাহাত্ম্য মানুষকে আরবি ভাষার প্রতি অনুরক্ত থাকতে বাধ্য করেছে। এটি কিছু আরব পণ্ডিতকে অনুপ্রাণিত করেছিল — ইবন মঞ্জুর (হি,৬৩০-৭১১) এবং ইবন খালদুন (হি, ৭৩২-৮০৮) — এই মহান দুই সাহিত্যিক সেই সময়ের সরকারকে অবজ্ঞা করে সাহিত্য এবং বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

কায়রোতে নেপোলিয়নের প্রবেশ (১৭৯৮) মধ্যপ্রাচ্যে ছাপাখানার যুগের সূচনা করে। মানবজীবনে শিক্ষাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। আরবি ভাষা নতুন প্রাণ পায়। তথাপি বিভিন্ন আঘাতের মুখে আরবি যে

শতবর্ষব্যাপী অস্তিত্বের লড়াই চালিয়েছিল তা তার চিহ্ন রেখে যেতে বাধ্য: বিশুদ্ধ আরবির পরিবর্তে, আরবি ও তুর্কি ভাষার মিশ্রণকে মিশর ও সিরিয়ায় সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৮৮২ সালে মিশরে ব্রিটিশ দখলের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি আবার পরিবর্তিত হয়। তারা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে আরবি ভাষার বিরোধিতা করে, স্কুলে বাধ্যতামূলক ইংরেজি প্রচলন করে এবং পাঠ্যক্রম থেকে অন্যান্য ভাষা বাদ দেয়। ফরাসিরা যে সমস্ত অঞ্চলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেইসময় স্থানে তারাও একই কাজ করেছিল।

ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের প্রজাদেরকে তাদের ভাষা শিখতে বাধ্য করে, একশত বছরেরও বেশি সময় ধরে আরবি ভাষা ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষার ছায়ায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। তবুও এটি এখনও তার আসল আকারেই রয়ে গিয়েছে। নিঃসন্দেহে, এটি কিছু নতুন শব্দ আত্মস্থ করেছে– “দাব্বাবাহ’ শব্দটির বর্তমান অর্থ ট্যাঙ্ক, আগে এটি ‘গদা’ অর্থে ব্যবহৃত হতো। নতুন লেখ্যশৈলীর উদ্ভব হয়। কেন আজকে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে, তা নিয়ে যদি কেউ একটি বই লিখতে চান তবে তিনি এটাকে বলতে পারেন, “লি মাজা আসলামনা’ (কেন আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম?), যেখানে পুরোনো দিনে ছন্দময় এবং আলংকারিক শিরোনাম পছন্দ করা হতো। আরবি ভাষা অনেক শব্দ গ্রহণ করেছে — যেমন ইংরেজি শব্দ, ‘ডক্টর’। কিন্তু এই ধরণের পরিবর্তন শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরে আবদ্ধ ছিল। যথার্থ আরবি ভাষা এখনও একইভাবে অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে যেমনটি বহু শতাব্দী আগে ছিল, যখন কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল।

খ. সাহিত্যের অগ্রগতি

কখনো কখনো, কোনো ভাষার সাহিত্য ক্ষেত্রে এমন সব বিশিষ্ট নামজাদা লেখক আবির্ভূত হন, যাঁদের উপস্থিতি ভাষাটাকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যায় যে, তাঁদের সাহিত্যকর্ম সাধারণ মানুষের ভাষা ব্যবহারের উপর প্রভাব ফেলে। এইভাবে ভাষাগুলি ক্রমাগত প্রগতিশীল বিবর্তনমূলক পর্যায়গুলি অতিক্রম করে, এবং একসময়ে তারা তাদের আসল রূপ থেকে অনেকটা আলাদা হয়ে

যায়। আরবি ভাষার ক্ষেত্রে তা হয়নি। আরবি ভাষার ইতিহাসের শুরুতেই, কুরআন এমন একটি সাহিত্যের মান নির্ধারণ করে দিয়েছে যা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। আরবি ভাষা কুরআন দ্বারা নির্ধারিত শৈলী বজায় রেখেছিল। এরপরে কুরআনের সঙ্গে তুলনীয় কোনো শ্রেষ্ঠতর রচনা রচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তাই আরবি ভাষা সেই ঐশ্বরিক তানের ছাঁচেই রয়ে গেল।

ইংরেজির উদাহরণ দেখুন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এটি একটি সাধারণ স্থানীয় উপভাষা ছিল, যা গভীর বৌদ্ধিক চিন্তা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ছিল না। আরও পাঁচশত বছর এই অবস্থা চলতে থাকে। নরম্যানরা ১০৬৬ সালে ইংল্যান্ড জয় করে এবং, যখন ইংরেজি ভাষার প্রতিষ্ঠাতা জিওফ্রে চসার, ১৩৪০ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন, তখনও তাদের রাজকার্য পরিচালনার সরকারি ভাষা ছিল ফরাসি। চসারের মাতৃভাষা ইংরেজি, এছাড়াও ল্যাটিন, ফরাসি এবং ইতালিয় ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য তাঁকে ইংরেজিকে একটি বিদ্যায়তনিক ভাষায় পরিণত করতে সাহায্য করে। আর্নেস্ট হাউসারের শব্দগুলি ব্যবহার করলে বলতে হয়, তিনি তাঁর 'ক্যান্টারবেরি টেলস'-এর মাধ্যমে ইংরেজি ভাষাকে একটি 'ফার্ম বুস্ট', অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে এগিয়ে দিয়েছিলেন। চসার একটি উপভাষাকে একটি ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন, ভবিষ্যতে তার নতুন অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছেন।

দুশো বছর ধরে ইংরেজ লেখক ও কবিরা চসারের নির্দেশনা অনুসরণ করেছেন। যখন উইলিয়াম শেক্সপিয়র (১৫৫৮-১৬২৫) ইংরেজি সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হলেন, তখন ইংরেজরা আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। তাঁর নাটক এবং কবিতা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি নতুন মান স্থাপন করে, যা ইংরেজিকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এর দুশো বছর পরে বৈজ্ঞানিক যুগের আগমন সমাজের প্রতিটি স্তরের উপর এক অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিল।

ভাষা তখন বিজ্ঞানের নির্দেশ অনুসরণ করতে শুরু করে। কবিতার চেয়ে গদ্য জনপ্রিয় হয়, গল্প বলার চেয়ে বাস্তব তথ্য পরিবেশনা বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে। জোনাথন সুইফট (১৬৬৭-১৭৪৫) থেকে টি, এস, এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) পর্যন্ত কয়েক ডজন কবি ও লেখক এই ধারার প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁরা ইংরেজি সাহিত্যের আধুনিক যুগের নির্মাণ করেছিলেন, আমরা এখনও তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।

অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে পূর্বসূরীদের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় লেখক বা লেখকদের দল উঠে এসেছিলেন। সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হয়ে তাঁরা ভাষাকে একটি নতুন পথে চালিত করেছিলেন। ক্রমে প্রতিটি ভাষা এতটাই পরিবর্তিত হয়েছিল যে, অভিধান এবং ভাষ্যের সাহায্য ছাড়া একজন ব্যক্তির পক্ষে তার নিজের ভাষার প্রাচীন রূপ বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

আর এই সার্বজনীন ধারায় একমাত্র ব্যতিক্রম হল আরবি ভাষা। কুরআনের দাবী, এর মতো আর একটি বই কেউ লিখতে পারবে না, তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। এই সত্যের আরও প্রমাণের জন্য কেবল বহু শতাব্দী ধরে কুরআনের সমতুল্য একটি রচনা তৈরি করার বিভিন্ন প্রচেষ্টার দিকে নজর দেওয়াই যথেষ্ট। সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। মুসাইলিমা ইবন হাবিব, তুলায়হা ইবন খুওয়াইলিদ, নাদর ইবন আল- হারিস, ইবন আল-রাওয়ান্দি, আবুল 'আলা' আল-মার'রি, ইবন আল-মুকাফফা', আল-মুতানাব্বি এবং আরও অনেকে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা, কুরআনের রাজকীয় সাহিত্যিক মহিমার সঙ্গে তুলনা করলে হাস্যকর বোধ হয়। যেমন মুসাইলিমার অসাধারণ বক্তব্য, যেন "গর্ভবতী মহিলাদের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ, তাদের থেকে, পেট এবং ভ্রূণের ঝিল্লির মধ্য থেকে বের হয়ে আসা একটি সুন্দর প্রাণবন্ত জীবন।"(-১৮২)

'এরকম আর একটি গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারবে না'(-১৮৩) — কুরআনের এই দাবীর সবচেয়ে বড় প্রমাণকে আর্নেস্ট রেনান আরবি ভাষার "ভাষাগত অলৌকিকতা" বলে অভিহিত করেছেন। অন্যান্য ভাষার মতো, আরবি ভাষার বিশারদ, মহান কবি ও লেখকেরা যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু, কুরআন প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে দেড় হাজার বছরে, কেউ কুরআনর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোনো কাজ করতে সক্ষম হয়নি। কুরআন যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে, তা কেউ কখনও ছাপিয়ে যেতে পারেনি। কুরআন যে পথ নির্ধারণ করেছে, আরবি ভাষা তাই অনুসরণ করেছে। কুরআনকে যদি কখনো উন্নত করা যেত, তাহলে আরবি ভাষা এইরকম স্থির স্থিতিশীল হয়ে থাকত না। এটি একটি নতুন প্রেরণা পেয়ে নবতর অভিমুখে যাত্রা করত।

আরবি ভাষার উপরে কুরআনের প্রভাব এমন একজন লেখকের

প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয়, যিনি সেই ভাষার ইতিহাসের শুরুতেই একটি অতুলনীয় সাহিত্য কীর্তির অবদান রাখেন। ভাষার ইতিহাসের শুরুতেই তিনি এইরকম এক ছাপ রাখবার পরে অন্য কোনো লেখক সেই ভাষায় আর কোনো পরিবর্তন আনতে পারেন না। কুরআন সেই সময়ে প্রচলিত আরবি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। ফলত আরবি ভাষা এমন এক উন্নততম সাহিত্যের ছাঁচে ঢালা হয়ে গিয়েছিল, আগে বা পরে যার কোনো তুলনা নেই।

প্রচলিত ভাষাগত প্রকাশভঙ্গির সাথে কিছু জরুরি সংযোজন ঘটিয়ে কুরআন আরবি ভাষার সম্প্রসারণের পথ খুলে দিয়েছে। কুরআনের ১১২তম অধ্যায়ে ‘একত্ব’ শিরোনামে ‘এক’ (আহাদ) শব্দের ব্যবহার একটি ভালো উদাহরণ। পূর্বে এই শব্দটি জেনিটিভ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো, — যেমন, ‘আমাদের মধ্যে একজন’, অথবা সপ্তাহের ‘প্রথম দিন’ শনিবার বা ‘ইয়াওম আল-আহাদ’-এর জন্য। এটি সাধারণত নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হতো, — যেমন, ‘মাজা’নি আহাদুন—’ ‘আমাকে কেউ দেখতে আসেনি’। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হিসাবে ‘আহাদ’ শব্দটি ব্যবহার করে, কুরআন শব্দটিকে অভিনবত্ব দিয়েছে। কুরআন অনেক বিদেশি শব্দ আরবি ব্যবহারে নিয়ে এসেছে, উদাহরণস্বরূপ ফার্সি থেকে ‘ইস্তাবরাক’, অ্যাবিসিনিয়ান থেকে ‘কাসওয়ারাহ’, গ্রীক থেকে ‘সিরাত’, সিরিয়ান থেকে ‘ইয়াম’, তুর্কি থেকে ‘গাসাক’, ল্যাটিন থেকে ‘কিস্তাস’, আরমাইক থেকে ‘মালাকৃত’ এবং হিন্দি থেকে ‘কাফুর’। কুরআন আমাদের বলে (২৫:৬০) যে মক্কার পৌত্তলিকেরা রহমান শব্দে বিভ্রান্ত হয়েছিল। তারা বলত, “রহমান কী? এর কারণ হল, শব্দটি আরবি নয়। এই শব্দটি সাবায়িয়ান এবং হামিরি ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। ইয়েমেন ও অ্যাবিসিনিয়ার খ্রিস্টানরা ঈশ্বরকে ‘রহমান’ বলে অভিহিত করত। মক্কাবাসীরা যখন শব্দটিকে বিদেশি মনে করত, তখন এটি কুরআনে একটি আরবি শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা এর ভাষাগত পটভূমি সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার কারণে রহমান বলতে কী বোঝায়, তা জিজ্ঞাসা করেছিল। কুরআনে এইরকম একশোরও বেশি অ-আরবি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ফার্সি, ল্যাটিন ভাষা ছাড়াও নাবাতিয়ান, হিব্রু, সিরিয়ান, কপটিক প্রভৃতি আরও অনেক ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে।

যদিও কুরআন মূলত কুরেইশদের ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল, তবে

অন্যান্য আরব উপজাতিদের দ্বারা ব্যবহৃত শব্দগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ‘আবদুল্লাহ ইবন আল-আব্বাস, একজন কুরাইশ বংশীয় মুসলমান, কুরআনে ‘ফাতির’ শব্দটি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন “আমি জানতাম না আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা’ এই অভিব্যক্তিটির অর্থ কী। তারপর আমি একজন আরবকে বলতে শুনলাম যে সে একটি কূপ ‘সৃষ্টি’ করেছে, যখন সে এটি খনন শুরু করল, এবং তখন আমি জানলাম ‘ফাতির’ শব্দের অর্থ কী।” আবু হুরায়রা বলেন যে, তিনি কুরআনের ‘ইউসুফ’ অধ্যায় না শোনা পর্যন্ত ‘সিক্কিন’ শব্দটি শোনেননি। তিনি বলেন, “আমরা সবসময় ছুরি (মুদ্দিয়াহ) বলতাম”।

জালালউদ্দিন সুয়ুতি ‘আল-ইতকান’-এ উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন আরব উপজাতির দ্বারা অনেক শব্দ ভিন্নভাবে উচ্চারিত হতো। কুরআন এই শব্দগুলির মধ্যে কিছু গ্রহণ করেছে এবং তাদের সবচেয়ে পরিমার্জিত কাব্যিকরূপে ব্যবহার করেছে। উদাহরণস্বরূপ, কুরাইশরা ‘তিনি দিয়েছেন’ এর জন্য ‘আ’আতা’ শব্দটি ব্যবহার করত, যেখানে হিমিয়ারীরা এটিকে ‘আন্তা’ উচ্চারণ করতেন। কুরআন ‘আন্তা’র পরিবর্তে ‘আ’আতা’-কে প্রাধান্য দিয়েছে। একইভাবে ‘শানাতির’-এর পরিবর্তে ‘আসাবি’ এবং ‘কাতা’-র পরিবর্তে ‘জি’ব’ বেছে নিয়েছে। কুরেইশি রূপ পছন্দ করার সাধারণ প্রবণতা কখনও কখনও বিপরীতমুখীও ছিল, যেমন ‘লা ইয়ালিতকুম মিন আমালিকুম’ অর্থাৎ ‘আপনার কর্ম থেকে কিছুই কমিয়ে নেওয়া হবে না’ — বানু আব্বাস উপভাষ্য থেকে নেওয়া হয়েছিল।

পুরোনো আরবি শব্দ ও অভিব্যক্তিকে নতুন গভীরতা ও সৌন্দর্য দান করে কুরআন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের একটি মান নির্ধারণ করেছে যা ভবিষ্যতে কোনো লেখক উন্নত করতে পারেনি। এর ফলে কিছু রূপক পরিবর্তিত হয়েছে, আগের তুলনায় সেগুলি আরও ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। একজন প্রাচীন আরব কবি এইভাবে বিশ্বের অনিত্যতা বর্ণনা করেছিলেন:

“এমনকি যদি তিনি দীর্ঘ সময় নিরাপদ জীবন উপভোগ করেন, তবুও প্রতিটি মায়ের সন্তানকে শেষ পর্যন্ত একটি কফিনে করেই নিয়ে যাওয়া হবে।”

কুরআন একই ধারণাকে মর্মস্পর্শী সংক্ষিপ্ত শব্দে ব্যক্ত করেছে: “প্রত্যেক

প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"(-১৮৪) প্রাচীন আরবের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল হত্যা ও লুণ্ঠন। কিছু কথা এই ধারণা প্রকাশ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল যে, শুধুমাত্র হত্যাই হত্যার অবসান ঘটাতে পারে এবং প্রাক-ইসলামি দিনে এগুলি অত্যন্ত উপযোগী বলে বিবেচিত হতো। তাদের একজন বলেন, "কিছু হত্যা বাকি সকলকে জীবন দেয়", "আরও হত্যা করো, যাতে কম হত্যা করা হয়," এবং "হত্যা হত্যার সমাপ্তি ঘটায়" — এমন আরও কিছু উদাহরণ ছিল। কুরআন ধারণাটি এইভাবে ব্যক্ত করছে : "হে বুদ্ধিমান মানুষেরা, প্রতিশোধমূলক ন্যায়বিচার (ক্বিসাস)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন নিহিত আছে।" (-১৮৫)

প্রাক-কুরআন যুগে, বিশ্বের অন্যান্য ভাষার মতো আরবি ভাষায় কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ভাবের কাব্যিক প্রকাশকে সাহিত্যের অঙ্গনে গৌরবময় স্থান দেওয়া হয়েছিল। কুরআন অবশ্য এই বহুল ব্যবহৃত পথটি ছেড়ে দিয়ে, কবিতার পরিবর্তে গদ্য ব্যবহার করেছে। এই বিষয়টিই প্রমাণ করে যে, কুরআন ঈশ্বর প্রদত্ত, কারণ সপ্তম শতাব্দীতে সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত আর কে-ই বা ভবিষ্যৎকে এমনভাবে জানে, ঠিক যেমনভাবে জানে অতীতকে; তেমনই সে এটাও জানে যে, কবিতার পরিবর্তে গদ্যকে ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিলে তা চিরস্থায়ী হবে। কুরআন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে সম্বোধিত হয়েছিল, এবং গণসংযোগের মাধ্যম হিসাবে গদ্যের তুলনায় কাব্য তার তাৎপর্য হারাল। কুরআনের আগে কাব্যিক ভাষা খুব বেশি প্রচলিত ছিল, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, কুরআন কাব্যিক শৈলীর পরিবর্তে একটি বাস্তবসম্মত গদ্যশৈলী প্রবর্তন করেছিল। এর আগে রোমান্স এবং সামরিক বিষয়াদি সাহিত্য রচনার জন্য জনপ্রিয় বিষয় ছিল। বিপরীতে, কুরআন তার পরিধির মধ্যে নৈতিক, আইনি, বৈজ্ঞানিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য সহ অনেক বিস্তৃত বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে। প্রাচীনকালে, নীতিগর্ভ-রূপক কাহিনি ছিল প্রচারের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। এখানেও, কুরআন নতুন ভূমিতে পা দিয়েছে, প্রচারের আরও সরাসরি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। প্রাক-কোরান যুগে ব্যবহৃত হওয়া পদ্ধতিগুলি থেকে কুরআনে ব্যবহৃত যুক্তির পদ্ধতি যথেষ্ট ভিন্ন ছিল। যদিও এর আগে বিশ্ব কেবলমাত্র বিশুদ্ধ, তাত্ত্বিক ও সাদৃশ্যপূর্ণ প্রমাণের সঙ্গে পরিচিত

ছিল, কুরআন এক পরীক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল। কুরআন এগুলিকে একটি পরিমার্জিত সাহিত্যিক শৈলীতে প্রকাশ করায় সেইসব পরীক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলির কৃতিত্ব আরও বর্ধিত হয়েছে, এবং ভবিষ্যতের জন্য তা অবিনশ্বর প্রমাণিত হয়েছে।

একটি প্রাচীন আরব প্রবাদ ছিল যে, "সবচেয়ে মধুর সেই কবিতাটি, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মিথ্যা রয়েছে।" কুরআন এটিকে পরিবর্তিত করে কল্পনামূলক কাহিনির পরিবর্তে বাস্তব সত্যের উপর ভিত্তি করে 'স্পষ্ট ভাষণ' (৫৫ :০৪)-এর একটি নতুন পদ্ধতি চালু করেছে।

এরপর আরবি ভাষা কুরআনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছে। কুরআনের ভাষা সম্যক অনুধাবন ও সংরক্ষণের কথা মাথায় রেখে প্রাক ইসলামি আরবি সাহিত্য সংকলন ও সংরক্ষণ করা হয়েছিল। কুরআন বোঝার সুবিধার্থে এবং এর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক নতুন ধারার সূচনা হল। আরবি ব্যাকরণ, বাক্য গঠন ও ব্যুৎপত্তিবিদ্যা, ইসলামি ধর্মতত্ত্ব এবং ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা আমাদের কুরআনের বাণী অনুধাবনে সহায়ক হয়েছিল। কুরআনের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্য থেকেই আরবরা ইতিহাস এবং ভূগোল পাঠেও মনোযোগী হয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো একটি বই কোনো জনগণ ও তাদের ভাষার ওপর এত বড় প্রভাব ফেলেছে এমন উদাহরণ আর নেই।

আরবি ভাষার বিকাশ ও উন্নতির মাধ্যমে কুরআন একটি উৎকৃষ্ট ধারার সাহিত্য রচনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। যিনি আরবি ভাষা জানেন, তিনি আরবি সাহিত্যের অন্য যে-কোনো কাজের তুলনায় কুরআনের শৈলীর অনন্য গুণ দেখতে পারেন। কুরআন একটি ঐশ্বরিক শৈলীতে লেখা হয়েছে যা মানুষের উদ্দেশ্য ও সাধ্যক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। আমরা এই অধ্যায়টি একটি গল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত করে শেষ করব, যা স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের এবং মানুষের কাজের মধ্যে পার্থক্যকে চিত্রিত করে। এটি শেখ তানতাভির কুরআনের ভাষ্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

তানতাভি লিখেছেন:

"১৩ জুন ১৯৩২ তারিখে আমি একজন মিশরীয় লেখক রামিল গিলানির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি আমাকে একটি আশ্চর্য গল্প বলেছিলেন। একদিন

তিনি ফিঙ্কল নামে একজন আমেরিকান প্রাচ্যবিদের সঙ্গে ছিলেন, যাঁর সঙ্গে তাঁর এক গভীর বৌদ্ধিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ফিঙ্কেল গিলানির কানে ফিসফিসিয়ে বললেন, "আমাকে বলুন, আপনি কি এখনও তাদের মধ্যে আছেন যারা কুরআনকে অলৌকিক বলে মনে করেন?" এবং মুসলমানদের এই ধরণের অন্ধবিশ্বাসকে উপহাস করে তিনি হাসতে থাকেন। এটি কোনো দৃঢ় বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির উপর ভিত্তি করে হতে পারে না। তাঁর কথা সত্যিই গিলানির মর্মে আঘাত করেছে ভেবে, ফিঙ্কেল দৃশ্যত নিজের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর মনোভাব দেখে গিলানিও হাসতে শুরু করলেন। তিনি বলেন, "কুরআনের শৈলী সম্পর্কে কোনো কিছু বলার করার আগে আমাদের প্রথমে একবার দেখা উচিত যে, আমরা এর সমতুল্য কিছু তৈরি করতে পারি কিনা। মানুষ কুরআনের সমতুল্য কিছু তৈরি করতে পারে কি পারে না একবার দেখে নিয়ে, আমরা চূড়ান্তভাবে এই বিষয়ে কথা বলতে পারব।"

কুরআনের একটি ধারণাকে আরবি ভাষায় ব্যক্ত করার প্রচেষ্টায় গিলানি ফিঙ্কেলকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি যে ধারণাটি বেছে নিলেন তা হল: জাহান্নাম অত্যন্ত বিশাল। ফিঙ্কেল রাজি হলেন, এবং দুজনেই কলম এবং কাগজ নিয়ে বসলেন। তাঁরা দুজনে মিলে প্রায় কুড়িটি আরবি বাক্য তৈরি করেছিলেন। তাঁদের তৈরি করা কিছু বাকোর নমুনা ছিল এইরকম, "জাহান্নাম অত্যন্ত সুবিশাল", "জাহান্নাম তোমার কল্পনার চেয়েও বিশাল," "মানুষের বুদ্ধি জাহান্নামের বিশালতা অনুধাবন করতে পারে না"। যতক্ষণ না তাঁরা সম্মত হচ্ছেন যে এই ধারণা প্রকাশ করার জন্য এর চেয়ে ভালো অন্য কোনো বাক্য নেই, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা চেষ্টা করেছিলেন। গিলানি বিজয়ীর দৃষ্টিতে ফিঙ্কেলের দিকে তাকালেন। "এখন যেহেতু আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, আমরা এবারে দেখতে পাব মানুষের সমস্ত কাজের ঊর্ধ্বে কীভাবে কুরআন বিরাজ করে", তিনি বলেছিলেন। "সে কি, কুরআন কি এই ধারণা আরও অলঙ্কারপূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে?" ফিঙ্কেল জিজ্ঞাসা করলেন। গিলানি তাঁকে বলেছিলেন, "কুরআনের তুলনায় আমরা ছোটো শিশুর মতো।" বিস্মিত হয়ে ফিঙ্কেল জিজ্ঞেস করলেন, "কুরআনে কী আছে?" গিলানি সুরাহ কাফ-এর এই আয়াতটি পাঠ করেছিলেন: "যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব: 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছো?' এবং জাহান্নাম উত্তর দেবে: 'আরও কি কেউ

আছে?'(-১৮৬) এই আয়াতটি শুনে ফিঙ্কেল চমকে উঠলেন, কুরআনের বাগ্মিতায় বিস্মিত হয়ে তিনি প্রকাশ্যে পরাজয় স্বীকার করলেন; "আপনি ঠিক বলেছেন, একদম ঠিক", তিনি বললেন, "আমি অকপটভাবে পরাজয় স্বীকার করছি"। গিলানি উত্তর দিয়েছিলেন, "আপনার জন্য সত্যকে স্বীকার করা অদ্ভুত কিছু নয়, কারণ আপনি একজন পণ্ডিত মানুষ, ভাষাশৈলীর তাৎপর্য সম্পর্কে ভালো জানেন।" এই বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ ইংরেজি, জার্মান, হিব্রু এবং আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং এই ভাষার সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য তাঁর সমস্ত জীবন ব্যয় করেছিলেন।(-১৮৭)

১৬. পয়গম্বরের সহযোগী(সাহাবা)-রা

পয়গম্বরের সহযোগী বা সাহাবা-রা ইতিহাসে তাঁর পাশে অবস্থান করেন ঠিক যেভাবে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁরা তাঁর পাশে ছিলেন, কারণ পয়গম্বরকে সাহায্য করার জন্যই সৃষ্টিকর্তা তাঁদের নির্বাচিত করেছিলেন। তাঁর ঐশ্বরিক মিশনকে সফলভাবে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে তাঁরা তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ বলেছেন: "পয়গম্বরের অনুগামী হওয়ার জন্য এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর তাঁদের মনোনীত করেছিলেন।"

আসুন এখন পয়গম্বরের সহযোগীদের অসামান্য কিছু গুণাবলী দেখে নেওয়া যাক, যেগুলোর জন্য তাঁরা ইতিহাসে স্থান লাভ করেছেন।

ক. তাঁরা ইসলামকে ভালোবেসেছিলেন

কুরআনে বর্ণিত সাথী বা সাহাবাদের অন্যতম গুণ ছিল বিশ্বাসের প্রতি অটুট অনুরাগ।(-১৮৮) এর চরমতম অভিব্যক্তি হল ভালোবাসা; এটি আমাদের কোনো কিছুর জন্য সর্বোচ্চ অনুভূতি; এটি আমাদের অন্য সব চিন্তা থেকে মুক্ত করে। প্রিয়জনের প্রতি আমাদের প্রীতিপূর্ণ মনোভাব হল একটি সহজাত প্রবৃত্তি। আমরা জানি কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়, কারণ আমাদের ভালোবাসার বস্তুর জন্য প্রকৃত অনুভূতি গড়ে ওঠে। তার সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ আমাদের নিজের হয়ে যায়। এমনই ছিল ইসলামের জন্য হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর অনুগামীদের অনুভূতির তীব্রতা। তারা তাদের বিশ্বাসের সাফল্যে আনন্দিত হতো, যেমন একজন পিতা তাঁর পুত্র সাফল্যে আনন্দিত হন। ইসলাম যখন বাধার মুখে পড়ত, তখন তাঁরা তার প্রতিকার না করা পর্যন্ত শান্তি পেতেন না।

যখন কেউ নিজেকে একটি আদর্শগত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে, যেমনটি পয়গম্বরের সহযোগীরা ইসলামের সঙ্গে করেছিলেন, তাদের মনোভাব কী

হওয়া উচিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্তরের উদ্যমই তাদের পথ দেখায়। একজন ব্যক্তি তার জন্য সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে এবং সেই আদর্শের স্বার্থকে সে অন্য সব কিছুর উপরে স্থান দেয়। এই কারণে তখন আমাদের ক্ষতিগুলিও আমাদের লাভে পরিণত হয় এবং এর দাবির সামনে আমাদের ব্যক্তিগত মূল্য হ্রাসের কোনো অনুভূতি থাকতে পারে না। আমরা এর কারণে যে অসুবিধার সম্মুখীন হই না কেন, তা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারি কারণ, আমরা প্রবল উৎসাহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি।

এই সাহাবীদের ব্যাপারে অসাধারণ বা অতিপ্রাকৃত কিছুই ছিল না। তাঁরা অন্যদের মতোই সাধারণ মানুষ ছিলেন। যেটা তাঁদের বাকি মানবজাতির থেকে আলাদা করে তুলেছিল, সেটা হল যে, সত্যিকারের ভালোবাসার অনুভূতি, (যা বেশিরভাগ মানুষ কেবল নিজের জন্য অনুভব করে), তাঁরা সেটা ইসলামে বিশ্বাসের জন্য অনুভব করেছিলেন। সাধারণ মানুষ যেমন তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে, তাঁরাও ঠিক তেমন করেই তিলে তিলে ইসলামের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছেন। মানুষ যেমন তাদের সমস্ত শক্তি ও ধন-সম্পদ নিজেদের লক্ষ্য পুরণের জন্য নিয়োজিত করে, তেমনি তাঁরা ইসলামের স্বার্থের জন্য তাদের সর্বস্ব পণ করেছিলেন। এটা ছিল ইসলামের প্রতি তাঁদের অনুরাগের গভীরতা, যা তাঁদের বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল।

খ. প্রথম থেকেই পয়গম্বরকে স্বীকৃতি দেওয়া

হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সাহাবীদের একটি অনন্য গুণ ছিল যে, তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক একজন পয়গম্বরকে চিনতে পেরেছিলেন। নিজের সমকালীন পয়গম্বরকে চেনা ও বিশ্বাস স্থাপন করা ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সাহাবীরা ব্যতীত অন্য কেউ, অন্য কোনো সময়ে তা করতে পারেনি। প্রাচীন ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে যখন কোনো পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর সময়কালে তাঁকে অস্বীকার করা হয়েছিল এবং উপহাস করা হয়েছিল। বাইবেলে উল্লেখ আছে, “আপনারা আমার পয়গম্বরদের সম্পর্কে কিছুই ভাবেননি।” এই মানুষেরা কারা ছিল

যারা পয়গম্বরদের সম্পর্কে "কিছুই ভাবেননি?" তারাই ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঐশ্বরিক উদ্ঘাটনে বিশ্বাসী ছিল। তারা পয়গম্বরদের নামে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। তারা তাদের ক্যালেন্ডারে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন পয়গম্বরদের স্মৃতিসম্বলিত দিনগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তবে এটি ছিল কেবলমাত্র প্রাচীন পয়গম্বরদের জন্য, যাদের তারা এইভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল। অথচ, তাদের সমসাময়িক পয়গম্বরদের তারা চিনতে না পেরে উপহাস এবং অবজ্ঞাই করত।

ইহুদিরা যিশুকে অবিশ্বাস করেছিল, যদিও তারা মুসা বা মোজেসকে বিশ্বাস করত। যিশুর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা থাকাকালীন সময়ে খ্রিস্টানরা পয়গম্বর মুহাম্মদ(স.)-কে অস্বীকার করেছিল। এমনকি মক্কার কুরাইশরাও আবরাহামের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য নিজেরা গর্ব অনুভব করত; কিন্তু যখন আবরাহামের ধারায় একজন পয়গম্বরত্বের উত্তরাধিকারী তাদের সামনে আসেন, তখন তারা তাঁকে আক্রমণ করে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল।

একদিকে প্রাচীন পয়গম্বরদের প্রতি মানুষের আচরণ এবং অন্যদিকে সমসাময়িক পয়গম্বরদের প্রতি মানুষের আচরণের মধ্যে কেন এত অসংগতি ছিল? এর কারণ ছিল প্রাচীন পয়গম্বররা ছিলেন ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁরা জনগণের জাতীয় ঐতিহ্যের অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠেন। পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা প্রাচীন পয়গম্বরদের পবিত্র বীরের মর্যাদা দিত এবং তাদের জাতীয় পরিচয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দেখত। স্পষ্টতই, বিশ্বাস করার জন্য অনেক বেশি প্রণোদনা থাকলেও খুব কম লোকই এহেন বিশ্বাসকে প্রতিরোধ করবে। একজন সমসাময়িক পয়গম্বরের ক্ষেত্রে অবশ্য পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর পয়গম্বরত্ব তখনও একটি বিতর্কিত বিষয়। তাঁর উদ্দেশ্য সর্বদাই সন্দেহের চাদরে ঘেরা। তাঁকে বিশ্বাস করতে হলে বাহ্যিক চেহারাকে অতিক্রম করে দেখতে হবে। তাঁকে অনুসরণ করতে গেলে, তাঁর মিশনের সত্যতাকে কেন্দ্র করে বিদ্যমান সমস্ত সন্দেহপ্রবণ চিন্তাভাবনাকে কবর দিতে হবে। তাঁর পয়গম্বরত্ব তখনও ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা পায়নি। এই পরিস্থিতিতে, একজন পয়গম্বরকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন কাজ। কিন্তু হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সহযোগী সাথীরা এই কাজ করতে পেরেছিলেন; তাঁদের সমকালীন একজন পয়গম্বরকে

প্রাচীন যুগের একজন পয়গম্বরের সমান মর্যাদা দিয়ে মেনে নিয়েছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় (হিজরী সাল ৫) মদিনা কুরাইশ এবং তাদের অন্যান্য আরব মিত্রগোষ্ঠীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিল। যতক্ষণ না মুসলমানদের জন্য জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলোও পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এই অবরোধ ততক্ষণ পর্যন্ত জোরদার করা হয়। এই সময় একজন মুসলমান হতাশ হয়ে বললো, "মুহাম্মদ(স.) আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে খসরু ও সিজারের সমস্ত ধন-সম্পদ আমাদের হবে, আর এখন এখানে আমরা শান্তিতে থাকতে পর্যন্ত পারছি না।" যখন এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তখন পয়গম্বরের প্রতিশ্রুতি শুধু একটি প্রতিশ্রুতিই ছিল, যা পূরণ হওয়ার ধারেকাছেও ছিল না, যদিও এখন এটি প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়। তথাপি, পয়গম্বরের প্রতিশ্রুতি ইতিহাসে পরিণত হওয়ার আগেই তাঁর সহযোগীরা তাঁর মহত্ত্ব স্বীকার করেছিলেন। আজ যারা তাঁর মহত্ত্ব স্বীকার করছে তারা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণের পর এবং ইতিহাসে তাঁর ওপর মহত্ত্বের সীলমোহর পড়ার পর, তাঁর মহত্ত্ব স্বীকার করেছে। এই দুটি স্বীকৃতির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। একটির সঙ্গে অন্যটির তুলনা হয় না। আজ, অমুসলিম ঐতিহাসিকরাও মানব ইতিহাসে হজরত মুহাম্মদ(স.)-কে গৌরবের স্থান দিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু, তাঁর জীবদ্দশায়, তাঁর মহত্ত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া ভীষণ সমস্যার বিষয় ছিল। এটি শুধুমাত্র তারাই করতে পারে যারা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছে।

গ. কুরআনকে মেনে চলা, যখন তা ছিল একটি বিতর্কিত বিষয়

হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সহযোগী সাথীদের সত্য প্রচারের পদ্ধতি ছিল — কুরআনের একটি প্রচলিত অংশ তুলে ধরা এবং তা মানুষের কাছে পাঠ করে প্রচার করা। এই কারণে যে সকল সহযোগী ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য মদিনায় গমন করেন, তাদের কুরআনের 'মুকরি' অর্থাৎ কুরআনের আবৃত্তিকার বলা হয়। একটি আধুনিক পরিবেশে, এটি তেমন অসাধারণ কিছু বিষয় নয়। কিন্তু যখন কেউ আমাদের এবং হজরত মুহাম্মদ(দ.)-এর সহযোগীদের মধ্যে অবস্থিত ১৪০০ বছরের ইতিহাসকে একপাশে রেখে তাদের সেই সময়ে বিরাজমান অবস্থার কথা কল্পনা করে, তখন তাদের কাজটি সম্পূর্ণ নতুন

দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। সে সময় মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করা ছিল একটি বিশাল কাজ, যা তাঁর সহযোগীরা ছাড়া অন্য কোনো দল কখনও পালন করেনি।

আজ কুরআন শব্দটি উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে যে চিত্রটি মনে আসে, তা হল একটি গ্রন্থ, যা ১৪০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, কোনো সন্দেহের ছায়া ছাড়াই এর মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ একে ঈশ্বরের গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছে। কুরআনের প্রতি বিশ্বাস এবং প্রশ্নাতীত আনুগত্য ব্যক্ত করা বাক্তিগত গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও প্রকাশের সময় কুরআন এই মর্যাদা ভোগ করেনি। সাহাবা বা সাথীদের সমসাময়িক অনেকেই কুরআনকে তাচ্ছিল্য ও উপহাসের বস্তু হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কুরআন প্রকাশের বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন, “আমরা সেগুলি শুনেছি, আমরা যদি ইচ্ছা করতাম, আমরাও ঐরকম কথা বলতে পারতাম। এগুলি কেবল পুরাতন কল্পকাহিনি মাত্র।”(-১৮৯) তারা বলত,”তিনি প্রাচীনকালের কল্পকাহিনি লিখেছেন, ওগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয়।(-১৯০)

এমন পরিস্থিতিতে কুরআনে বিশ্বাস করাটা ছিল ভবিষ্যতের ঘটনাগুলোকে এমনভাবে দেখা, যেন তা আগেই ঘটে গিয়েছে। মানুষের চোখে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই অপ্রকাশিত সত্যটি দেখতে পাওয়ার জন্য এক বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। তাহলে অনুমেয়, কুরআনকে একজনের প্রচারকর্মের ভিত্তি করাটা কতটা কঠিন ছিল। সেটি করা মানে ব্যক্তিগত মহত্ত্বকে অস্বীকার করে অন্য একজনের মহত্ত্বকে স্বীকার করা, যার মহত্ত্ব তখনও বিশ্ব গ্রহণ করেনি। বিখ্যাত আরব কবি লাবিদ ইসলাম গ্রহণ করার পর কবিতা লেখা ছেড়ে দেন। তাঁকে কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন; “কী? কুরআনের পরেও?” আজ যদি কোনো কবি একই কারণে তাঁর লেখা ত্যাগ করেন, তবে তিনি প্রস্তুত প্রশংসা ও জনপ্রিয় সম্মান পাবেন। “কুরআনের আবির্ভাবের পর আমি কীভাবে কবিতা লিখব?”, বলতে গিয়ে তিনি কুরআনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন, যার পিছনে রয়েছে এক গৌরবময় ইতিহাস। কুরআনের ইতিহাসের একেবারে শুরুতেই লাবিদ এই কথাগুলো বলেছেন। ইতিহাস কোনো কিছুর প্রতি মহত্ত্বের মুকুট চড়িয়ে তাকে মহিমান্বিত করার পরে, তার গুরুত্ব স্বীকার করা এবং তার আগেই সেই বিষয়টির গুরুত্ব

বুঝে তার মাহাত্ম্য অনুধাবন করা, এই দুটি বিষয়ের কোনো তুলনা হয় না। কুরআন এই পার্থক্যকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছে:

“তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পূর্বে তাদের ধন-সম্পদ দান করেছে এবং যুদ্ধে অংশ নিয়েছে তাদের মর্যাদা, যারা পরে দান করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তাদের চেয়ে অনেক উন্নত হবে।(-১৯১)

ঘ. এমন একটি সত্যের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করা যা তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি

নিম্নলিখিত ঘটনাটি ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ-এর ভিত্তিতে ইবন আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন। যখন কুরআনের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হল, “কে আছে, যে ঈশ্বরকে উত্তম ঋণ দেবে? তার জন্য তিনি তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন, এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।”(-১৯২) তখন আনসারদের আবু দাহদাহ পয়গম্বরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঈশ্বর কি সত্যিই চান, যে তাঁরা “ঈশ্বরকে ঋণ দান করবেন।” পয়গম্বর সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। “আমাকে আপনার হাতটা দিন”, আবু দাহদাহ পয়গম্বরকে বললেন। পয়গম্বর আবু দাহ্‌দাহ্‌-এর হাতে তার হাত রেখেছিলেন কারণ, আবু দাহদাহ তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর পুরো বাগানটি তাঁর প্রভুকে ধার দেবেন, যার মধ্যে ছশো খেজুর গাছ রয়েছে। এই সময় তাঁর স্ত্রী উম্মে দাহদাহ তাঁর সন্তানদের সঙ্গে বাগানে ছিলেন। আবু দাহ্‌দাহ এসে তাঁকে এটি ছেড়ে দিতে বললেন, কারণ তিনি এটি মহান প্রভুকে দান করেছিলেন। “আপনি কি অসাধারণ ভালো একটা চুক্তি করেছেন।” উম্মে দাহদাহ্‌ আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জিনিসপত্র এবং সন্তানদের নিয়ে বাগানের বাইরে চলে গেলেন। “আবু দাহদাহ স্বর্গে কতই না বৃক্ষ পাবে যা ফলে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ থাকবে,” পয়গম্বর এই দান সম্পর্কে বলেছেন।

এই ঘটনাটি হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সহযোগী সাথীদের বিশ্বাসের জোরে তাঁদের সম্পদ দান করার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে এই ঘটনাটি ১৪০০ বছর আগে ঘটেছিল। যদি কেউ আজ তাদের ধর্মের নামে অনুরূপ দানশীলতার কাজ করে, তাহলে সে খুব সম্ভব মুসলমানদের

থেকে অনেক সম্মান পাবে, যার মূল্য তার ব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশি হবে। কিন্তু সেই সময়ে ব্যাপারগুলো ছিল একেবারেই অন্যরকম। তখনকার দিনে ধর্মের নামে ব্যয় করাকে সমাজ পাগলামি মনে করত, নিন্দার চোখে দেখত। কাউকে খ্যাতির উচ্চ শিখরে উন্নীত করা দূরে থাক, এটি ছিল আত্মবিস্মৃতির গর্তে নিজেকে সমাহিত করার মতো। যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সহযোগীরা তাঁদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করেছিলেন, সেই সময় তা ছিল সন্দেহে পরিবৃত। তখনও তার সমর্থনে ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ জোগাড় হয়নি। ইসলামের সত্য তখনো সমাজে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তথাপি সহযোগীরা ইসলামের ইতিহাসের সেই অনিশ্চিত সময়ে তাঁদের ধর্মের স্বার্থে তাঁদের নিজস্ব সম্পদ দান করেছিলেন। এখন, ১৪০০ বছর পরে, ইসলামের মহিমা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়েছে, যা বহু শতাব্দীর ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত। সমাজে যার স্থান সুসংহত হয়নি এমন একটি কারণের জন্য অর্থ ব্যয় করা, আর একটি সুসংহত প্রতিষ্ঠিত কারণের জন্য অর্থ ব্যয় করা, দুটি সম্পূর্ণ বিষয়।

৬. অন্যের মাথায় নিজের মুকুট স্থাপন করা

পয়গম্বরের মদিনায় অভিবাসনের আগে, 'আব্দুল্লাহ ইবন উবাই সেই শহরে একজন স্বাভাবিক নেতা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর চরিত্র, ব্যক্তিগত কারিশমা এবং বুদ্ধিমত্তার কারণে মদিনার জনগণ তাদের রাজা হিসেবে তাকে বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তারা তাদের মধ্যে এতদিন ধরে চলতে থাকা গৃহযুদ্ধ ও সংঘাতের অবসান ঘটানোর জন্য তাঁকেই সঠিক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছিল। 'আব্দুল্লাহ ইবন উবাইকে মদিনার রাজা রূপে অভিষিক্ত করার জন্য একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

মদিনায় ইসলাম যখন প্রথম আসে তখন আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থাও সম্পন্ন হয়েছিল। মদিনার লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং ইসলাম সেখানকার প্রতিটি গৃহে তার অনুসারীদের খুঁজে পেয়েছিল। সে সময় একটি প্রতিনিধি দল মক্কা সফরে যায়, যেখানে তারা পয়গম্বরের সঙ্গে দেখা করে এবং তাঁর মুখ থেকে ইসলামের কথা শোনে। তখন তারা উপলব্ধি করলো, তাদের সমাজে রাজত্ব করার জন্য

তাদের ‘আবদুল্লাহ ইবন উবাই নয়, বরং হজরত মুহাম্মদ(স)-এর প্রয়োজন ছিল। মদিনার জনগণের পক্ষ থেকে তারা পয়গম্বরকে তাদের শহরে এসে তাদের নেতা হিসেবে দায়িত্ব নিতে বলেছিল। তারা ‘আকাবা-য় পয়গম্বরের কাছে আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল, এই ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ ছিল।

এর সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক প্রভাব ছাড়াও, আনুগত্যের এই ঘটনা ছিল অসাধারণ। যেন মদিনার লোকেরা নিজেদের মাথা থেকে মুকুটটি তুলে নিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তির মাথায় রাখছে। মানুষ সর্বদা তাদের নিজস্ব জাতি বা উপজাতির বাইরের কাউকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক থাকে। এমন পদক্ষেপ প্রাচীন আরবে শোনা যায়নি। এই ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও কঠিন ছিল, কারণ তারা যে মুহাম্মদ(স.)-কে গ্রহণ করেছিল তিনি তখনও সেই মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেননি, যেভাবে আমরা আজ তাকে জানি। তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যাঁকে তাঁর নিজের লোকেরাই বহিষ্কার করেছিল। তিনি শুধু একজন বিতর্কিত ব্যক্তিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন গৃহহীন, নিঃস্ব মানুষ। মদিনার লোকেরা তাঁকে সব কিছু দিয়েছিল, বিনিময়ে তাদের কিছুই পাওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল না। বিংশ শতাব্দীতে আমরা কিছু পশ্চিমী চিন্তাবিদ — বিশেষ করে জর্জ বার্নার্ড শ-এর কথা শুনেছি। তাঁর মতানুসারে, হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর মতো একজন ব্যক্তি পশ্চিমী বিশ্বের একজন চমৎকার নেতা হতে পারতেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই ধরণের প্রস্তাব দেওয়া অবশ্য একেবারেই ভিন্ন বিষয় ছিল, কেননা সেই সময়ে পয়গম্বরের নেতৃত্ব বিষয়ক যে অনন্য গুণাবলী ছিল, তা ইতিহাসের পাতায় তখনও স্থান পায়নি।

চ. নিজের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করা

পয়গম্বর মুহাম্মদ(স.) চলার পথে উদ্ভূত প্রতিটি বিষয় নিয়ে তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তিনি তাঁদের একত্রে ডাকতেন এবং পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পর তাঁদের মতামত জানতে চাইতেন। যদিও তিনি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করতেন, বাস্তবে যা হতো তা হল কিছুক্ষণ নীরবতার

পরে আবু বকর উঠে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর মতামত পেশ করতেন। তারপর ‘উমর একই কাজ করতেন এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরপর তাঁদের মতামত ব্যক্ত করলে, পয়গম্বর অবশেষে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন। খলিফা হিসাবে আবু বকরের সময়কালে একই পদ্ধতিতে আলোচনা করা হতো। ‘উমর প্রথমে বক্তৃতা করতেন, তারপর আরও কয়েকজন তাঁদের মতামত দিতেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে সবার সম্মতি থাকত। ‘উমরের খিলাফতের সময়কালে, যে সময় পয়গম্বরকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, পরামর্শ প্রক্রিয়ায় কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে থাকল।

এই ঘটনাটিকে একটি সাধারণ বিষয় বলে মনে হতে পারে, তবে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে বোঝা যায় হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর সহযোগী সাহাবীরা কতটা বিনয়ী ছিলেন, নিজেদের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন। এই ধরণের একটি পদ্ধতি শুধুমাত্র সেই সমস্ত বিনয়ী মানুষেরাই অবলম্বন করতে পারেন, যাঁরা নিজেদের তুলনায় অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করার মতো উদার হতে পারেন। এটি ছিল সহযোগীদের একটি অনন্য গুণ। তারা নিজেদের প্রতি এমন পক্ষপাতহীনভাবে দেখতেন, যেমনভাবে গড়পড়তা লোকেরা অন্য অপরিচিতদের দিকে তাকায়।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যে আবু বকর ও ‘উমর সম্পর্কে আমরা কথা বলছি তাঁরা তখনও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেননি। সেই সময় দাঁড়িয়ে আবু বকর ও ‘উমরের মূল্য বোঝা অনেক বেশি কঠিন ছিল। ইতিহাস যখন নির্মাণের পর্যায়ে ছিল, তখনও এই দুইজন ব্যক্তিকে প্রশংসা করতে হয়; আর এখন বর্তমান দিনে আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের মূল্যায়ন করার অবস্থানে আছি।

সাহাবীদের কাছে তাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যেকার দুজন সাধারণ মানুষ; আমাদের কাছে তাঁরা ইতিহাসের দিগন্তে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি শক্তিশালী স্তম্ভ। আমরা আবু বকর ও ‘উমরকে স্বীকার করতে ব্যর্থ হলে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হবে। কিন্তু সাহাবীদের পক্ষে এই দুজনকে স্বীকার করা তাদের নিজেদের আত্মত্যাগের সমতুল্য ছিল — এটা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ, যা সাহাবীরা অসাধারণভাবে সম্পন্ন করেছিলেন।

ছ. নিজের উপর দায়িত্বভার নেওয়া

জাত-আল-সালাসিল ছিল সিরিয়ার মরুভূমির একটি স্থান, যা ঘাসানীয় এবং কালব উপজাতিদের দখলে ছিল। সেখানে পয়গম্বর 'আমর ইবন আল-'আসের নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। 'আমর যখন সেখানে পৌঁছেছিলেন এবং শত্রুদের প্রস্তুতি দেখতে পেলেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পক্ষে তাঁর নিজের বাহিনী খুব দুর্বল। এরপর তিনি শিবির স্থাপন করেন এবং পয়গম্বরের কাছে একটি বার্তা পাঠান যাতে তিনি শক্তিবৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত সেনা চেয়েছিলেন। পয়গম্বর তখন ২০০ মুহাজিরের একটি অতিরিক্ত বাহিনী প্রস্তুত করেন, যা আবু 'উবায়দা ইবন আল-জাররাহ-র নেতৃত্বে প্রেরিত হয়েছিল। আবু 'উবায়দার বাহিনী যখন 'আমর ইবন আল-আসের সঙ্গে যোগ দেয়, তখন প্রশ্ন ওঠে যে কে সংযুক্ত বাহিনীর নেতা হবেন। 'আমর ইবন আল-'আসের কোনো সংশয় ছিল না যে তাঁরই নেতৃত্ব পাওয়া উচিত, কারণ তাঁর অনুরোধেই শক্তিবৃদ্ধির জন্য বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। আবু 'উবায়দা-র সহযোগীরা এতে রাজি হয়নি। তারা মনে করেছিল যে, আবু 'উবায়দাকে পুরো সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে হবে, অন্যথায় যে বিভাগটি আলাদা পরিচালনার অধীনে থাকা উচিত। মতবিরোধ চরমে উঠলে আবু 'উবায়দা 'আমরকে সম্বোধন করে বললেন, তিনি পয়গম্বরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে তাঁরা দুজন একে অপরের সঙ্গে একমত হবেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। "যদি তুমি আমার অবাধ্যও হও", তিনি বললেন, "আমি তোমার অনুগত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

আবু 'উবায়দা চাইলে নিজের অবস্থানে অটল থেকে যেতে পারতেন এবং 'আমরকে পিছু হটতে বাধ্য করতে পারতেন। তাঁর অবস্থানের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি পাওয়া যেত। কিন্তু তিনি এই ধরণের একটি পথ পরিহার করেছিলেন এবং পরিবর্তে একতরফাভাবে তর্কের অবসান ঘটাতে নিজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সমাজ জীবনে, অনুরূপ উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করতে মানুষের সক্ষম হওয়া প্রয়োজন। অধিকার নিয়ে তর্ক করার পরিবর্তে মানুষ যখন উদারভাবে তাদের নিজস্ব দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, তখনই একটি সমাজ সুসংহতভাবে কাজ করতে পারে। এটি করার জন্য ব্যতিক্রমী সাহসের প্রয়োজন, এছাড়া সমাজে একতা রক্ষার অন্য কোনো উপায় নেই।

জ. ক্ষোভ পুষে না রাখা

খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ ছিলেন একজন অত্যন্ত সাহসী এবং দক্ষ সৈনিক, যিনি পয়গম্বরের সময় থেকে আবু বকরের খিলাফত পর্যন্ত সিরিয়ায় মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। 'উমর অবশ্য খালিদের কিছু অভ্যাসকে অনুমোদন করতেন না এবং আবু বকরকে বলেছিলেন খালিদকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতে। আবু বকর 'উমরের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেননি, কিন্তু 'উমর তাঁর সিদ্ধান্তে এতটাই স্থির ছিলেন যে, খলিফা হওয়ার পরে তিনি খালিদকে বরখাস্ত করেন। মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রধান সেনানায়ককে একজন সাধারণ সৈনিকের পদে অবনমিত করা হয়েছিল।

যখন আদেশ আসে, তখন খালিদ তাঁর সামনে নত হয়ে পড়েছিলেন এবং এই সময়ে সিরিয়ার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল। হঠাৎ তাঁর বরখাস্তের খবর আসে এবং সেই জায়গায় আবু 'উবায়দা ইবন আল-জাররাহকে নিযুক্ত করা হয়।

এই খবরটি খালিদের সেনাবাহিনীকে হতবাক করে দেয় এবং একদল সৈন্য তাদের নেতার তাঁবুতে জড়ো হয়। তারা তাঁকে তাদের সমর্থনের আশ্বাস দেয় এবং তাঁকে খলিফার আদেশ অমান্য করার জন্য অনুরোধ জানায়। খালিদ তাদের বিদায় জানিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি 'উমরের জন্য যুদ্ধ করছিলেন না; তিনি 'উমরের প্রভুর জন্য যুদ্ধ করছিলেন। আগে তিনি প্রধান সেনানায়ক হিসেবে যুদ্ধ করছিলেন; এখন তিনি একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে যুদ্ধ করবেন।

শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি যিনি ক্ষোভ এবং ক্রোধের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন, যিনি জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকেন, তিনি এই পদ্ধতিতে কাজ করতে পারেন। খালিদের কথায় বোঝা যায়, তিনি কতটা গভীরভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে নিবেদিত ছিলেন, এতটাই যে তিনি 'উমরের সিদ্ধান্তকে নির্দ্বিধায় সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

ঝ. আইনত যা করতে বাধ্য, তার থেকে বেশি কাজ করা

হিজরি সাল ৬–এর শা'বান মাসে পয়গম্বর খবর পান যে ১০০০ লোকের একটি বাহিনী কুরাইশ নেতাদের অধীনে একত্রিত হয়েছে এবং মদিনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ছয়শত সৈন্য ছিল বর্ম পরিহিত, এবং সেখানে একশো জন অভিজাত অশ্বারোহীর একটি বাহিনী ছিল। মদিনায় চরম উত্তেজনা চলছিল। কী করা উচিত এই বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করতে পয়গম্বর তাঁর সহযোগী সাহাবী এবং আনসারদের একটি বৈঠক ডেকেছিলেন। এই উপলক্ষে সাধারণত যেমন ঘটে থাকে, সাহাবীদের প্রবীণ সদস্যরা তাঁদের মতামত দিতে উঠেছিলেন। "হে ঈশ্বরের পয়গম্বর", তাঁরা বললেন, এগিয়ে যান এবং আপনার প্রভু যা আদেশ করেন, তাই করুন। আমরা আপনার পাশে দাঁড়াব। যেমনটা আমাদের আগে ইহুদিরা করেছিল, তেমন কথা আমরা আপনাকে বলব না, — 'আপনার প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করতে চলে যান, আমরা এখানে বসে আছি।'(-১৯৩) বরং আমরা আপনাকে বলছি, যান, এবং আপনার প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনার সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করব। যতক্ষণ আমাদের মধ্যে একজনের শরীরেও প্রাণ থাকবে, আমরা আপনাকে ত্যাগ করব না।"

মুহাজিরদের কাছ থেকে এমন চূড়ান্ত আশ্বাস সত্ত্বেও, পয়গম্বর তাঁর করণীয় সম্পর্কে উপদেশ নিতে থাকেন। আনসারদের একজন, সা'দ ইবন মু'আজ উঠে দাঁড়ালেন, "সম্ভবত আপনি আমাদের কথা ভাবছেন", তিনি পয়গম্বরকে বললেন। পয়গম্বর বললেন যে, সে কথা সত্য। তখন সা'দ ইবন মু'আজ তাঁর সহযোগী আনসারদের পক্ষ থেকে পয়গম্বরকে এই কথাগুলি বলে আশ্বস্ত করলেন: "আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস রেখেছি এবং আপনাকে ঈশ্বরের পয়গম্বর হিসেবে স্বীকার করেছি। আমরা আপনার শিক্ষার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছি। আমরা আপনার কথা শুনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি এবং আপনি যা বলবেন, আমরা তা মেনে চলব। সুতরাং আপনি যা উচিত মনে করেন তাই করুন, হে ঈশ্বরের পয়গম্বর, আমরা আপনার পাশে থাকব। যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে আমাদের মধ্যে পাঠিয়েছেন, আমরা তাঁর নামে শপথ করছি, আপনি আমাদের সমুদ্রের তীরে নিয়ে গেলেও, এবং আমাদের সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেও, আমরা আপনাকেই অনুসরণ করব। আমাদের মধ্যে কেউ পিছিয়ে থাকবে না। আগামীকাল যুদ্ধ করার জন্য আপনার পক্ষে যোগ দিতে আমাদের

কোনো দ্বিধা থাকবে না। আমরা যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সংঘাতের সময়ে আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি সৎ থাকব। সম্ভবত ঈশ্বর আমাদের এমনভাবে নিজেদের প্রমাণ করতে সুযোগ দেবেন, যা আপনার কাছে আনন্দদায়ক হবে। ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্বাস রেখে আমাদের আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।” সা’দ ইবন মু’আজ যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হওয়ার একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

বদর যুদ্ধের সময় (হিজরি সাল ৩) পয়গম্বর আনসারদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। ইবন হিশাম তাঁর উদ্বেগের পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লেখেন, “যখন আনসাররা ‘আকাবায় আনুগত্যের দ্বিতীয় শপথ গ্রহণ করেছিল, তখন সেই শপথ অনুসারে, তারা মদিনার বাইরে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে দায়বদ্ধ ছিল না। তারা বলেছিল, “আপনি আমাদের দেশে থাকাকালীন আমরা আপনাকে রক্ষা করব, যেমন আমরা আমাদের নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের রক্ষা করি।” এই সব কিছুই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু পয়গম্বর আশঙ্কা করেছিলেন যে, একমাত্র মদিনায় শত্রুপক্ষ প্রবেশ করলেই আনসাররা তাঁকে সাহায্য করতে নিজেদের দায়বদ্ধ মনে করবে এবং শহরের সীমানার বাইরে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে তারা দায়বদ্ধ মনে করবে না।

একথা সত্য, যদিও আনসাররা ‘আকাবা-য় প্রতিরক্ষা চুক্তিতে প্রবেশ করেছিল, তার শর্ত অনুসারে, তারা মদিনা থেকে আশি মাইল দূরে বদর যুদ্ধে যোগদানের জন্য কঠোরভাবে চুক্তিবদ্ধ ছিল না। কিন্তু আনসাররা এটাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেনি। এটা তাদের কৃতিত্ব যে, তারা পয়গম্বরের সঙ্গে করা তাদের চুক্তির শর্তের ঘেরাটোপের বাইরে বদরের রণাঙ্গনে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল।

ঞ. বিতর্ক এড়িয়ে চলা, এবং নিজের মূল লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা

মাসর ইবন মাখরামার সূত্রের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক তাবারানি আমাদের বলেন, পয়গম্বর কীভাবে এক অনুষ্ঠানে তাঁর সহযোগী বা সাহাবীদের এই কথাগুলো বলে সম্বোধন করেছিলেন: “ঈশ্বর আমাকে সকলের জন্য করুণাস্বরূপ পাঠিয়েছেন, তাই আমার কাছ থেকে যা শুনেছেন তা অন্যদের

জানিয়ে দিন। ঈশ্বর তাঁর করুণা প্রকট করবেন। একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া করবেন না, যেমন মেরি(মারিয়াম) পুত্র যিশু(ঈশা)-কে নিয়ে তাঁর শিষ্যরা ঝগড়া করেছিল। তিনি তাঁর শিষ্যদের যে বিশেষকার্য সম্পাদনের আহ্বান জানিয়েছিলেন, আমিও এখন আপনাদের সেই একই আহ্বান জানাচ্ছি। কিন্তু যাঁরা দূরে ছিলেন, তাঁরা বিষয়টি পছন্দ করেননি এবং যেতে বারণ করেন। যিশু এই বিষয়ে তাঁর প্রভুর কাছে অভিযোগ করেছিলেন।" "আমরা আপনার বার্তা পৌঁছে দেব", সহযোগীরা তাঁকে জবাবে আশ্বস্ত করলেন। "আপনি যেখানে খুশি আমাদের পাঠান।"

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব একটি সম্প্রদায়ের পক্ষে সবচেয়ে বড় অন্তরায়, এই কারণে সদস্যরা একটি গঠনমূলক কর্মকাণ্ড অনুসরণ করতে পারেন না। পয়গম্বরের সহযোগী সাথীরা নিজেদের তুচ্ছ তর্ক বিতর্কের গোলকধাঁধার মধ্যে ডুবে যেতে দেননি। ঈশ্বরের ভয় তাঁদের গভীর দায়িত্ববোধে আবদ্ধ করেছিল। তাঁরা এই দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করেছিলেন, এবং বিবাদ, বাগবিতণ্ডার জন্য তাঁদের কোনো সময় ছিল না। পয়গম্বরের জীবদ্দশাতেই তাঁরা ইসলামকে আরব উপদ্বীপের সীমানা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁরা যেন তাঁর নির্দেশ অনুসারেই কাজ করতে থাকেন। স্বার্থসিদ্ধির সমস্ত চিন্তা ছেড়ে তাঁরা প্রতিবেশী দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের বাড়িগুলো ছিল ছোট ছোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো, যেখানে তাঁরা আরবি ভাষা, কুরআন এবং পয়গম্বরের সুন্নাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। এভাবে তাঁরা পয়গম্বরের কাছ থেকে যা শুনেছিলেন, তা চারদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন।

এটা ছিল মহান ইসলামি বিজয়ের যুগ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি অংশকে একটি সম্প্রসারিত সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়েছিল। সাহাবা (সহযোগী)-রা রাজনৈতিক ক্ষমতা, বৈভবে অংশ নেবেন বলে আশা করা যেতে পারত, কিন্তু তাঁরা এই জাতীয় কোনো প্রবণতা দেখাননি। তাঁদের অধিকাংশই ইসলামের বিজয়ের ফলে সৃষ্ট পরিবেশকে তাঁদের প্রচার লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁদের এবং তাঁদের শিষ্যদের অবিচলিত, নীরব প্রচেষ্টায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একটি বিশাল বিস্তৃত অঞ্চল তৈরি হয়েছিল, যা এখন 'আরব বিশ্ব' নামে পরিচিত। তাঁরা শুধু তিনটি মহাদেশ

জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মানুষের ধর্মই পরিবর্তন করেননি, তাঁরা তাদের কাছে একটি নতুন ভাষা ও সংস্কৃতিও নিয়ে পৌঁছেছিলেন।

ট. অপরিচয়ের আবরণে সন্তুষ্ট থাকা

পয়গম্বরের মৃত্যুর পর প্রথম যে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে হয়েছিল তা হল খলিফা নির্বাচন। আনসাররা তাদের নিজস্ব প্রার্থী সা'দ ইবন 'উবাদাহকে সামনে রেখেছিল। যখন মুহাজিররা আনসারদের প্রস্তাবের কথা জানতে পারল, তখন তাদের একটি দল দ্রুত বানু সা'দাহের তাকিফাহ্ (ছাউনি)-এর দিকে ছুটে গেল, যেখানে আনসাররা জড়ো হয়েছিল। আবু বকর তাদের সম্বোধন করে বললেন, "আপনারা যে গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন, আপনারা সেসব দ্বারা সমৃদ্ধ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আরব জনগণের নেতৃত্বের জন্য, আমাদের অবশ্যই কুরাইশদের দিকে তাকাতে হবে। ভৌগোলিক এবং জাতিগতভাবে, তারা আরব জীবনে একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে। আমি আপনাদের কাছে 'উমর এবং আবু 'উবায়দা ইবন অল-জাররাহ্, এই নাম দুটি প্রস্তাব করব; আপনারা তাদের মধ্যে যাকে খুশি নির্বাচন করুন।

এরপর 'উমর উঠে দাঁড়িয়ে খলিফা হিসাবে আবু বকরের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করলেন। আনসার 'উমরের দেখানো পথ গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মুহাজিরদের বললেন যে, তাঁরা যা করেছেন, তা সা'দ ইবন 'উবায়দাকে হত্যার সামিল।

ইসলামের জন্য আনসাররা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যখন ইসলাম তার নিজস্ব এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, তখন তাঁরা ইসলামের আটকে পড়া জাহাজটিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তবুও সেই অবদান সত্ত্বেও, তাঁরা আরও একটি বড় ত্যাগ করতে রাজি হয়েছিলেন। তাঁরা ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব ত্যাগ করে একজন কুরাইশি খলিফার পিছনে সম্মিলিত হয়েছিলেন। এই নিয়োগের একটি উপযুক্ত কারণও ছিল। মুহাজিররা যে কুরাইশ গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন, সেই গোষ্ঠী বহু শতাব্দী ধরে আরবের নেতা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। অন্য কোনো উপজাতির একজন নেতা একটি ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন পেতেন না। এই প্রেক্ষিতে আনসাররা

তাঁদের নিজেদের সীমাবদ্ধতাগুলির বিষয়ে যথেষ্ট বাস্তববাদী ছিলেন, এবং মুহাজিরদের একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নিঃস্বার্থ বাস্তবোধের তুলনীয় উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

ঠ. আবেগের সংকটের সময় যৌক্তিক সিদ্ধান্ত

উহুদের যুদ্ধ (হিজরি সাল ৪) ছিল ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ। বদর যুদ্ধে পরাজয়ের পর কুরাইশদের সকল যোদ্ধা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে মুসলমানদের উপর চড়াও হয়। যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে ছিল, তখন পয়গম্বর তাঁর তরবারি বের করে তাঁর সহযোগীদের জিজ্ঞেস করলেন, তাদের মধ্যে কে তা তুলে নেবে এবং তার পূর্ণ ব্যবহার করবে। প্রথম যে কয়েকজন স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন, পয়গম্বর তাদের তরবারি দেননি। অতঃপর আবু দুজানাহ্ এগিয়ে এলেন এবং পয়গম্বরকে জিজ্ঞেস করলেন, তরবারির সম্পূর্ণ উপযোগিতা কী? "যতক্ষণ না এটি বেঁকে যায় ততক্ষণ আপনি এটি দিয়ে শত্রুকে আঘাত করবেন", পয়গম্বর জবাব দিলেন। "আমি সেভাবেই এটি চালাব", আবু দুজানাহ্ বললেন, কারণ তিনি তরবারি গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পয়গম্বর তাঁকে তরবারিটি দিলেন। যখন আবু দুজানাহ্ সেই তরবারি হাতে চলে গেলেন, তখন তাঁর গর্ব স্পষ্টত দৃশ্যমান ছিল। পয়গম্বর বললেন, "এই ধরণের আত্মম্ভরিতা ঈশ্বরকে খুশি করতে পারে না, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে এটি সেই বিচার থেকে অব্যাহতি পায়।" আবু দুজানাহ তাঁর মাথায় একটি লাল কাপড় বেঁধে, আমৃত্যু লড়াই করার জন্য তাঁর প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি সত্যিই অবিশ্বাস্য সাহসিকতার সঙ্গে নিজেকে পরিচালনা করেছিলেন; যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সামনে যারা এসেছে তাদের সবাইকে তিনি আঘাত করেছিলেন। তারপরে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে, পরে আবু দুজানাহ নিজেই যা বর্ণনা করেছিলেন, "আমি একজনকে দেখেছিলাম, তিনি সবিশেষভাবে হিংসাত্মক উপায়ে শত্রুকে প্ররোচিত করছিলেন। আমি তাঁর দিকে ছুটে গেলাম এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য আমার তরবারি তুলে নিলাম। সেই ব্যক্তি চিৎকার করে উঠলে আমি দেখলাম যে, তিনি একজন নারী। আমি একজন নারীকে হত্যা করে পয়গম্বরের তরবারিকে অপমান করা থেকে বিরত রইলাম।"

অপর এক সাহাবী ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন। "আমি দেখেছিলাম যে আবু দুজানাহ্ হিন্দ বিনত 'উতবাকে হত্যা করার জন্য তাঁর তরবারি তুলেছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর মাথার উপর থেকে তলোয়ারটি সরিয়ে দিলেন।" যুদ্ধের সময় পয়গম্বর যে আদেশ জারি করতেন তার মধ্যে একটি ছিল — নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করা যাবে না। যুদ্ধের চরম উত্তপ্ত সময়েও আবু দুজানাহ্ পয়গম্বরের আদেশের কথা মনে রেখেছিলেন এবং তাঁর তরবারিটি যখন তাঁর শিকারের উপর নিখুঁতভাবে উদ্যত ছিল, তখন তিনি তাকে প্রত্যাহার করে নিলেন, যখন তিনি দেখলেন যে সেই শিকার একজন মহিলা।

এ থেকে বোঝা যায় আবেগের ওপর সাহাবীদের কতটা সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ছিল। অপ্রতিরোধ্য আবেগের মুহূর্তগুলিতেও, তাঁরা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁরা যতই চরম উত্তেজনার মুখোমুখি হোন না কেন, উত্তেজনাহীনভাবে বিষয়গুলি বিচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি যখন রাগ এবং প্রতিহিংসার অনুভূতিগুলি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তখনও তাঁরা মনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ণ গতিতে চলার সময় হঠাৎ দিক পরিবর্তন করা যথেষ্ট সহজ মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এটি অত্যন্ত কঠিন।

এই ধরণের কাজ কেবল তিনিই করতে পারেন, যিনি ঈশ্বরের ভয়ে এমনভাবে চলাচল করেন যে মনে হয় যেন স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর সমস্ত শক্তি ও স্বমহিমায় সর্বক্ষণ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ড. গাছের মতো বেড়ে ওঠা

সহযোগীদের দুটি গুণ বর্ণনা করার জন্য কুরআন তোরাহ্ এবং ইঞ্জিল (ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট) উভয়েরই উল্লেখ করে। তোরাহ-র উদ্ধৃতিগুলি তাঁদের স্বতন্ত্র গুণাবলী ব্যাখ্যা করে, অপর দিকে, ইঞ্জিল সেই সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে তাঁদের গুণাবলীর দৃষ্টান্ত প্রদান করে।

'তোরাহ্(তৌরত) এবং গসপেল(ইনজীল)-এ তাদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তারা সেই বীজের মতো, যা অঙ্কুরিত হয় এবং তা ক্রমে শক্তিশালী হয়, যাতে তা সেই বৃন্তের উপর সোজা এবং দৃঢ়ভাবে বেড়ে ওঠে, বীজ

বপনকারীদের আনন্দ দেয়। তাদের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা অবিশ্বাসীদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি করেন। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্য ঈশ্বর ক্ষমা ও মহা-পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'(-১৯৪)

উপমাটি নিউ টেস্টামেন্টে এইভাবে উপস্থাপিত হয়েছেঃ

'এবং তিনি বলেছিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যও এমন যেখানে একজন মানুষ মাটিতে বীজ নিক্ষেপ করে,

এবং রাতে ও দিনে যথাক্রমে ঘুমায় এবং জেগে ওঠেঃ বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং বেড়ে ওঠে, কীভাবে এসব ঘটে, সে তা জানতেও পারে না। পৃথিবী জানান দেয় ফল জন্ম নেবে; প্রথমে পাতা বেরিয়ে আসবে, তারপর ডালপালা, তারপর সেই ডালপালাতে শস্য।

কিন্তু ফসল পেকে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে সে তাতে কাস্তে লাগায়, কারণ ফসল তোলার সময় এসেছে। এবং সে বলল, "ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা আমরা কোথায় করব? বা কীসের সঙ্গে তুলনা করব?"

এটি একটি সরিষার দানার মতো, যা পৃথিবীতে বপন করা সমস্ত বীজের চেয়ে কমঃ

কিন্তু যখন এটি বপন করা হয়, তখন তা বেড়ে ওঠে এবং সমস্ত উদ্ভিদের চেয়ে বড় হয় এবং বড় বড় শাখাগুলি বের করে, যাতে বাতাসে উড়ে যাওয়া পাখিরা তার ছায়ার নীচে অবস্থান করতে পারে।(-১৯৫)

এই কাহিনিটি কুরআন এবং বাইবেল উভয় গ্রন্থেই বলা হয়েছে; পয়গম্বরের সহযোগীদের সামাজিক বিবর্তন কীভাবে একটি বৃক্ষের মতো হয়ে উঠবে, এখানে সেই কথা বলা হয়েছে। একটি ক্ষুদ্র বীজ হিসাবে শুরু করে, তাদের সমাজের স্তম্ভটি একটি বৃক্ষের গুঁড়ির মতো বিকশিত হবে, ধীরে ধীরে তার শিকড় মাটির নীচে সংহত করবে এবং উপরে মুক্ত বাতাসে তার শাখাগুলি প্রসারিত করবে। তারা ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক পর্যায় মেনে বড় হবে, অবশেষে তাদের বিকাশের শিখরে পৌঁছোবে। তাদের চমৎকার বিকাশ বিশ্বাসী মানুষদের পরিতৃপ্তি এবং শত্রুদের হতাশার কারণ হবে।

পয়গম্বরের সহযোগীদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায় নির্বাচিত করা হয়েছিল, যাঁরা ইসলাম ধর্মকে একটি বৃক্ষের মতো বেড়ে উঠতে সাহায্য করবেন।

ঈশ্বর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মানে এই নয় যে, কাজটি সহজ হবে। তাঁদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল, যারা দ্রুতগামী পথ পরিহার করে ধৈর্যের পথ অনুসরণ করেছিল। তাঁদের ইচ্ছা এবং ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দগুলিকে ত্যাগ করতে হয়েছিল, সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। ইসলাম ধর্মের মহীরুহটিকে অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে সহযোগীদের সর্বস্ব দিতে হয়েছিল, এই পৃথিবীতে কোনো প্রত্যাশার পরোয়া না করে তাদেরকে সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনায় নিঃশর্তভাবে জড়িত থাকতে হয়েছিল। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, ইসলাম ধর্ম স্থায়ীভাবে একটি সমৃদ্ধ বাগানে পরিণত হয়েছিল, যা পৃথিবীর কোনো শক্তি ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি।

চতুর্থ পর্ব

১৭. বর্তমান দিন এবং যুগে পয়গম্বরত্বের উদ্ভাস

ঈশ্বরের এই অধ্যাদেশ ছিল যে সর্বশেষ পয়গম্বর, হজরত মুহাম্মদ(স.) অন্যান্য ধর্মের উপরে সত্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন।(–১৯৬) ইসলামের পয়গম্বরের প্রতি আরোপিত এই বিশেষ দায়িত্ব তাঁর অনুগামীদের উপরও ন্যস্ত ছিল। হজরত মুহাম্মদ(স.) যে ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন, তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা আসলে একটি সুবৃহৎ ঐশী প্রকল্পের রূপায়ণ, পূর্ববর্তী ২৫০০ বছর ধরে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পয়গম্বরের একমাত্র কাজ ছিল তাকে পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করা। পয়গম্বরের উম্মাহ বা তাঁর সম্প্রদায়ের জন্যও এই কথা প্রযোজ্য। গত এক হাজার বছর ধরে সত্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভিত্তি তৈরি হয়েছে। তাদের সামনে যে সমস্ত সুযোগসুবিধা আছে, মুহাম্মদ(স.)-এর অনুগামীরা যদি তার বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তাহলে ঈশ্বরের অনুগ্রহের আশীর্বাদ নিশ্চয় তাদের ওপর বর্ষিত হবে। এটা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-য় ‘মানুষ এবং তার দেবতারা’ (ম্যান অ্যান্ড হিজ গডস) শীর্ষক প্রবন্ধটি পয়গম্বর মুহাম্মদ(স.)-এর আনা ইসলামি বিপ্লব ‘কীভাবে মানবসভ্যতার গতিকে পরিবর্তন করেছিল’, সেই কথা বলে।(–১৯৭) এর লেখক, একজন প্রাচ্যবাদী খ্রিস্টানের পক্ষে ইসলামের অনন্য ঐতিহাসিক প্রভাব স্বীকার করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। ইসলাম যা এনেছিল, তা সমগ্র মানবতার আধ্যাত্মিক মুক্তির চেয়ে কিছু কম নয়। মূর্তিপূজা ও কুসংস্কারের বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ জীবনের সব ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারল। এই অগ্রগতিগুলি, যেগুলি ছিল ইসলামি বিপ্লবের ফলাফল, আজ সেগুলি আবার নতুন করে ইসলামের কাজে লাগানো যেতে পারে। ইসলামি আধিপত্যের

পুনরুত্থানের জন্য অবস্থা একেবারে আদর্শ। সুস্থ, সিক্ত, উর্বর জমি যেমন ভালো ফসল দেয়, তেমনই তা সহজে বাস্তবায়িত হতে পারে।

পয়গম্বর এবং তাঁর সহযোগীরা যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, তা অবশ্যই একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব ছিল। একেশ্বরবাদ এবং মৃত্যু পরবর্তীকালের ধারণার উপর এই বিপ্লবের ভিত্তি দৃঢ় ছিল। তার পার্থিব প্রতিক্রিয়াও ছিল সুদূরপ্রসারী। এমতাবস্থায় অতীতের তুলনায়, সত্য ধর্মের প্রচার অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে এসেছিল। সমগ্র মানবসমাজকে ডাক দিয়ে যিনি ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর পথের প্রধান বাধাগুলি এক বিশাল সামাজিক পরিবর্তনের ঢেউয়ে ডুবে গিয়েছিল।

অনুশোচনা(আত-তওবা) শিরোনামে কুরআনের সূরাটি যখন অবতীর্ণ হল, তখন হজরত মুহাম্মদ(স.) এই বার্তা দিয়ে 'আলিকে মক্কা পাঠালেন যে, ভবিষ্যতে কোনো পৌত্তলিককে হজ্জ্ব করতে দেওয়া হবে না। যে প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি এই ঘোষণা করেছিলেন, তাতে তাঁর গলা ভেঙে গিয়েছিল। আজকের দিনে হলে তিনি স্বচ্ছন্দে এই কাজটা লাউডস্পীকারের সাহায্যে করতে পারতেন। এটা একটা সাধারণ উদাহরণমাত্র, কিন্তু এতে সহজে বোঝা যায় সত্য ঘোষণার জন্য কীভাবে আধুনিক সুযোগসুবিধা ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই সত্যধর্ম প্রচারের দুটি প্রধান কালপর্ব আছে, — প্রথমটি সর্বশেষ পয়গম্বরের কর্মকাণ্ডের আগে, এবং দ্বিতীয়টি, তার পরের পর্ব। মুহাম্মদ(স.)-এর আবির্ভাবের আগে, ঐশী সাহিত্যগুলি রক্ষা করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল পয়গম্বরদের অনুগামীদের উপর। কুরআনের ভাষায়, তাদের দায়িত্ব ছিল "ঈশ্বরের গ্রন্থটিকে রক্ষা করা"।(-১৯৮) কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ঈশ্বর নিজেই একথা পরিষ্কার করে দিলেন যে, "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমি এর সংরক্ষণ করব।"(-১৯৯)

এটাও ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল যে, ইসলামের পয়গম্বরের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বহুদেবতার উপাসনা বন্ধ হয়ে পৃথিবীতে একেশ্বরবাদের ধারণা শ্রেষ্ঠত্ব পাবে।(-২০০) একমাত্র তিনিই এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেন, যা মানবচিন্তনে এহেন পরিবর্তন সাধনের পক্ষে অনুকূল। মুহাম্মদ(স.)-এর আগমনের ২৫০০ বছর আগেই ইসলামি বিপ্লবের ভিত্তিভূমি তৈরি

হয়ে গিয়েছিল। হজরত মুহাম্মদ(দ.)-এর দায়িত্ব ছিল এই ভিত্তির উপরেই একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা। পয়গম্বরের সময়ের ইসলামি বিপ্লব বহু-দেবতাবাদকে চিরকালের মতো পরাজিত করে। পয়গম্বর এবং তাঁর সহযোগীদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে বহু-দেবতাবাদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হল। তবু, এই বর্তমানকালে একেশ্বরবাদ যেন আবার তার প্রাধান্য হারাতে বসেছে। আজকের পৃথিবীতে নাস্তিকতাবাদী চিন্তন উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে এবং বস্তুত একেশ্বরবাদের গুরুত্ব অপ্রধান হয়ে পড়েছে।

ঈশ্বর অবশ্যই সম্যক জানতেন যে নাস্তিকতাবাদ আবার পৃথিবীতে মাথাচাড়া দেবে। সেইমতো তিনি একটি উদ্ধারপদ্ধতিও নির্ধারণ করেছিলেন- বিশ্বে এমন এক অবস্থা তৈরি করেছিলেন যা নাস্তিকতাবাদকে প্রতিহত করে একেশ্বরবাদী চিন্তনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবে। এই প্রক্রিয়া গত এক হাজার বছর ধরে চলছে — এখন তা তুঙ্গে পৌঁছেছে। যদিও এখনও বিশ্বে নাস্তিকতাবাদের প্রাবল্য রয়েছে, তবুও একেশ্বরবাদী চিন্তনের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অবস্থাটি আদর্শ।

প্রায় চার হাজার বছর আগে, আবরাহাম [ইবরাহীম(আ.)] প্রাচীন ইরাকের রাজধানী উর অঞ্চলে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে একমাত্র ঈশ্বরই সমস্ত লাভক্ষতির নিয়ন্তা। তাঁর কোনো শরিক নেই। একমাত্র তাঁর কাছেই মানুষ সাহায্য প্রার্থনা করতে পরে এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য। একেশ্বরবাদের এই বার্তা সেই সময়ের রাজা নিমরোদ (নমরুদ)-এর পক্ষে গ্রহণ করা মুশকিল হল। আবরাহামের ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া এতটাই ভয়ানক ছিল যে, তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত এই দূতকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবার নির্দেশ দিয়েছিলেন; ঐশী হস্তক্ষেপে আবরাহাম বেঁচে যান। যদিও আজও পৃথিবীতে পৌত্তলিকতা বিদ্যমান, তাহলেও তাঁর দেশে আবরাহামের বাণী প্রচারিত হলে কোনো আধুনিক শাসক আর এমন ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না।

তার কারণ এই যে, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও শাসনব্যবস্থার দর্শনে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নিমরোদের সময়ে বহু-দেবতাবাদ একটি রাজনৈতিক ভাবনার ধারা ছিল, বর্তমানে এটি একটি সীমিত ধর্মীয় ধারা মাত্র। প্রাচীন বিশ্বের শাসনব্যবস্থা সাধারণভাবে বহু-দেবতাবাদী ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তাঁর সমসাময়িক অন্য রাজাদের মতো নিমরোদও এই ব্যবস্থার প্রতিভূ ছিলেন। তাঁকে সূর্য দেবতার অবতার মনে করা হতো, যার দ্বারা তিনি অন্যদের উপর প্রভুত্ব করার অতিলৌকিক অধিকার অর্জন করেছিলেন। কোনো আধুনিক শাসক এই ধরনের দাবী করবেন না। এখন আর অতিলৌকিক শক্তি নয়, জনসমর্থনই কোনো ব্যক্তির শাসনক্ষমতার ভিত্তি। সেই কারণেই তৌহিদ (একেশ্বরবাদ)-এর শুদ্ধবার্তা এখন আর কোনো শাসকের কাছে কোনো চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে না। অপর দিকে, নিমরোদ এবং তার সমসাময়িকদের জন্য এটা ছিল ক্ষমতার উৎস থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করার শামিল।

তাঁদের কর্মকাণ্ডের প্রারম্ভেই প্রাচীন পয়গম্বরেরা ক্ষমতার অধিকারীদের থেকে সক্রিয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হতেন। পয়গম্বরদের বিভিন্ন প্রচার এই ক্ষমতার অধিকারীদের জন্য অভিসম্পাত স্বরূপ ছিল, কারণ সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে তাদের ক্ষমতার ঐশী ভিত্তির পরিপন্থী ছিল। সেকালে কেউ ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে নিজেকে প্রচার করেই একমাত্র রাজা হয়ে উঠতে পারতেন। এই ঐশী ভিত্তি অস্বীকার করার অর্থ ছিল শাসকদের শাসনের অধিকারের মূল ভিত্তিটিকেই অস্বীকার করা। সেই সময় নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান অথবা অবতার হিসাবে পরিচিত করেই কেউ নিজেকে রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। সমাজের এইরকম একটি অবস্থায় যিনিই একেশ্বরবাদের সূচনা করতেন, তাঁকেই বহু-দেবতাবাদের ক্ষমতাধারার স্তম্ভগুলির আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হতো। প্রতিষ্ঠান তখন এই ভীতিপ্রদর্শনকে প্রতিরোধ করতে উদ্যত হতো। ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে দেখানো হল যে, কোনো মানুষের কোনো অতিলৌকিক ক্ষমতা নেই। একমাত্র ঈশ্বরই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। ইসলাম প্রথম শিখিয়েছিল, কোনো মানুষ স্বাভাবিকভাবে অন্য কোনো মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠতর নয়। এর পরে ধর্মীয় বিশ্বাসের ধারাগুলির থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পৃথক করা হল। জনমতের ভিত্তিতে তৃণমূল স্তর থেকেই ভবিষ্যতের শাসকের ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি হবে। অতিলৌকিক দৈবশক্তির ভিত্তিতে আর কেউ শাসনের অধিকার পাওয়ার দাবী করতে পারবে না।

প্রাচীন যে চিকিৎসকরা অতিলৌকিক ক্ষমতার দাবীদার ছিলেন, তাঁদের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাচীনকালে যদি কেউ চিকিৎসক হিসেবে

সাফল্যের দাবী করতে চাইতেন, তাহলে তাঁকে বলতেই হতো যে তিনি অপশক্তিকে পরাভূত করেছেন, এবং চিকিৎসা বিষয়ক রহস্যগুলি সম্পর্কে তিনি কোনো অলৌকিক সূত্রে জ্ঞানলাভ করেছেন। কল্পনা করুন, সেই সময়ে, সেই সমাজে কেউ বললেন যে চিকিৎসাবিদ্যা কেবলমাত্র মেডিকাল কলেজেই শেখা সম্ভব, কোনো অলৌকিক উৎসের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের মাধ্যমে নয়, তাহলে যাঁরা অলৌকিক বা অতিলৌকিক চিকিৎসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন, তাঁরা এই ধরনের তত্ত্বের প্রথম প্রতিরোধ করতেন।

বর্তমানকালে ডাক্তাররা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি মত পোষণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শেখার বিরোধিতা তো দুরের কথা, তাঁরা নিজেরাও এই নিয়ম মেনে চলেন এবং অন্যদের এই বিষয়ে উৎসাহিত করেন।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে একটি ঐতিহাসিক যুগ পরিবর্তনের সূচনা হয়, যা হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর ইসলামি বিপ্লবের কারণে সম্ভব হয়েছিল। এখন এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া তার শীর্ষে পৌঁছচ্ছে। সত্যধর্মের প্রচারকরা মানবজ্ঞানের পরিধি থেকেই তাঁদের সাক্ষ্যসমূহ জোগাড় করতে পারেন। আইনি এবং সামাজিক প্রেক্ষিতের পরিবর্তনের ফলে এখন স্বাধীনভাবে খোলাখুলি ধর্মপ্রচার সম্ভব। কোনো নিমরোদ বা ফ্যারাও আর সত্যের আহ্বানকে চেপে দিতে পারবেন না। প্রকৃতিজগত সম্পর্কে অনেক কাজ হয়েছে এবং এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জ্ঞানের ফলেই সত্যধর্মের শিক্ষার প্রতি এক গভীর বৌদ্ধিক সমর্থন তৈরি হয়েছে। যে সমস্ত মানুষরা সত্য আহ্বানের হিংস্র বিরোধিতা করত, তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে।

আধুনিককালে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব নামে একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধিক বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। এর ফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে পরিবর্তন এসেছে, তা সম্পূর্ণভাবে সত্য আহ্বানের সহায়ক। বর্তমানকালের সুযোগসুবিধাগুলি যদি যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করা হয়, তাহলে লিখিত এবং মৌখিক উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে, মানুষের শুভবুদ্ধির প্রতি আবেদন জানিয়ে একেশ্বরবাদী ভাবনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। প্রাচীনকালের মতো অস্ত্রক্ষমতার আস্ফালনের প্রয়োজন হবে না।

আধুনিক সময়ের বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আসলে মুহাম্মদ(স.)-এর সময়ের

ইসলামি বিপ্লবের একটি ফলশ্রুতি। হজরত মুহাম্মদ(স.) যে বিপ্লব সাধন করলেন, ঈশ্বর তার মাধ্যমে কিছু উপাদান সক্রিয় করলেন। ফলস্বরূপ সূচনা হল ঐতিহাসিক পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি, যা আধুনিক সময়ের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবে রূপায়িত হল। ইসলামি যুগের সূচনার বহু-দেবতাবাদের উপর একেশ্বরবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর আরও কিছু উপাদান সৃষ্টি করলেন, যা পরবর্তী সময়ে একেশ্বরবাদকে আবার নাস্তিকতাবাদী ও নিরীশ্বরবাদী চিন্তনের উপর বিজয়ী হতে সাহায্য করবে।

ইসলামের আগমনের আগে, গোটা বিশ্ব জুড়ে বহু-দেবতাবাদী চিন্তনের প্রাধান্য ছিল। বহু-দেবত্ববাদ সাকার পূজনের নামান্তর। মানবমনের বহুদেবত্ববাদী তাগিদ তাদের বিভিন্ন জাগতিক ঘটনাকে উপাসনা করতে শিখিয়েছিল, যেমন, সূর্য বা আকাশ, অথবা আরও পার্থিব ক্ষেত্রে, দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজাও পূজিত হতেন। এই কারণে বহু-দেবতাবাদী যুগে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা করা সম্ভব ছিল না। ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবি দেখিয়েছেন, সেই সময় প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে উপাস্য মনে করা হতো। তার ফলে সেগুলির তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা সম্ভব ছিল না। ইসলাম এবং একেশ্বরবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বা জাগতিক ঘটনাবলীর প্রতি মানুষের যে বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা ছিল, তা ভেঙে পড়ল। মানুষ বুঝতে পারল স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া অন্য সব কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। জাগতিক ঘটনাবলীকে পবিত্র বা দৈব মনে করার কোনো কারণ নেই। এই সবগুলিরই প্রকৃতি অনুসন্ধান এবং ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ইসলাম মানবমননের যে বৌদ্ধিক মুক্তি নিয়ে এসেছিল, তা মুহাম্মদ(স.)-এর সময়কালে, ইসলামি যুগের সূচনাপর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। একটি চন্দ্রগ্রহণের সময়, হজরত মুহাম্মদ(স.) বলেছিলেন, সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ ঈশ্বরের চিহ্নস্বরূপ। ইসলাম পূর্ববর্তী কুসংস্কারের যুগে যেমন বিশ্বাস করা হতো, সেইরকম এই গ্রহণগুলি কোনোভাবেই নশ্বর মানুষের জন্ম বা মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এইভাবে হজরত মুহাম্মদ(স.) মানুষের এবং জাগতিক বস্তুর শ্রেষ্ঠত্বকে নস্যাৎ করে, কেবলমাত্র ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এটি করতে গিয়ে তিনি মানুষের চিন্তনে একটি নতুন ধারার সূচনা করেন, যা ক্রমশ ইউরোপে পৌঁছায় এবং যার ফলে আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ঘটে।

ইসলামি বিপ্লবের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপযোগিতা হল, এটি সম্পূর্ণভাবে

কুসংস্কারের যুগের অবসান ঘটিয়েছিল। কুসংস্কার হচ্ছে দৃঢ় বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের পরিবর্তে অবিন্যাস্ত এবং অপরিষ্কার ভাবনা, এবং জল্পনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিশ্বাস। যেমন, প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে মনে করা হতো যে সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ কোনো মহান মানুষের মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করে আনে। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে সব থেকে বড় বাধা ছিল কুসংস্কার।

যে ব্যক্তির মনন কুসংস্কারপূর্ণ ভাবনার দ্বারা আচ্ছন্ন, সে কখনোই বস্তুনিষ্ঠভাবে ইসলামের সঙ্গে অন্য ধর্মীয় ধারাগুলির তুলনা করতে পারবে না। বাস্তুত, যথার্থ সাক্ষ্যের সাহায্যে কোনো বিষয় বিবেচনা করার পরিবর্তে সে কিছু পূর্ব নির্দিষ্ট ধারণা পোষণ করে এবং যা কিছু সেই ধারণার সঙ্গে মেলে না, সে তা বর্জন করে। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের কথা বলা যেতে পারে। যে ব্যক্তি বস্তুনিষ্ঠভাবে ইসলামের ঐতিহাসিক পরিচয় চিহ্নগুলি অন্যধর্মের সঙ্গে তুলনার প্রেক্ষিতেও গ্রহণ করেন, তিনিই বুঝতে পারবেন যে অন্যান্য ধর্মগুলি যেখানে রহস্য এবং কিংবদন্তিতে আচ্ছন্ন, সেখানে ইসলামের যথার্থতা সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংশয় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু কুসংস্কারের যুগে ঐতিহাসিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হতো না, অপরদিকে আধুনিক যুগে এটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উচ্চতর সমালোচনা এখন শিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শাখা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর গবেষণালব্ধ ফলাফল নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে ইসলাম হল একমাত্র ধর্ম, যার নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। অন্যান্য ধর্মগুলি যথার্থ ইতিহাস অপেক্ষা মূলত 'মিথ'-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

আমাদের বৈজ্ঞানিক মনন গবেষণা, পরীক্ষানিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের দ্বারা মহাবিশ্বকে বোঝবার চেষ্টা করেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে মহাবিশ্বের বহু রহস্য প্রকাশিত হয়েছে, যা সুউচ্চ বৌদ্ধিক স্তরে ইসলামি শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন, গবেষণার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে প্রকৃতির একটি অভিন্ন নিয়ম ক্রিয়াশীল আছে। জাগতিক এবং মহাজাগতিক বিষয়গুলি একই চিরায়ত নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এটি প্রমাণ করে যে, একজনই সমগ্র মহাবিশ্বের অধিপতি। যদি একাধিক দেবতা থাকতেন, তাহলে প্রকৃতিতে অনেকগুলি নিয়ম এবং আইন কার্যকর থাকত।

একেশ্বরবাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে আর একটি অন্তরায় হল প্রাচীন দর্শন। প্রাক-ইসলামি যুগে শিক্ষিত মানুষের মন দর্শনের আলোকে চিন্তাভাবনা করতে অভ্যস্ত ছিল। দার্শনিকরা চিরকালই চূড়ান্ত সত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন — এটাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু পাঁচশো বছরের গৌরবময় ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। এর মূল কারণ এই যে, দার্শনিকরা মানুষের সীমাবদ্ধতা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের এই চূড়ান্ত সত্য অনুধাবনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ, শেষ পর্যন্ত মানুষ তাদের সীমিত বৌদ্ধিক ক্ষমতা নিয়ে একটি অসীম এবং অনন্ত প্রকৃতির বাস্তবকে অনুধাবন করতে পারে না। এর জন্য পয়গম্বরীয় বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, কিন্তু দার্শনিক চিন্তনের সঙ্গে মানুষের অনুরাগের কারণে, পয়গম্বররা যা শেখাচ্ছিলেন, তাঁরা তাতে ইতিবাচক সাড়া দিতে পারেন নি।

বহু শতাব্দী ধরে ধর্মতত্ত্ববিদরা, যাঁরা প্রধান দার্শনিক চিন্তনগুলির দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা, যে ভিত্তিগুলির উপরে একেশ্বরবাদ গড়ে উঠেছে, সেই প্রাথমিক বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা যেটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন সেটা এই যে, এই সমস্ত কিছুই অদেখা বাস্তব। আমাদের বর্তমান বৌদ্ধিক স্তরে আমরা এই সমস্ত বাস্তব সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে সক্ষম নই। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের সব থেকে বড় কৃতিত্ব হল, — "সব সত্যই সর্বদা চোখে দেখা যায়" — এই ধারণাকে ভ্রান্ত বলে প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের উপলব্ধির পরিসর সীমাবদ্ধ — এটা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানের দাপটে দর্শন দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। বিজ্ঞান এখন আমাদের বৌদ্ধিক পথনির্দেশক হয়ে গেছে। এই প্রক্রিয়ায় একেশ্বরবাদের পথ পরিষ্কার ও প্রশস্ত হয়ে গিয়েছে। এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, অন্তত অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও বাস্তবকে অনুধাবনের জন্য আমাদের সামনে একটাই পথ খোলা আছে, এবং তা হলো পয়গম্বরদের আহ্বানের প্রতি মনোযোগী হওয়া। তবুও মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা এবং আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে যে, কোনো কিছু বিশ্বাস করার আগে চাক্ষুষ দেখতে হবে। কিন্তু আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে এই দর্শনভিত্তিক মানসিকতা রক্ষণাত্মক অবস্থানে চলে গেছে। একেশ্বরবাদী ধর্মের মৌলিক ভিত্তিসমূহ — যেমন ঈশ্বর,

ঐশী বাণী, চিরন্তন জগতের মতো অদৃশ্য সত্যগুলি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার দাবী, এখন বিদ্যায়তনিক স্তরে অচল হয়ে গিয়েছে।

আমাদের জানা ইতিহাসের পরিসরে প্রথমবার মানুষের জ্ঞানের পরিধির সহজাত সীমাবদ্ধতা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহাকাশের রহস্য বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অন্তত সুস্পষ্টভাবে আমাদের এটা দেখিয়েছে যে, বাস্তবতার জগৎটাকে সম্যকরূপে অনুধাবন করা আমাদের সীমিত মেধার ক্ষমতার বাইরে। এই আবিষ্কারটি ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি পয়গম্বরত্বের প্রয়োজনীয়তা বোঝায়। একদিকে বিজ্ঞানীরা চূড়ান্ত সত্যটিকে বোঝার জন্য প্রবল চেষ্টা করে চলেছেন; অপরদিকে, সহজাত সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁরা সেটা করতে অপারগ। আমাদের আধ্যাত্মিক গঠনে একটা শূন্যতা আছে যা কেবলমাত্র ঐশী নির্দেশনা বা পয়গম্বরত্বই পূর্ণ করতে পারে। আমাদের বৌদ্ধিক সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেই বিজ্ঞান একটি বিশুদ্ধ বিদ্যায়তনিক স্তরে অবতীর্ণ বার্তার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। অন্য কোনো কিছুই মানবতার অসম্পূর্ণতাকে ভরাট করতে পারে না।

প্রাচীনকালে সাধারণ মানুষকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হতো না। এর প্রাথমিক কারণ ছিল রাজা এবং শীর্ষস্থানীয় মানুষদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা কোনো কারণে কোনো ব্যক্তি সমাজের উচ্চস্তরে পৌঁছে যেতে পারলে, তাঁকে বিশেষভাবে পবিত্র এবং আশীর্বাদপুষ্ট বলে মনে করা হতো। অন্যদের তুলনায় তাঁর মতামতকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। তাঁরা যে প্রশ্নাতীত শ্রদ্ধা ভোগ করতেন, তার ফলেই তাঁরা অন্যদের উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দিতে পারতেন। ইসলামের একেশ্বরবাদী বিপ্লব ব্যক্তিমানুষের শ্রেষ্ঠত্বের এই ধারণাকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিল, সমস্ত মানুষকে একে অন্যের সঙ্গে সমান করে এক মাটিতে নিয়ে এসে ফেলল। এর থেকেই একটি নতুন দার্শনিক ধারার উৎপত্তি হল, যা শেষ পর্যন্ত পশ্চিমী দেশগুলিতে গণতন্ত্র রূপে গড়ে উঠল।

গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে, সব মানুষ সমান। গণতন্ত্র সব মানুষকে, তাদের বিবেকে যা আছে, তা মৌখিক বা লিখিত রূপে ব্যক্ত করার অধিকার দিয়েছে। গণতান্ত্রিক নিয়মে ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য অত্যাচার বা প্রতিহিংসার ভয় না পেয়ে একটি ঐশী ধর্ম প্রচার করা সম্ভব হল। বিজ্ঞান আমাদের জীবনে

আশীর্বাদস্বরূপ অগণ্য জাগতিক সুযোগসুবিধা এনে দিয়েছে, যা বহু শতাব্দী ধরে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল। ইসলামি প্রচারের কথা বললে, তার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতির বিকাশ। গণমাধ্যম, দক্ষ দ্রুতগতির পরিবহন বাবস্থা, কম্পিউটার এবং ভিডিও বিপ্লব — এই সবগুলিই ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে মানুষের কাছে ইসলামের শিক্ষাগুলি পৌঁছে দেওয়া যায়।

ইসলামি উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই সুযোগগুলি অত্যন্ত অনুকূল। আড়াই হাজার বছরের একটি কালপর্ব পেরিয়ে, ইসলামি যুগের সূচনায় ঈশ্বর এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করলেন, যা ইসলামি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে। এখনও তাই। গত এক হাজার বছর ধরে একটি প্রক্রিয়া চলছে যার থেকে ইসলামি আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সুযোগের অভাব নেই, কিন্তু যদি তার থেকে সদর্থক ফল পেতে হয়, তবে তার যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। এই কাজের জন্য একটি গতিশীল সম্প্রদায় প্রয়োজন যারা সুযোগের সেরা সদ্ব্যবহার করতে পারবে — ঠিক যেমনটি পয়গম্বর এবং তাঁর সহযোগীরা তাঁদের কাছে থাকা সুযোগ সুবিধাগুলির ক্ষেত্রে করেছিলেন। এই ধরনের একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের যদি সৃষ্টি হয়, তাহলে নাস্তিকতাবাদী এবং অধার্মিক চিন্তনের উপর ইসলামি আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে সময় লাগবে না, ইসলামি যুগের শুরুতে বহু-দেবতাবাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঠিক যেমনটি ঘটেছিল।

একশো বছরের বেশি সময় ধরে সম্ভাবনাগুলি এইরকম একটি সম্প্রদায়ের অপেক্ষা করছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এইরকম কোনো সম্প্রদায় গড়ে ওঠেনি। একথা সত্যি যে, এই সময়কালে অগণিত মুসলমান গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, কিন্তু বলতে হয় যে এই গোষ্ঠীগুলি ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে উঠেছে। এগুলির জন্মের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অবস্থা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অপরদিকে গত এক হাজার বছর ধরে ঈশ্বর যে সমস্ত সুযোগসুবিধাগুলি সৃষ্টি করেছেন, সেগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন থাকবে এমন একদল মানুষের প্রয়োজন। এই দলটি ঈশ্বরের প্রকল্পের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হবে এবং ইসলামের পুনরুত্থানের জন্য ঈশ্বর যে সুযোগ-সম্ভাবনার ধারাটি তৈরি করেছেন, সেই পরিধির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারবে।

হজরত মুহাম্মদ(স.)-এর জীবনীতে বদরের যুদ্ধের একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সেটা এইরকম — মুসলমানদের তুলনায় অবিশ্বাসীদের বাহিনী ছিল বিশাল। সেই শক্তিশালী বাহিনী পয়গম্বর এবং তাঁর সঙ্গীদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করছিল। তখন এক পর্যায়ে হজরত মুহাম্মদ(স.) গভীর আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি নিজেকে তাঁর প্রভুর পদতলে সমর্পণ করেন। তিনি কেঁদে বলেন, "প্রভু, আপনি যদি এই দলটিকে ধ্বংস করেন, তাহলে এই পৃথিবীতে আর কেউ কোনোদিন আপনার উপাসনা করবে না।" পয়গম্বররের পক্ষ থেকে এটা কোনো অতিশয়োক্তি ছিল না। বাস্তবে যে ৩১৩ জন বদরের যুদ্ধে গিয়েছিলেন, আপাতভাবে দুর্বল এবং যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র না থাকা সত্ত্বেও তাঁদের দলটি সাধারণ ছিল না। তাঁরা আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসের চূড়ান্ত ফসল। আজ আবার সেইরকম একটি দলের প্রয়োজন। একমাত্র তারাই এইরকম একটি দল গড়ে তুলতে পারেন, যারা এক হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা ঐশ্বরিক প্রকল্পটি সম্পর্কে সচেতন এবং তাতে একটি ভূমিকা পালন করার জন্য যাদের হৃদয় প্রস্তুত; যারা এতটাই শক্তিশালী এবং আশু কর্তব্য বিষয়ে স্বীয় লক্ষ্যে এতটাই অবিচল, যে তারা এটি পূরণের লক্ষ্যে যতদূর যাওয়া প্রয়োজন, ততদূর যেতে তৈরি, যে কোনো আত্মত্যাগে প্রস্তুত। এই হচ্ছে যথার্থ 'ঈশ্বরের দল'। এবং ঈশ্বরের এই দল অবশ্যই বিজয়ী হবে।(-২০১)

ফিলিপ কে হিট্টি তাঁর 'হিস্ট্রি অব দি অ্যারাবস' বইয়ে লিখেছেন, "পয়গম্বরের মৃত্যুর পরে উষর আরব যেন কোন জাদুবলে বীরদের সূতিকাগৃহ হয়ে উঠল — সংখ্যায় এবং গুণগত মানে যে বীরদের সমতুল কাউকে পাওয়া দুষ্কর ছিল।(-২০২)

বিশ্বে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বাগ্রে মানুষের চিন্তনের আমূল পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। অন্য ধারার চিন্তার উপরে ইসলামি চিন্তাকে প্রাধান্য পেতে হবে। এই কাজের লক্ষ্যেই ঈশ্বর পয়গম্বর এবং তাঁর সহযোগীদের নির্বাচন করেছিলেন। সেই তাৎপর্যকে লঘু করে দেখলে চলবে না। পয়গম্বরের উত্তরসূরীরাও এই কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, কারণ, তারা 'বীরদের সূতিকাগৃহে' বড় হয়ে উঠেছিল, এবং বহু ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তারা বহু-দেবতাবাদী ভাবনার ওপরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ ইসলাম তার পূর্বেকার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে ফেলেছে —

এবার নাস্তিকতাবাদী চিন্তনের কাছে। এর থেকে উত্তরণের জন্য আর একটি ‘বীরদের সূতিকাগৃহ’ তৈরি করতে হবে।

যদি হজরত মুহাম্মদ(স.) এবং তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তরসূরীরা ইসলামকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইসলামের সূচনাপর্বে একটা বিপদসংকুল কঠিন সময় কাটিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরীদের এই বিষয়ে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। ইসলামকে শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর সময়কালে হজরত মুহাম্মদ(স.) এবং তাঁর অনুগামীরা যে ধরনের ক্লেশ সহ্য করেছেন এবং যেভাবে সমস্ত বিপদের মোকাবিলা করেছেন, বাস্তবিক আজকের দিনে মুসলমানরা সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এক বিশাল সংগ্রামের মধ্যে আছেন। তাঁরা তাঁদের জীবন ও সম্পত্তি বিসর্জন দিয়েছেন, ইসলামের সপক্ষে লিখতে এবং বক্তৃতা দিতে তাঁদের সময় এবং শ্রম ব্যয় করেছেন; ইসলামের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁরা নিজেরা অনেক দূর দূর দেশে গিয়েছেন। এই প্রচেষ্টার পরিমাপ করতে হলে বলা যায়, ইসলামের পথে বর্তমান প্রজন্মের মুসলমানদের যে সংগ্রাম — তা পয়গম্বরের সমসাময়িক এবং তাঁর নিকট উত্তরসূরীদের সংগ্রামকে অনেকখানি ছাপিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ফলাফলের দিক থেকে দেখলে গল্পটা অন্য। পয়গম্বর এবং তাঁর সহযোগীদের প্রচেষ্টার ফলে মানব ইতিহাসের ধারাই পালটে গিয়েছিল; বর্তমানকালের মুসলমানদের প্রচেষ্টার কারণে তাদের নিজেদের বিরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই বৈপরীত্য তৈরি হয়েছে প্রথম মুসলমানদের সংগ্রামের পিছনে যে মনস্তত্ত্ব ছিল, এবং অপরদিকে আধুনিক মুসলমানদের মনস্তত্ত্বের পার্থক্য থেকে। প্রথম মুসলমানরা একধরণের আবিষ্কারের ভাবনার দ্বারা পরিচালিত ছিলেন, আধুনিক মুসলমানরা একধরনের ক্ষতি-ভাবনার দ্বারা চালিত। উদাহরণস্বরূপ, যে সমস্ত মুসলমানরা অ্যাবিসিনিয়ায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের ফিরে আসাকে সুনিশ্চিত করতে যখন কুরাইশরা দুজন লোক পাঠিয়েছিলেন, তখন নেগাস (রাজা) সেই মুসলমানদের তাঁর রাজসভায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, এবং ধর্ম বিষয়ে তাঁদের প্রশ্ন করেছিলেন। তখন জা’ফর যা বলেছিলেন, তাতে তাঁদের মনোভাবের একটি যথার্থ চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর বক্তব্য তাঁর সঙ্গীদেরও নাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি বলেন, “হে রাজা, আমরা ছিলাম গভীর অজ্ঞতায় ডুবে থাকা

একটি জাতি, বিগ্রহ আরাধনা করতাম, অ-জবেহকৃত মৃতপ্রাণীর মাংস খেতে অভ্যস্ত ছিলাম, বহু ঘৃণ্য কাজে যুক্ত ছিলাম এবং আমাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী, তারা দুর্বলদের প্রায় ছিঁড়ে খেত। আমরা এই রকমই ছিলাম, যতদিন না ঈশ্বর আমাদের মধ্যে থেকেই একজনকে তাঁর দূত হিসেবে পাঠালেন। আমরা তাঁর পারিবারিক পরিচয় জানতাম, তাঁর সত্যপরায়ণতা, তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পর্কে জানতাম। তিনি আমাদের ঈশ্বরের কাছে ডাকলেন, যাতে আমরা তাঁর পরিচয়ে (একেশ্বরবাদ) বিশ্বাস রাখি এবং তাঁর উপাসনা করি। আমাদের পিতারা এবং আমরা যে সমস্ত পাথর এবং মূর্তি উপাসনায় অভ্যস্ত ছিলাম, আমরা সেইসব ত্যাগ করি। তিনি আমাদের সত্য কথা বলতে আদেশ করেন, আমাদের শপথ পূরণ করতে নির্দেশ দেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং আমাদের প্রতিবেশীদের অধিকার বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল হতে শেখান, অপরাধ এবং রক্তপাত থেকে দূরে থাকতে বলেন। তাই আমরা কেবল এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে উপাসনা করি, তাঁর পাশে অন্য কাউকে বসাই না। তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন, আমরা তাকে নিষিদ্ধ বলে মনে করি; তিনি যা অনুমতি করেছেন, তাই আমাদের কাছে বৈধ। এই সমস্ত কারণে আমাদের নিজেদের লোকেরা আমাদের বিরোধী হয়ে গিয়েছে, তারা আমাদের অত্যাচার করেছে যাতে আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করি এবং এক ঈশ্বরের উপাসনা ছেড়ে মূর্তি উপাসনায় ফিরে যাই। এই কারণে আমরা আপনার দেশে এসেছি, আমরা সবার উপরে আপনাকে নির্বাচন করেছি। আপনার ছত্রছায়ায় আমরা সুরক্ষিত ছিলাম, এবং আমাদের আশা এই যে, এখানে আপনার সঙ্গে থাকলে আমাদের কোনো অন্যায় অত্যাচার ভোগ করতে হবে না।”

জা’ফরের কথা থেকেই বোঝা যায় ইসলাম তাঁর কাছে এবং তিনি যাদের হয়ে কথা বলেছিলেন তাদের কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইসলাম তাদের কাছে অজ্ঞতার জীবন পেরিয়ে আলোকিত জীবনের স্বরূপ ছিল; এটি ছিল এক ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া এবং মূর্তি উপাসনা ত্যাগের জীবন। ঐশ্বরিক নির্দেশনায় চালিত জীবনের লক্ষ্যে তাঁরা ছন্নছাড়া জীবন ত্যাগ করেছিলেন; হজরত মুহাম্মদ(স.) তাদের কাছে ঐশ্বরিক নির্দেশনা ব্যক্ত করেছিলেন। এখন তারা পার্থিব নয়, অনন্ত সন্ধান করে ফিরছিলেন। পূর্বেকার অবিন্যস্ত জীবনযাপন

ত্যাগ করে তারা এক ঋজু নৈতিক জীবনের আনন্দ আবিষ্কার করেছিলেন — নিপীড়ন অপেক্ষা ন্যায়, নিষ্ঠুরতা অপেক্ষা দয়া তাদেরকে আকৃষ্ট করেছিল।

আবিষ্কারের আনন্দ মানুষকে অদম্য উৎসাহ জোগায়। তার চিন্তনে এবং তার কাজে উদ্যম এবং গতিশীলতা আসে। অপরদিকে, ক্ষতির ভাবনার নেতিবাচক প্রভাব সমস্ত উদ্যোগকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়। এই জাতীয় ভাবনায় আক্রান্ত হলে কোনো ব্যক্তি আর কোনো গঠনামূলক ভাবনা বা কাজ করতে পারে না। প্রথম দিকের মুসলমানরা একটি আবিষ্কারের ভাবনা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। সেই কারণে তারা গতিশীল কার্যাবলীর অনন্য উদাহরণ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। আধুনিক মুসলমান আন্দোলনগুলি একটি নেতিবাচক ভাবনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই কারণেই সেগুলি দুর্ভাগ্যবাহী উদ্যোগ এবং ভ্রান্ত নীতির অভূতপূর্ব কাহিনি হয়ে উঠেছে।

জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের অনুভূতি তাদের নেতারা দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করেছেন:

'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সমস্ত উত্তরাধিকার হারিয়েছি। স্বর্গ আমাদের একটি সুউচ্চ সুন্দর অবস্থান থেকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলেছে।'

বস্তুত আধুনিক সময়ের সমস্ত ইসলামি আন্দোলন এই ক্ষতি এবং পীড়নের ভাবনা থেকে জন্ম নিয়েছে। তারা যেভাবে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরে, তাতে পরস্পরের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে — কেউ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ভাষা ব্যবহার করে, কেউ ধর্মীয় পরিভাষার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে। কিন্তু আসলে তারা সবাই সমান; সবগুলিই অতীত গৌরব হারানোর ভাবনা থেকে এসেছে।

গ্রীক গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিস (২৮৭-২১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) যখন 'স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি'র তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন, তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। আবিষ্কারের আনন্দে তিনি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। সাম্প্রতিককালে, ইরানের শাহ তাঁর সিংহাসন হারানো ফলে বাঁচার ইচ্ছাটাই হারিয়ে ফেলেছিলেন। আবিষ্কার এবং ক্ষতির এমনই প্রকৃতি। মানুষের চোখে একমাত্র সেটাই বড় হয়ে ধরা পড়ে যেটা সে আবিষ্কার করেছে, অথবা হারিয়েছে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আবিষ্কারের অনুভূতি ব্যক্তির চরিত্রে

ইতিবাচকতা সঞ্চার করে, ক্ষতির অনুভূতি থেকে নেতিবাচকতা সঞ্চারিত হয়। যে উচ্চ এবং রাজসিক উপায়ে প্রথম দিকের মুসলমানরা তাদের কর্মকাণ্ড চালাতেন , তা তাদের আবিষ্কার ভাবনার প্রতিফলন। তারা সত্যের সামনে নত হওয়ার মতো উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন ছিলেন, অন্য মানুষদের মূল্য স্বীকার করার মতো উদারতা তাদের ছিল, এবং তারা যা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতেন, তা অবশ্যই সম্পাদন করতেন। তারা অন্যদের প্রতি ক্ষমাশীল ছিলেন, এই আশায় যে ঈশ্বর তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন। তারা এতটাই সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, তারা সত্য থেকে চোখ সরাতেন না, তা থেকে বিচ্যুত হতেন না। কোনো অবস্থাতেই তাদের ভাবনা সত্যকে আড়াল করতে পারত না। জোরালো যুক্তির ভিত্তিভূমিতে তারা সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতেন। তারা যা করতেন, তা কখনোই প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে করতেন না, তারা সর্বদা সঠিক আচরণ করতেন।

এই হলো ইতিবাচক চরিত্রের প্রকৃতি। নেতিবাচক চরিত্রের কর্মধারা সম্পূর্ণ আলাদা। নেতিবাচকতা সত্যের নয়, আবেগের অনুসরণ করা। এর ফলে যে সন্দিগ্ধ এবং দ্বিধাগ্রস্ত চরিত্রের সৃষ্টি হয়, তা অর্থবহ উদ্যোগ বা অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতার পথে বাধার সৃষ্টি করে। বাস্তববোধের অভাব চরিত্রের প্রধান লক্ষণ হয়ে ওঠে। তখন আর সত্যদৃষ্টিতে কিছু দেখা যায় না, নিজের তৈরি করা জটিল দৃষ্টি দ্বারাই তা দেখতে হয়। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে এক ভ্রান্ত উচ্চ ধারণা তৈরি হয়, অন্যদের ক্ষমতাকে ছোট করে দেখার প্রবণতা আসে। নিজের পরাজয়গুলিও আপন কল্পনার রূপকথার জগতে সাফল্যরূপে ফুটে ওঠে, যদিও বাস্তবে এমন হলে মানুষের ছোটখাটো সাফল্যগুলিও সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এইখানেই বর্তমানকালের মুসলমানদের সঙ্গে তাদের ধর্মের প্রথম দিকের মুসলমানদের পার্থক্য।

ইসলামের পয়গম্বর বিশ্বে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন, যার সূচনা হয়েছিল আধ্যাত্মিক আবিষ্কারের এক গভীর ভাবনা দিয়ে এবং সম্পন্ন হয়েছিল ইতিবাচক গুণাবলীর অনন্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। যদি কেউ পরাজয়ের মানসিকতা থেকে উদ্ভূত নেতিবাচকতা দিয়ে একটি বিপ্লব সম্পন্ন করতে চান, তাহলে তাঁকে অন্য কোনো ঈশ্বর খুঁজে বের করতে হবে, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে এইরকম কিছু ঘটুক। তাকে একজন পয়গম্বরও খুঁজে বের করতে হবে, কারণ এটা পয়গম্বরেরও পথ ছিল না।

টীকা

১. ড. মাইকেল হার্ট, দ্য হান্ড্রেড, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৮
২. ফিলিপ কে হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি অ্যারাবস, লন্ডন, ১৯৭৮
৩. কুরআন, ৩৩: ৪০
৪. কুরআন, ১৬: ৩৫
৫. কুরআন, ৩৬: ৩০
৬. বাইবেল, হাবারুক ২.১৪
৭. কুরআন, ৬১:৬
৮. হজরত মহম্মদের তুতো ভাই এবং জামাতা
৯. ওয়ার্ল্ড মুসলিম গেজেটিয়ার, মু’তামারাল-’আলম-আল-ইসলামি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭১
১০. ইবন হিশাম, সিরাহ্, পৃ. ১৫৩
১১. আরব রাজ্য যা খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে বাইজ্যানটাইন মিত্র হিসেবে পরিচিত ছিল।
১২. কনস্টান ভার্জিল জর্জ (জন্ম ১৯১৭), দ্য প্রফেট অব ইসলাম।
১৩. কুরআন, ৯৩:৭
১৪. কুরআন, ৯৪: ১-৩
১৫. রাজিনের হাদিস
১৬. ইবন হিব্বানের হাদিস
১৭. মিসওয়াক, দাঁতন কাঠি বিশেষ
১৮. হাদিস, আল-বুখারি
১৯. রাকাত, প্রার্থনার অংশ

২০. কুরআন, ৩: ১২৮

২১. মুসলিম হাদিস

২২. কুরআন, ৬৮:৫

২৩. মিশকাত আল-মাসাবিহ্ তে উদ্ধৃত হাদিস

২৪. রাজিনের হাদিস

২৫. কুরআন, ৩: ১৫৯

২৬. কুরআন, ২৪: ২২

২৭. কুরআন, ৪:৫৮

২৮. কুরআন, ৩৩: ২১

২৯. হাদিস, তিরিমিজি, নাসল, আবু দাউদ

৩০. ইবন হিশামের হাদিস

৩১. ইবন হিশাম, সিরাহ্- ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯

৩২. কুরআন, ৯: ১৯-২০

৩৩. ইবন হিশাম, সিরাহ, তৃতীয় খণ্ড এবং ইবন কাথির তফসির, প্রথম খণ্ড

৩৪. ইবন হিশাম, সিরাহ্, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭

৩৫. ইবন হিশাম, সিরাহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯

৩৬. আল কাতাদাহ কর্তৃক জ্ঞাপিত হাদিস

৩৭. ইবন হিশাম, সিরাহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৫৭

৩৮. অপ্রধান তীর্থযাত্রা, হজের মতো বছরের নির্দিষ্ট সময়েই করতে হয় না এবং এতে আচারবিধিও কম।

৩৯. কুরআন, ৪: ২৬

৪০. কুরআন, ২৬: ৩

৪১. হাদিস, সাহিত্ব, আল বুখারি

৪২. কুরআন, ৯:২৮

৪৩. সম্পত্তির অংশ, যা দান করা হয়।

৪৪. বাইবেল, লেভিটিকাস, অধ্যায় ২৬

৪৫. কুরআন, ৪৮:১-৩
৪৬. কুরআন, ৪৭৭
৪৭. কুরআন, ২: ১১৩
৪৮. কুরআন, ৩৬: ৩০
৪৯. কুরআন, ৪০: ৮৩
৫০. জেরুজালেমে সলোমনের সৌধ
৫১. কুরআন, ২: ১৪৩
৫২. কুরআন, ১৬: ২৫
৫৩. কুরআন, ৬১:৮-৯
৫৪. কুরআন, ২: ১২৯
৫৫. কুরআন, ৩; ৩০
৫৬. কুরআন, ১৪:৩৭
৫৭. কুরআন, ২: ১২৮
৫৮. ইবন কাথির, তফসির
৫৯. ফিলিপ কে হিটি, হিস্ট্রি অব দি অ্যারাবস্, পৃ. ২৫৩
৬০. কুরআন, ৩: ১১০
৬১. কুরআন, ১৪: ৩৫-৩৭
৬২. কুরআন, ৪৯:৭
৬৩. ইবন হিশাম, সিরাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯
৬৪. মদিনার মানুষ, যাঁরা হজরত মহম্মদকে সাহায্য করেছিলেন
৬৫. ইবন হিশাম, সিরাহ।
৬৬. ইবন কাথির, সিরাহ।
৬৭. কুরআন, ৪৮:১
৬৮. ইবন কাথির, তফসির, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৫২
৬৯. হাদিস, ইবন জরির, ইবন মারদুইয়া
৭০. কুরআন, ৭৪: ১-৭

৭১. কুরআন, ৬: ১৪
৭২. মুহম্মদ মার্মাডিউক পিকথল, দ্য গ্লোরিয়াস কুরাদ, লন্ডন, ১৯৩৮
৭৩. সর্দার পূরণ সিং, ‘ব্রেভারি’ প্রবন্ধ
৭৪. কুরআন, ৯: ২৬
৭৫. ইবন হিশাম, তহজিব সিরাত্ব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৭
৭৬. আবু দাউদের হাদিস
৭৭, ইবন ইশাকের ভিত্তিতে আহমদের হাদিস।
৭৮. তহজির সিরাত ইবন হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৭
৭৯. আল বজর বর্ণিত হাদিস
৮০. ইবন সা’দ এর ভিত্তিতে আহমদের হাদিস।
৮১. কুরআন, ৩: ১৪৬
৮২. কুরআন, ৩০: ৬০
৮৩, কুরআন, ১৪: ১২
৮৪. কুরআন, ৩৩: ০৯
৮৫. কুরআন, ৮:১২
৮৬. কুরআন, ৮:৪৪
৮৭. কুরআন, ৮: ৬১-৬২
৮৮. কুরআন, ৪৮: ২৯
৮৯. ইবন মারদু’য়া এবং ইবন সা’দ বর্ণিত হাদিস।
৯০. আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ্
৯১. আল-বুখারি এবং মুসলিমের হাদিস
৯২. আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়াহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪
৯৩. আ’ইশাহ-র ভিত্তিতে ইমাম আহমদের হাদিস
৯৪. তহজিব সিরাত ইবন হিশাম, পৃ. ৬৮
৯৫. আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়াহ্
৯৬. তদেব।

৯৭. ইবন ‘আসাকির’-এর হাদিস
৯৮. আল-আসাবাহ প্রথম খণ্ড
১৯. আবু উমামাহ-র ভিত্তিতে ইমাম আহমদের হাদিস
১০০, হাদিস, কানজ আল- ‘উম্মাল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৯
১০১. মুসলিম হাদিস।
১০২. আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়াহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৬
১০৩, তদেব, পঞ্চম খণ্ড
১০৪. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬২
১০৫. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৩
১০৬, তদেব, চতুর্থ খণ্ড
১০৭. তারিখ আল-তাবারি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৬
১০৮; আল-বিদায়া ওয়া আল- নিহায়াহ্, তৃতীয় খণ্ড
১০৯. তারিখ আল-তাবারি, পৃ. ২৩৪
১১০. ইবন ‘আবদাল বরফি, আল-ইস্তি’তাব দ্বিতীয় খণ্ড
১১১. ‘আবদুল্লাহ ইবন আল-সমিতের ভিত্তিতে মুসলিমের হাদিস
১১২. আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়াহ্, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৯
১১৩. আল তাবারানি বর্ণিত
১১৪. আবু নইম, আল-দালা’ইল
১১৫. ভাবারানির হাদিস
১১৬. বাইহাকির হাদিস
১১৭. আল-আসাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২১০
১১৮. আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়াহ, দ্বিতীয় খণ্ড
১১৯. তদেব, তৃতীয় খণ্ড
১২০. কুরআন, ৫৬: ৮২
১২১. তহজিব সিরাত ইবন হিশাম, পৃ. ৮৬
১২২. ইবন মাসুদের ভিত্তিতে ইমাম আহমদের হাদিস

১২৩. আবু না'ইম, আল-হিলিয়াহ্
১২৪, তাবারানির হাদিস
১২৫. কুরআন, ১১:৯১
১২৬. তহজিব সিরাত ইবন হিশাম, পৃ. ৬০
১২৭. আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়াহ, তৃতীয় খণ্ড
১২৮. আবু ন'ইম, দালা 'ইল আল-নুবুওয়াহ্
১২৯. আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়াহ, তৃতীয় খণ্ড
১৩০. তহজিব সিরাত ইবন হিশাম, পৃ. ৬০
১৩১. আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়াহ, তৃতীয় খণ্ড
১৩২. আবু ন'ইম, দলা 'ইল আল-নুবুওয়াহ
১৩৩. আল তাবারানির হাদিস
১৩৪. আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়াহ, তৃতীয় খণ্ড
১৩৫. তদেব।
১৩৬, তদেব। তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪৫
১৩৭. উরওয়ার ভিত্তিতে আল-তাবারানির হাদিস
১৩৮. তহজিব সিরাত ইবন হিশাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮
১৩৯. আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের ভিত্তিতে ইমাম আহমদের হাদিস
১৪০, আল-বিদায়া ওয়া আল নিহায়াহ, তৃতীয় খণ্ড
১৪১. ইবন হিশাম, তহজিব সিরাহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১১
১৪২, কনজ আল- 'উম্মল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৫৯
১৪৩, আল-তাবারানি
১৪৪, আবু ন'ইম, দালাইল আল-নুবুওয়াহ, পৃ. ১০০
১৪৫, কুরআন, ৮:৬০
১৪৬, কুরআন, ৯:৬০
১৪৭, কনজ আল- 'উম্মল, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৯৪
১৪৮. আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০৫

১৪৯. তহজিব সিরাত ইবন ইশাম, পৃ. ১২৯

১৫০. কুরআন,৬১:৫

১৫১. হাদিস, সহিহ, আল বুখারি

১৫২, আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ

১৫৩, তদেব

১৫৪, কুরআন, ৪৮: ২০

১৫৫. আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ

১৫৬, হাদিস, জাদ আল মা'আদ, ইবন কাইয়িম

১৫৭. আল বুখারি এবং মুসলিমের হাদিস

১৫৮. কুরআন, ৮:৩৮

১৫৯, কুরআন, ৮: ৬১-৬২

১৬০. কুরআন, ১৭:৭৯

১৬১. কুরআন, ১৭: ৭৯

১৬২, কুরআন, ২১: ১০৭

১৬৩, কুরআন, ৭৪: ১-৭

১৬৪. কুরআন, ৬:১১৪

১৬৫. কুরআন, ৩৩: ২১

১৬৬. কুরআন, ১৫:৯

১৬৭. কুরআন, ৯:১৪

১৬৮. কুরআন, ৩৩: ১১

১৬৯. কুরআন, ১৭: ৭৫

১৭০. কুরআন, ৯:১১৯

১৭১. কুরআন, ৩৩: ২৮

১৭২. তিরিমিজি এবং নাসা'ইয়ের হাদিস

১৭৩, কুরআন, ১৭:৫৯

১৭৪. কুরআন, ৬: ৩৫

১৭৫. কুরআন, ২৯: ৫০-৫১

১৭৬. জোভিয়ার ল-দুকো, এস জে, দ্য গসপেলস অ্যান্ড দ্য জিসাস অব হিস্ট্রি, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭০, ৫, ৭৯-৮০

১৭৭, এর্নেস্ট রেনান (১৮২৩-১৮৯৪)

১৭৮: জুরগি জায়দান (১৮৬১-১৯১৪) আদব আল-লুদ্ধাত আল-আরাবিইয়াহ

১৭৯, ড. আহমদ হাসান জাইয়ত

১৮০, যাঁরা আরব নন

১৮১. মুতানারি (৯১৫-৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ) শর দিওয়ান আল-মুতানব্বির, বেইরুট, ১৯৮৩, পৃ. ৩৮৪

১৮২. তহজিব সিরাত ইবন হিশাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২১

১৮৩, কুরআন, ১৭:৮৮

১৮৪. কুরআন, ৩: ১৮৫

১৮৫, কুরআন, ২: ১৭৯

১৮৭. শেখ তানতাওয়ি, আল জওয়াহিরিফি তফসিরুল-কুরান আল-করিম, কায়রো, হিজরি সন ১৩৫১, ২৩ খণ্ড, পৃ.

১৮৬, কুরআন, ৫০: ৩০

১৮৮, কুরআন, ৪৯:৭

১৮৯, কুরআন, ৮:৩১

১৯০, কুরআন, ২৫:৫

১৯১, কুরআন, ৫৭: ১০

১৯২, কুরআন, ৫৭: ১১

১৯৩, কুরআন, ৫: ২৪

১৯৪. কুরআন, ৪৮ : ২৯

১৯৫, বাইবেল, মার্ক, ৪, ২৬-৩২

১৯৬, কুরআন, ৬১:৯

১৯৭. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (১৯৮৪) “ম্যান অ্যান্ড হিজ গড” প্রবন্ধ পৃ. ৩৮৯।

১৯৮. কুরআন, ৫:৪৪

১৯৯. কুরআন, ১৫:১

২০০, কুরআন, ৮: ৩৯

২০১, কুরআন, ৫৮: ২২

২০২, ফিলিপ কে হিস্ট্রি, হিস্ট্রি অব দি অ্যারাবৃস্ ১৯৭৯, পৃ. ১৪২

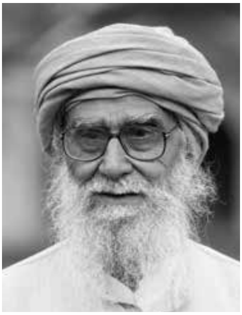

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান (১৯২৫-২০২১) ছিলেন একজন ইসলামি পণ্ডিত, আধ্যাত্মিক নেতা এবং শান্তিকর্মী। বিশ্ব শান্তিতে তার মৌলিক অবদানের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। ইসলামের আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা, নবির অহিংস দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিকতার সাথে ইসলামের সম্পর্ক এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিষয় নিয়ে তিনি দু'শোটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার করা কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থটি সরল, স্পষ্ট এবং সহজবোধ্য হওয়ায় সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। তিনি শান্তির সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করতে এবং মানুষের কাছে ইসলামের আধ্যাত্মিক বার্তা পৌঁছে দিতে ২০০১ সালে 'সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালটি ইন্টারন্যাশনাল' প্রতিষ্ঠা করেন।

www.quran.me www.goodwordquran.com
www.mwkhan.com www.cpsglobal.org

মুহাম্মাদ ﷺ কে সুমহান ব্যক্তিত্ব এবং মানব ইতিহাসে অত্যুজ্জ্বল বিশিষ্টতা দান করে মহান প্রভু মানবজাতির প্রতি মহত্তম অনুগ্রহ করেছেন। সত্য সন্ধানীদের কাছে তিনি কখনও অচেনা থাকেন না। কারণ তিনি সুউচ্চ আলোকস্তম্ভ, দিগন্তের ভূধর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; বাতিঘরের মতো করে আলোক সংকেত পাঠিয়েছেন; সকলকে সত্য পথের দিশা দিয়েছেন। তাই সত্য সন্ধানীরা ঐ ভূধর চূড়ায় অবস্থানকারী মুহাম্মদ ﷺ এর দিকে ধাবিত না হয়ে পারে না।

ISBN 978-93-49952-67-6

9 789349 952676

Goodword Books
CPS International